: উৎসর্গ :

অনুবাদ পাঠক পাঠিকাকে

প্রথম অধ্যায়

কী অসীম আনন্দেই না কেটেছিল আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম ই বছর।

পত্নী এমিলিয়ার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। সে আমায় ভালোবাসতো, আমিও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম। সে কি নিবিড় প্রেম! দুটি প্রাণ এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। রঙীন স্বপ্ন বিভোর মন, অবাধ সম্ভোগ, শান্ত জীবন। কপোত কপোতীর ন্যায় প্রেমগুঞ্জন মুখর দিনগুলি সুখেই কেটে যাচ্ছিল। ক্ষণিকের জন্য কেউ কারো মুখ না দেখে থাকতে পারতাম না। কেবল মনের মধ্যে তখন ছিল প্রেম, প্রেম ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করার সময় ছিল না তখন।

আমাদের অবস্থা ছিল, কবির ভাষায় "পরহন পরান বাঁধা আপনা আপনি।" চিন্তা করতাম—প্রেমময়ী এমিলিয়ার কোন খুঁত নেই, সেও হয়তো মনে মনে ভাবতো স্বামী হিসাবে আমিও নিখুঁত। প্রেমের সম্মোহিনী শক্তিতে আমরা আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম, কখনও স্বপ্নে ভাবিনি, আমাদের প্রেমের নিবিড় আলিঙ্গন একদিন আলগা হয়ে যাবে। অপ্রত্যাশিত ঝড়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে আমাদের শান্তির নীড়, সমাধি স্থাপন হবে এমন দুর্লভ ভালবাসার, সেদিনের স্মৃতি আজীবন কাল বয়ে বেড়াতে হবে, বিরহবেদনায় ও অনুতাপে। আমার প্রেম যখন একভাবে রয়েছে, এমিলিয়ার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে অটুট, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ এমিলিয়ার চোখে ধরা পড়লো আমার ভুল, সে মনে মনে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, তার প্রেম থেকে আমাকে বঞ্চিত করল, ভালবাসল না আর।

এই কাহিনী তাই নিয়েই লেখা।

পরিপূর্ণ সুখ খালি চোখে দেখা যায় না। এই ঘটনাকে হয়তো আজগুবি মনে হবে, তাই বুঝিয়ে বলছি—

তখন মাঝে মধ্যে জীবনটা বড় একঘেঁয়ে মনে হতো, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি, পরিনীতাকে ভালোবাসছি, তার পরিবর্তে পাচ্ছি ভালোবাসা। এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তখন কেউ যদি এসে বলতো—আমি সুখী, তাহলে আমি—আশ্চর্য হয়ে বলতাম, না না, আমি সুখী নই। আমার স্ত্রী আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি, কিন্তু আমার অনাগত ভবিষ্যৎ সুখের নয়। একটা সস্তা দৈনিকের চিত্র সমালোচনা ও সাংবাদিকতা করে যা রোজগার হয় তাতে ভালোভাবে দিন চলে না। ফলে উদ্বৃত্ত ব্যয় তো দুরাশা প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্যেও কখনও অর্থের অনটনে পড়তে হয়।

আমি আবার সুখী হব কেমন করে?

কিন্তু আমি যখন নিজেকে সুখী বলে মেনে নিলাম, তখন ভাবিনি—আগেই আমি আসল সুখী ছিলাম।

দুবছর পরে আমার ভাগ্য ফিরলো। চিত্রা নির্মাতা বাত্তিসতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল। তাঁরই জন্য লিখলাম আমার প্রথম চিত্রনাট্য। এটাই আমার পেশায় দাঁড়ালো, আর এমিলিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে ক্রমশ ভাঁটা পড়তে লাগল। আবার আমার গল্প আরম্ভ করি—

পেশাদার চিত্র সম্পাদক হিসাবে জীবনযাপন আর আমার দাম্পত্য জীবনে অশান্তির বীজ একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে। দুটি ঘটনাই অবিচ্ছেদ্য—

অতীতের একটা তুচ্ছ ঘটনার কথা আমার আজও মনে পড়ছে। প্রথমে তুচ্ছ মনে করেছিলাম কিন্তু পরে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এমিলিয়া, বাত্তিসতা আর আমি রেঁস্তারা থেকে বেরিয়ে বাত্তিসতা অনুরোধ করলেন তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। আমার আনন্দে রাজী হয়ে তাঁর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালাম। গাড়ীতে দুটি মাত্র বসার জায়গা। গাড়ির দরজা খুলে তিনি বললেন, মিঃ মলটেনি, গাড়ীতে শুধু একজনের জায়গা হবে। আপনি বরং এক কাজ করুন। কিছুক্ষণ এখানে আপনি অপেক্ষা করুণ। ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

আমি এমিলিয়ার দিকে তাকালাম। লক্ষ্য করলাম ওর প্রশান্ত সুন্দর মুখে ফুটে উঠেছে অস্থিরতা, দুটি চোখ হয়ে উঠেছে চঞ্চল। বললাম, এমিলিয়া, তুমি বাত্তিসতার সঙ্গে যাও। আমি ট্যাক্সি করে আসছি, আমার দিকে তাকিয়ে এমিলিয়া আনন্দ জড়িত কণ্ঠে বললেন, তার চেয়ে বরং মিঃ বাত্তিসতা গাড়ীতে

যাক, আমার দুজন ট্যাক্সিতে যাই—

বাত্তিসতা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন—বাঃ, আপনারা তো বেশ। আমায় একা একা যেতে বলছেন ?

এমিলিয়ার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

সে বিপন্ন বোধ করছে। আমি তাই বললাম—আপনি ঠিকই বলছেন মিঃ বাত্তিসতা। আপনি ওর সঙ্গে যান, আমি ট্যাক্সিতে যাচ্ছি।

অগত্যা এমিলিয়া গাড়ীতে উঠে বাত্তিসতার পাশে বসে চঞ্চল-ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইলো। ওর চোখের তারায় ফুটে উঠেছিল, অনুনয়, বিরক্তি ও অসহায়তা। আমি ও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ভারী দরজাটা ঠেলে দিলাম।

গাড়ী চলে যাবার পরই মনের তৃপ্তিতে শিস দিতে দিতে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই চৌরাস্তার মাথায় দুর্ঘটনা ঘটলো। আজ প্রান ভরে সুখাদ্য খেয়েছি। এছাড়া বাত্তিসতা বলেছেন, একটি চিত্র সম্পাদনার কাজ দেবেন। তাই মনে আনন্দের সীমা ছিল না। দুর্ঘটনার ফলে রাস্তায় দশ পনেরো মিনিট দেরী হয়ে গেল।

বাত্তিসতার বৈঠকখানায় গিয়ে যখন ঢুকলাম, দেখি এমিলিয়া একটি চেয়ারের ওপর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে। আর বাত্তিসতা একটি চাকাওলা সুরাদিসর ওপর পা রেখে এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন। এমিলিয়া আমার অহেতুক দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাওয়ায় দুর্ঘটার কথা সবিস্তারে বললাম প্রশ্ন কবার আগে ঘটনাটা বলা উচিত ছিল ভেবে মনে মনে লজ্জিত হলাম।

এমিলিয়া আর কিছু বললো না। বাত্তিসতা টেবিলের ওপর সাজানো তিনটি গ্লাসের মধ্যে থেকে একটা তুলে আমার হাতে দিলেন। গল্প গুজবে প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেল ! এমিলিয়া যে বেশ কথা বলছে তা না, খুব প্রফুল্ল নয়, সেদিকে আমি খেয়ালই করলাম না। একটিবারও চোখ তুলে বা মুচকি হেসে আমাদের হাসি মস্করায় সে যোগ দিল না। নীরবে সিগারেট টানলো আর মদের গ্লাসে চুমুক দিল, মনে হল ওর সঙ্গে কেউ নেই।

নতুন একটা ছবি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন বাত্তিসতা, বললেন, আমি চাই, আপনি এ ছবিতে কাজ করুন।

সমস্ত সংক্ষেপে জানিয়ে বললেন, কাল আমার অফিসে এসে চুক্তিপত্রে সই

করে যাবেন।

দুজনেই মুহূর্তের জন্যে চুপ হয়ে গেলাম। সেই অবসরে এমিলিয়া বললো, চলো, বড় ক্লান্তি লাগছে, বাড়ী চলো।

বাত্তিসতাকে অভিবাদন জানিয়ে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে এসে ট্যাক্সি নিলাম।

ট্যাক্সিতে উঠে এমিলিয়ার হাতখানি টেনে নিয়ে মৃদু চাপ দিলাম।

কিন্তু ও কোন প্রতিবাদ করলো না।

সে সারাটা রাস্তা চুপ করে বসেছিল। একটাও কথা বলেনি এমিলিয়া।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরের দিন ব্যক্তিসতার সঙ্গে দেখা করে চুক্তিপত্রে সই করে অগ্রিম টাকা নিলাম, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে—ছবির কাহিনীটি ছিল হাস্য রসাত্মক, সেদিনই চিত্র নির্দেশক ও আমার সহযোগী সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হল।

বলতে পারি, ব্যক্তিসতার বাড়ীতেই চিত্র সম্পাদক হিসাবে আমার জীবন আরম্ভ হয়। কিন্তু সেদিন থেকেই যে এমিলিয়ার সঙ্গে আমার বিরোধ ঘটে তা নয়। পরিবর্তনের চিহ্ন প্রকাশ পায় পরের মাস থেকে। কিন্তু জানি না, ঠিক কোন সময়ে এবং কেন এমিলিয়ার মনের তুলাদণ্ড উল্টে গিয়েছিল।

এরপর ব্যক্তিসতার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো এবং প্রথম দিনের সন্ধ্যার মত আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল, ঘটনাগুলো আমি প্রথমে আমি আমল দিইনি, কিন্তু পরে ঘটনাগুলি বেশ অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এখানে একটি ঘটনার কথা বলছি—

প্রায়ই ব্যক্তিসতার বাড়ী থেকে আমাদের নিমন্ত্রন আসতো। এমিলিয়া প্রায়ই সময়েই যেতে চাইত না। নানারকম অজুহাত দেখাতো, আমি বলতাম, তোমাকে ছাড়া আমি কোথাও কোনদিন যাইনি, না গেলে ব্যক্তিসতা রাগ করবেন, তাছাড়া আমাদের অন্নদাতাকেও অপমান করা হবে।

তখন এমিলিয়া আমার যুক্তির কাছে হার মানত। তারপরে বেরিয়ে পড়তাম দুজনে! অবশ্য বিক্ষিপ্ত, তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে স্মৃতিমন্থন করে সাজিয়ে নিয়েছিলাম পরে। আগে কেবল জানতাম, আমার সঙ্গে এমিলিয়ার ব্যবহারে একটা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তার কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করিনি কখনও। বিয়ের পর আমার সঙ্গ পাওয়ার জন্য সে যেমন ব্যাকুল হত, আজ আর সেই ব্যাকুলতা তার নেই। তখন বাইরে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেই ওর চোখ জলে ভরে যেতো, কখনও ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতাম, নয়তো নিজে যেতাম না।

কিন্তু এখন তার বিপরীত, আমি বাইরে গেলেই ও যেন শান্তি পায় বেশী।

এমিলিয়া বলতো—আমার অদর্শন তার অসহ্য। গর্বে আমার বুক ভরে

যেতো। কিন্তু যখন দেখলাম, আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে সে আর উৎকণ্ঠিত হয় না, বরং আনন্দ বোধ করে তখন অসহ্য এক যন্ত্রনা অনুভব করতাম, মনে হতো পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।

বিকেলে কাজে বেরোনোর কথা। কিন্তু এমিলিয়ার ঔদাসীন্য যাচাই করার জন্য সকালেই বেরিয়ে পড়তাম। বুঝতাম, আমার অনুপস্থিতিতে সে তৃপ্ত ও স্বস্তি পায়। কিন্তু মনে চিন্তা করতাম না এতটুকু, কেবল সান্ত্বনা দিতাম। কারণ, যা সত্য বলেই জানি, তা চিন্তা করে লাভ কি? সে হয়তো মনে করে? আমার উপর তার প্রেম কমে গেছে, হয়তো সে আমার একেবারেই ভাল বাসে না।

নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে যার ফলে এমিলিয়া তার প্রেমাবেগ হারিয়েছে, অভাবনীয় একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

যখন ব্যক্তিসতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন আমার শোচনীয় অবস্থা ছিল। দুটি বছর কাটিয়েছি ভাড়া বাড়িতে। এমিলিয়া ছাড়া অন্য কোন স্ত্রী এই সাময়িক ব্যবস্থায় রাজী হত না। স্বামীর প্রতি নিবিড় প্রেম ছিল তার। সত্যিই এমিলিয়া ছিল স্বভাব গৃহিনী। তাকে শুধু নারীজাতির স্বভাবজাত প্রবনতা বলা চলে না, এ অনেকটা ক্ষুধার মত দুর্বার একটা উৎসাহ। তার মূল ছিল এক বংশগত পরিবেশের মধ্যে।

এমিলিয়ার জন্ম গরীবের ঘরে। সমাজে এমন একদল লোক আছে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে বঞ্চিত, ছোট একটি আশ্রয়নীড় রচনার আকাঙ্খা যারা পূরণ করতে পারছে না বংশানুক্রমে। তাদেরই অন্তরের গোপন অপূর্ণ আশা যেন সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছিল এমিলিয়ার সুপ্তবাসনার মধ্যে। আমার মনে পড়ে, দুজনের বিয়ের কথা যখন পাকা হল, তখন আমি তাকে জানলাম আমি তাকে নিজের ঘর দিতে পারবো না। আপাততঃ একটা সজ্জিত কক্ষেই তৃপ্ত হয়ে থাকতে হবে।

তখন তার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম—শুধু সাধের স্বপ্ন ভেঙে যাবার হতাশায় নয়; সেই স্বপ্নের আসল রূপ দেখেই অশ্রু নেমেছে তার চোখে। স্বপ্ন তার কাছে অর্থহীন অলীক নয়, সেই স্বপ্নেই যে সে বেঁচে আছে।

প্রথম দুটি বছর একটি সাজানো গোছানো ঘরেই বাস করলাম। ছোট্ট একটি ঘরে সীমাবদ্ধ থেকেও সে মনে করতো, নিজের বাড়ীতেই আছে, নিজের

হাতে গুছিয়ে রাখতো জিনিসপত্র, শয্যা রচনা করতো। তবু তার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঘরটি থাকতো ঠিক তেমনি—অপরের, তার নিজের নয়। ওর যেন মনের সাধ মিটতো না। মাঝে মাঝে প্রকাশ করতো হতাশা।

আমি বুঝতাম ওর মনের ভাষা। মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম—যে ভাবেই হোক তার মনের সাধ পূর্ণ করতে হবে।

তাই আমি সঙ্গতি না থাকা সত্বেও একটা ফ্ল্যাট লীজে নিলাম। কিন্তু টাকা ধার করে আর পাওয়া কিছু টাকা দিয়ে প্রথম কিস্তি শোধ করলাম। আমি কিন্তু প্রিয়তমার জন্য গৃহ রচনা করে তৃপ্তি পেলাম না। কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা শোধ করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। এমিলিয়ার জন্যই এই অবস্থা। তাই ওর ওপর বিতৃষ্ণা এলো।

যাইহোক, যেদিন নতুন ফ্ল্যাটে গেলাম সেদিন এমিলিয়ার আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখে আমি নিজের চিন্তায় কয়েকদিন ভুলে রইলাম।

মনে হলো, এই ফ্ল্যাটটি জোগাড় করে আমি এমিলিয়ার চোখে হয়ে উঠেছি প্রিয়তর। দেহের দিক থেকে আরও কাছে এসেছি, আরও অন্তরঙ্গ হয়েছি তার।

দুজনে মিলে ফ্ল্যাটটি দেখতে এলাম। চারিদিক ঘুরে স্যাঁতেস্যাঁতে ঘরগুলি দেখতে লাগলাম। ঘর দেখা শেষ করে জানালা খুলে বাইরের দৃশ্য দেখবো বলে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ আমার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো এমিলিয়া, নীচু স্বরে বললো একটা চুমো খাও না। আমি তার এই অপ্রত্যাশিত অভিনব আচরণে ও কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত হয়ে চুম্বন করলাম তাকে। সে আমায় নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করলো, সেমিজ ও বডিসের বোতাম খুলে তার পেটটি আমার পেটের ওপর রাখলো। মাটিতে ধুলো মাখা বালির স্তূপের উপর জানালার নীচে চললো আমাদের প্রেমলীলা। বুঝলাম, তার আকস্মিক কামাবেগে আত্মপ্রকাশ করছে একটি নিরাপদ আশ্রয় স্থাপনের মাধ্যমে। মনের সুপ্ত বাসনা ফাঁকা ঘরগুলির রঙ ও চুন বালির গন্ধে আরও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল, পুলক প্রবাহ প্রবাহ ছুটছিল অন্তরের মণি কুঠুরীতে। আগের সোহাগ প্রেমে তার দেহমনে এমন উত্তেজনা জাগানো সম্ভব হয়নি।

নতুন ফ্ল্যাটে যাবার পর দুমাস কেটে গেছে। সীমাবদ্ধ আয় থেকেই দুএকটা আসবাবপত্র কিনেছি। এমন কি কিছু সঞ্চয় করতে পারি ইচ্ছে করলেই, কিন্তু সেই সামান্য সঞ্চয় থেকে ফ্ল্যাটের কিস্তির টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

এমিলিয়াকে আমি কিছুই জানাইনি। আমি তো তার মন থেকে আনন্দটুকু কেড়ে নিতে পারি না। এমিলিয়া জানে আমার অবস্থার কথা। কিন্তু তাতে তার মাথাব্যথা নেই। আমার মনের অশান্তি ও উদ্বেগের দিকে কোন খেয়ালই নেই তার। সে নির্লিপ্ত, নির্বিকার। এতো তার স্বার্থপরতা, হয়তো অবিবেচনা।

মনের পটে নিজের যে মূর্তিটি এঁকেছিলাম তার রূপ পাল্টে গেল।

ভাবতাম, আমি একজন সংস্কৃতিবান, রুচিশীল, বিচক্ষণ, বিদ্বান, ও তরুণ, কিন্তু তার পরিবর্তে সেদিন সেই নির্মম চিন্তাক্লিষ্ট অবস্থায় দেখলাম, এক নিঃস্ব শয়তান ফাঁদে পড়েছে। পত্নী প্রেম উপেক্ষা করতে না পেরে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে।

দৈহিক রূপান্তরও' ঘটলো—আমি আর এখন তরুণ, অখ্যাত প্রতিভাবান নাট্যকার নই—একজন দরিদ্র সাংবাদিক—যে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য অর্থের সন্ধানে শহরের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়—দেনার দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুমোতে পারে না, অর্থচিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই তার মনে।

একজন হতভাগ্য সাহিত্যিকের জীবনের করুণ, মলিন বিবর্ণ চিত্র।

ঘৃণায় মন ভরে উঠলো। ক্রমে ক্রমে আমায় সবই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার পত্নী সুন্দরী অশিক্ষিতা টাইপিষ্ট। তার মধ্যে হয়তো রয়েছে তার শ্রেণীগত সংস্কার ও উচ্চাভিলাষ। সে যদি আমায় ঠিক বুঝতে পারতো তাহলে নাট্যকার হিসাবে সাফল্যের আশায় দীনভাবে কোন স্টুডিওতে কিংবা সুসজ্জিত কক্ষে বিশৃঙ্খল কষ্টকর জীবন-যাপনের বেদনা অম্লান বদনে বরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী তা চায় না।

হতাশায় মন ভরে গেল। ক্রমে বেড়ে গেল মনের বেদনা ও অসহায়তার মাত্রা। যারা ধনী ও বিশেষ অধিকারভোগী, যারা এমন দুঃখ ভোগ করে না, তাদের ওপর আমার হিংসে হলো। দারিদ্রের প্রতি আমার বিদ্বেষ সকলের উপর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রূপ ধারণ করলো।

আমার মনের চিন্তা একই পথ অনুসরণ করছিল বরাবর, লক্ষ্য ছিল কেবল একটি। তাই আমার অন্তরের ঘৃণা, কল্পনা ও মনের এই অদৃশ্য রূপান্তর সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সচেতন। হয়তো, আমার দুঃখকষ্টের জন্যে সমাজ দায়ী। এই সমাজ তার যোগ্যতম সন্তানদের খোঁড়া করে রেখেছে। অযোগ্যদের পোষণ করেছে। কিন্তু নিজের ওপর লক্ষ্য রেখেছিলাম আমি

পরীক্ষা করছিলাম নিজেকে। আমি যেন অপর লোককে দেখছি নিজেকে নয়। তবু জানতাম নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে জনসাধারণের সঙ্গে জড়িত করছি। আমার মধ্যেই ছিল পৃথক সত্তা। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহন করতে পারিনি। কিন্তু এ কী? আমার চিন্তাধারা, কথাবার্তা আচরণ ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে যেন।

আমার এক বন্ধু এক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে বিশ্বাস জাগালো আমার মনে। আমি কমুনিষ্ট পার্টির সদস্য হলাম।

এ সংবাদ শুনে এমিলিয়া বলেছিল, এখন শুধু কমুনিষ্টরাই তোমার কাজ দেবে, আর সবাই বয়কট করবে। তাকে জানাবার ইচ্ছে হলো, তোমায় খুশী করবার জন্যে ফ্যাটটি না নিলে 'কম্যুনিষ্ট হতে হতো না।

কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে না পারার দরুণ ব্যাপারটা ওখানেই ইতি হল।

আমরা নতুন বাড়ীতে গেলাম। বাত্তিসতা আমার একটি চিত্র সম্পাদনার কাজে ডাক দিলেন। বহুদিন পরে মনে শান্তি ফিরে পেলাম। ভাবলাম চার পাঁচটি চিত্রনাট্য লিখে ধার শোধ করবো।

এই সময়ে এমিলিয়ার ওপর আমার প্রেম আরো গভীর হয়ে উঠলো। তাকে স্বার্থপর, নির্লজ্জ ও অবিবেচক ভেবেছিলাম। মনে মনে দুঃখ অনুভব করলাম, নিজেই নিজেকে তিরস্কার করলাম।

কিন্তু সুখ বেশীদিন কপালে সইলো না। আমার ভাগ্যাকাশে জমলো এক টুকরো ঘন কালো মেঘ।

তৃতীয় অধ্যায়

বাস্তিসতার সঙ্গে আমার দেখা হয় অক্টোবর মাসে প্রথম সোমবারে। অপরিসর রাস্তার ওপর তৈরী নতুন বাড়ীর দোতলায় আমাদের ফ্ল্যাটটি, বেশ জমকালো নয়, ছোট ছোট তিনখানি ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর সব রয়েছে। বাড়ীর বাইরে একটি ছায়াঘন বাগান বাড়ী, সামনে রাস্তা নেই, বাড়ীর সংলগ্ন কোন প্রাচীর নেই, ইচ্ছে মত যখন খুশী বাগানে বেরিয়ে আসতে পারি।

বিকেলবেলা আমরা এসেছিলাম। সারাটা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গিয়েছিল। মনে পড়ে, শোবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেকটাই খুলছি। হঠাৎ আয়নার ভেতর দিয়ে দেখলাম, এমিলিয়া একটা বালিশ নিয়ে পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছে।

আমি জানতে চাইলে বললো, আচ্ছা, আমি যদি রোজ ওঘরে ঘুমোই, তাহলে কি তোমার কোন আপত্তি আছে। আমি তোমার মত জানালার খড়খড়ি খুলে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি না। আমার মনে হয় দুজনের আলাদা থাকাই ভালো।

বুঝতে পারলাম না তার ইঙ্গিত। এ আবার কী কথা! সামনে এসে বললাম, না, তা হতে পারে না—পারে না—আলাদা শোবে কেন? বিছানায় না শুয়ে গদির ওপর শোওয়া আরাম নয় নিশ্চয়ই। আর তোমার অসুবিধের কথা—আর তো কখনও বলনি আমায়?

চোখ দুটি নামিয়ে বললো—সাহস হয়নি।

বললাম, দুবছরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও তো বলতে পারতে! আমি ভেবেছিলাম, তোমারও অভ্যেস হয়ে গেছে।

সে যেন খুশী হলো। কোন কথা না বলেই ঘর থেকে যাবার জন্য পা বাড়ালো। বললাম, দাঁড়াও, আচ্ছা বেশ—এবার থেকে খড়খড়ি বন্ধ করেই ঘুমোবো। তাহলে হবে তো? তোমার জন্যে ওটুকু ত্যাগস্বীকারই করলাম না হয়।

কিন্তু এমিলিয়া নাচার। সে কোন প্রস্তাবেই রাজী হল না।

অগত্যা বিছানার ওপর বসে পড়লাম। একটা বালিশ উধাও হয়েছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে—দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়েছে, আমি একা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছি। বিস্মিত বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইলাম—এমিলিয়া যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে সেই দিকে।

মনে মনে প্রশ্ন জাগলো—দিনের আলোয় ঘুম ভেঙে যায় বলেই কি এমিলিয়া আমার সঙ্গে এক শয্যায় শুতে চায় না, না কি আমার সঙ্গে থাকতেই চায় না আর ?

মনে হয়, দ্বিতীয় কারণটাই ঠিক ? কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম—প্রথমটাই সত্য হোক। সত্যিই কি তবে এমিলিয়া ভালোবাসে না আমায় ? চিন্তার সমুদ্রে ডুবে আছি।

এমিলিয়া হয়তো লম্বা ছিল না, কিন্তু তাকে আর সব মেয়ের চাইতে লম্বা ও বড়সড় মনে হতো আমার। পরিণয় রাত্রিতে আলিঙ্গন করেছিলাম তাকে। সে খালি গায়ে ছিল। দেখেছিলাম—তার কপালটি আমার বুকের ওপরে ঠেকেছে—দুটি সুন্দর কাঁধ ও মাথাটির মাপে আমি তার চেয়ে লম্বা, তার বাহু দুটি সুদৃশ্য। গোলগাল, গায়ের রঙ ময়লা, নাকটি বেশ ধারালো আর স্পষ্ট, হাসি খুশী মুখটি, কামনা ভরা দুটি চোখ। নিখুঁত ছিল না দেহের গড়ন। তবু আমার কাছে সে ছিল অনন্যা। সত্যিই তার মধ্যে ছিল এক অপূর্ব কমনীয়তা .রহস্যময় বর্ণনাতীত সহজাত গাম্ভীর্য।

চেয়ে আছি তার দিকে। ভেবে পাচ্ছি না— কি করবো। পাতলা সেমিজের ভেতরে দিয়ে তার দেহের বর্ণ ও বুকের গঠনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়লো, সে যখন আমায় আর ভালোবাসে না তখন তার সঙ্গে দৈহিক মিলন সম্ভব নয়। প্রেম তো শুধু একটি মানসিক বৃত্তি নয়, অনবদ্য ও স্বাভাবিক দৈহিক মিলনও বটে। এতদিন এমিলিয়ার মন না জেনেই ভোগ করেছি তাকে। তখন যেন এই সুস্পষ্ট অথচ গোপন সত্য চোখের সামনে আরও পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠলো। আমাদের মিলন অব্যাহত থাকবে না— নেইও—

অকারণে ছিঁড়ে গেছে প্রেমের বাঁধন, বিচ্ছেদ ও বিরহ ঘিরে ধরছে জীবনের চারদিক থেকে। তীব্র ঘৃণা, বিতৃষ্ণাও বেদনায় অন্তর ভরে উঠলো।

এমিলিয়াকে আমার সামনে নিয়ে যেতে দেখে তার হাতখানা সজোরে চেপে ধরলাম। বললাম, এসো—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। নিজেকে ছাড়িয়ে

নেবার নিষ্ফল চেষ্টা করলো সে। অদূরে বিছানার ওপরে বসলো, আমার সঙ্গে কথা আছে, কি কথা ?

এরকম মনের ভাব আগে আমাদের মধ্যে ছিল না। তাই আসন্ন পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কথা আছে, মনে হচ্ছে কি যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে দুজনের মধ্যে।

আমার দিকে চোখ ফিরিয়েই বেশ সরল ভাবে বললে,—কি যে তুমি বলো ? কি পরিবর্তন হয়েছে ? দুজনেই তো ঠিকই আছি।

পরিবর্তন হয়েছে তোমার।

মোটেও না, আমি ঠিকই আছি।

ও কী ? আমার যুক্তি ও বিদ্বেষ যেন আগুনের শিখায় মোমের মত গলে যাচ্ছে। এমিলিয়ার গায়ের পাতলা সেমিজের তলায় স্পষ্ট চোখে পড়ছে তার দেহের সুপরিচিত গোপন বর্ণ ও আকার। কামনা মনে জেগে উঠলো, উত্তেজনায় ভরে গেল সারা শরীর।

কিন্তু কেবল আমার মনের কামনাই তার দিকে টেনে নিয়ে যাবে কেন ? আমার মত তারও কামনা জেগে উঠবে না কেন ? কেন ?

আমি চাপা স্বরে শুনলাম, ঠিক আছে তার প্রমাণ দাও। এই মুহূর্তেই আমি প্রমাণ চাই। আমি ঝুঁকে পড়লাম তার দিকে। দুবার বিক্রমে তার চুল ধরে মাথাটি নামিয়ে চুমো খেতে চাইলাম।

কিন্তু প্রথমে সে আপত্তি করলো না। পরে সে তার মাথাটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। বললাম—তুমি কি চাও না যে আমি তোমায় চুমু খাই ?

না, একটা চুমু হলে কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তার পরেও তুমি ছাড়বে না,—আর—আজ অনেক রাত হয়ে গেছে।

তার কোন কথা শুনলাম না। আবার জড়িয়ে ধরলাম। সে বললো—উঃ, লাগছে।

আশ্চর্য। এর আগে আমি কতজোড়ে জড়িয়ে ধরতাম, আর এখন হাত ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই লাগছে। রাগ হলো তাই। আগে তো তোমার লাগতো না এতে।

'তুমি জানো না—লোহার মত শক্ত তোমার হাত—

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, তা বলে চুমু খেতে দেবে না ?

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার ভুরুর ওপর একটি চুমু খেলো সে। বলল, এবার ঘুমোই গিয়ে, কেমন ? আজ রাত হয়েছে অনেক।

আমি তবুও নিরস্ত হলাম না। ওর নিতম্বের নীচে হাত রেখে বললাম, এমন চুমুতো তোমার কাছে চাইনি এমিলিয়া।

আমি আবার জড়িয়ে ধরতেই সে আমাকে হাত দিয়ে ঠেলে দিল। কর্কশ কণ্ঠে বলল, আঃ, ছাড় না—লাগছে।

তার গায়ের ওপর সামান্য ভর দিয়ে বললাম, না না না, লক্ষীটি, তোমার একথা সত্যি নয়।

সে সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, কি করবে করে নাও তাড়াতাড়ি, ওরকম চেপে ধরলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। ওর কণ্ঠস্বরে এতটুকু আবেগের চিহ্ন নেই।

হাতের ওপর হাত রেখে মাথাটা নীচু করে চুপচাপ বসে রইলাম।

খানিক পরেই এমিলিয়ার কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল, এসো, যখন কিছুতেই ছাড়বে না, কি বল ?

আমি মাথা না তুলেই বললাম—নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমার মনে তখন আর ভোগের বাসনা ছিল না। তখন আমি আসন্ন বিচ্ছেদ সহ্য করবার প্রাণপন চেষ্টা করছি।

ঘরের মধ্যে সে একবার ঘুরপাক খেয়ে সেমিজ খুলতে লাগল। আমার মনে পড়ে গেল, আগেকার দিনগুলোর কথা। ওর এই সেমিজ খোলার দৃশ্যটি আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতাম। কিন্তু আজ মনে তেমন ইচ্ছে নেই, কৌতূহলও নেই। কারণ এমিলিয়া আজ উদাসীন, উভয়ে উভয়ের ওপর নির্মম হয়েছি, দুজনেই হয়েছি দুজনের অযোগ্য।

কোলের ওপর হাতদুটো জড় করে মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

বেড কভারটা না তুলেই এমিলিয়া বিছানায় শুয়ে পড়লো।

আমায় ডাকল, এসো না, দেরী করছ কেন ?

আমি স্থানুর মত বসে রইলাম, এক তিলও নড়লাম না। এই কি আমাদের স্বাভাবিক জীবন ?

এমনি করেই এমিলিয়া ডাকতো। কিন্তু তবুও এ ডাকের মধ্যে আর সে ডাকের মধ্যে তফাৎ রয়ে গেছে। আগে সব কিছু নিমেষের মধ্যে ঘটে যেত।

বুঝতেই পারতাম না, কখন এমিলিয়ার বাহুবন্ধনে ধরা পড়ে গেছি। আজ এমিলিয়ার সেই আকুলতা নেই, আমারও নেই। কিন্তু আমি যেন আজ আমার প্রেয়সীর মুখোমুখি বসে নেই, বসে আছি কোন রূপে ভোলানো পসারিনীর সামনে।

মুহূর্তের জন্যে এমিলিয়াকে দেখলাম। ঠিক যেন একটি অপচ্ছায়া। বিছানায় শোওয়া এমিলিয়ার সঙ্গে ছায়ামূর্তিটি যেন মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, কিছু মনে করো না এমিলিয়া আজ থাক, আমি বরং ওঘরে ঘুমোচ্ছি। তুমি এখানে থাক।

পায়ে পায়ে পাশের ঘরে চলে গেলাম। একবার তার দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। এমিলিয়া একই ভাবে শুয়ে আছে। একটা হাত মাথার নীচে, অন্য হাতটা বুকের ওপর রয়েছে, খোলা চোখদুটির দৃষ্টি শূন্যে, মাথাটি আমার দিকে রয়েছে।

আমার এবার মনে হল, না না, এ দেহপসারিনী নয়, এ হল আলেয়া। তার চারদিকে ঘন কুয়াশার আচ্ছাদন। আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে—বাস্তব সীমানার বাইরে, আমার অনুভূতির ধরা ছোঁয়ার ওপারে।

চতুর্থ অধ্যায়

ক্রমশঃ মনে হল দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু এমিলিয়ার ব্যবহারে তার প্রমান পাওয়া গেল না। সে যেন নিশ্চুপ হয়ে গেছে। জোর করে তার কাছ থেকে ভালবাসা আদায় না করাই উচিত। কিন্তু তবুও ভালোবাসতে লাগলাম।

প্রেমের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। কারণটা আমি জানি না। আগের দিন রাত্রির ঘটনার গুরুত্ব কমে গেল আমার কাছে। মনে হল ওটা একটা মনের ভুল। ইচ্ছে করলেই সব ভোলা যায়। এমিলিয়া একা থাকতে চাইতো ঠিকই কিন্তু দেহ দান করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো না। তাই বিদ্রোহী মন ক'দিনের মধ্যে সয়ে গেল; এমনকি তৃপ্তিকর মনে হলো। ভয় করছিলাম —সে বুঝি আমাকে আর চায় না। তবু তার ঔদাসীন্য আর নিষ্ক্রিয়তার জন্য কৃতজ্ঞ হলাম তার কাছে।

থিয়েটারের কাজ ছেড়ে সিনেমার কাজ ধরেছি, একমাত্র এমিলিয়ার মনে সাধ পূরণ করার জন্য। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার ঘটনার পর আমি হতাশ হয়ে পড়েছি, মন অশান্ত হয়ে উঠেছে, কাজে বিরক্ত এসে জমছে। এখন একাজ করার কোন অর্থই হয় না। এখন সে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে গেছে। এ শুধু মিথ্যে দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়।

আমার মনের অবস্থা আরও স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে এক্ষেত্রে চিত্র সম্পাদকের কাজ সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা প্রয়োজন।

নাটক, দৃশ্য ও চিত্রগ্রহণ, নির্দেশনা ও পরিচালনা, সব একসঙ্গে নিয়ে চিত্রনাট্য। চিত্র সম্পাদকের স্থান পরিচালকের পরেই এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যবনিকা অন্তরালে তার জায়গা, অথচ চিত্রের সাফল্যের জন্যে সে বুকের রক্ত নিঃশেষ করে দিচ্ছে। কখনও সে নিজের নাম জাহির করতে পারে না। চিত্রসম্পাদকের জীবন হল—খাটুনির পরিবর্তে যা পায় তা দিয়ে সম্ভব হলে আনন্দ স্ফূর্তি করে, অবিশ্রান্ত অবিরাম। নার্স যেমন একটি শিশুকে ছেড়ে আর একটি শিশুপালনের দায়িত্ব নেয়, আর তার পরিশ্রমের ফল ভোগ

করেন শিশুর জননী, এও ঠিক তাই। চিত্রসম্পাদকের জীবনে কতগুলি বিরক্তিকর অসুবিধাও আছে।

চিত্রসম্পাদকের স্বাধীন সত্তা নেই, স্বাস্থ্য ও রুচির অনুকূল পরিবেশ নেই। তবে সবসময় যে অনুকূল পরিবেশ থাকে তা নয়।

তবে ভালো ছবি যেমন বিরল, তেমনি সত্যিকারের সুস্থ পরিবেশও দেখা যায় খুব কম।

এবার অন্য একজন চিত্রনাট্যের সম্পাদনার চুক্তি পত্রে সই করলাম।

আমি আমার দৃঢ় সংকল্প ও আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম।

মনটা ক্রমশঃ একঘেঁয়ে হয়ে উঠল। সংগ্রামী হয়ে উঠল। একটানা পরিচালক ও চিত্র সম্পাদকের সুদীর্ঘ আলোচনা ও সহযোগীদের মতামত শুনতে ভালো লাগত না। মনে হতো, নিজেকে বিক্রী করে দিয়েছি। তবু তাতেই নষ্ট করেছি আমার সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুটি। অপচয় করেছি আমার প্রতিভার। কিন্তু এত বিরক্ত থাকা সত্ত্বেও কখনও কর্তব্যে অবহেলা করিনি।

চিত্র নাট্যকলা হচ্ছে আটচাকার ঘোড়ার গাড়ী একটি। তার মধ্যে কর্মঠ ও শক্তিশালী ঘোড়াগুলোই গাড়ীটানে, বাকি ঘোড়াগুলোকে টানে তাদের সাথীরাই —যারা একসঙ্গে টানে ঘোড়া আর গাড়ী দুটোই। মনের অধীরতা ও বিষন্নতা সত্ত্বেও আমি ঐ গাড়ীটানা ঘোড়ার মধ্যে ছিলাম। পরিচালক ও সহযোগীরা অসুবিধা দেখলেই আমার অপেক্ষায় থাকতেন। সমস্যা সমাধানের জন্যে আমার কাছেই দৌড়ে আসতেন, নিজের বিচার শক্তিকে মনে মনে অভিসম্পাত করতাম তবু বিনা দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ হাসিল করে দিতাম।

সততা ও সুবুদ্ধি বজায় রাখার জন্য করতাম, নিজের বুদ্ধি জাহির করবার জন্য নয়। চুক্তি পত্র সই করার দুমাস পরে অসুবিধাগুলোর কথা জানতে পারলাম। প্রথমে আমার বুঝতে দেরী হয়েছিল—এসব অসুবিধা আগে চোখে পড়েনি কেন, কখন সেগুলো আবিষ্কার করতে অনেক দিন লাগল?

যতদিন এমিলিয়ার প্রেমের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, ততদিন মনের সাহস ও বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করেছি। এখন এমিলিয়া আর আমায় ভালোবাসে না। বিশ্বাস ও মনের বলও হারিয়ে ফেলেছি। কেবলই মনে হয়, শুধু দাসত্ব, প্রতিভার অপব্যবহার, সময়ের অপচয়।

পঞ্চম অধ্যায়

দিন ক্রমশঃ কাটতে লাগল।

আমি যেন কি এক কঠিন রোগের অসহ্য ভার বয়ে বেড়াচ্ছি, অথচ ডাক্তারের পরামর্শ নেবার সাহস হল না। মনের আকাশে সন্দেহের মেঘ জমতে দেখে মনে মনে ভীত হলাম। এমিলিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে বাস করা অসম্ভব, তবু একসঙ্গে দিন কাটাতে লাগলাম। মনকে নিষ্পাপ সান্ত্বনা দিতে লাগলাম, দিনের বেলায় অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ও অসংলগ্ন আলাপ, রাত্রিতে কখনও কখনও প্রেমলীলা—যাকে বলা যায় কতকটা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা এমিলিয়ার ওপর অত্যাচার এই তো স্বাভাবিক আমাদের জীবনে।

যতই কাজ করি না কেন দিনে দিনে অনিচ্ছা ও বিরক্তি এসে চেপে ধরলো। এমিলিয়া সব সময় এড়িয়ে চলে। মন দিয়ে কাজ করতে পারি না। অতিষ্ঠ হয়ে উঠি মাঝে মাঝে। মনে দুশ্চিন্তা জেগে ওঠে।

এর মধ্যে বাত্তিসতার চিত্রনাট্য সম্পাদনার কাজ শেষ হয়েছে। আমায় আর একটা কাজের কথা বললেন, জানালেন এবার প্রথম চিত্রনাট্যটির চেয়ে বেশী টাকা পাবো আমি।

এমিলিয়াকে দুটি কারণের জন্য বাত্তিসতার নতুন প্রস্তাবটির কথা জানালাম না। এক নম্বর, প্রস্তাবটি গ্রহণ করবো কিনা জানি না। দু'নম্বর হচ্ছে, জানতে পেরেছি, আমার কাজে কোন কৌতূহল নেই এমিলিয়ার। কিন্তু এমিলিয়ার ভালোবাসা বা উপেক্ষার ওপর কাজটি নেওয়া না নেওয়া নির্ভর করছে। এমিলিয়া আমায় আর ভালবাসে না। তাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কাজটা নেবো কি নেবো না। এমিলিয়া যদি আগের মত ভালবাসত, তাহলে তাকে ব্যাপারটা জানাতাম এবং কাজটিও নেওয়া হত।

বাত্তিসতার জন্য যে চিত্রনাট্যটা লিখেছিলাম, তারই চিত্রপরিচালকের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। আজই শেষ আর দুটি পৃষ্ঠা মাত্র বাকী। মনে তৃপ্তি অনুভব করলাম। শীগগিরই মনে হয় আর একটি বিরক্তি পূর্ণ কাহিনী এসে পড়বে। আপাততঃ একটির হাত থেকে

আসন্ন মুক্তির আশায় মন আনন্দে ভরে উঠল। পাণ্ডুলিপির কয়েক জায়গা অদল বদল করতে হল। মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে বুঝতে পারলাম - চিত্র-নাট্য—সম্পাদনা শেষ হয়েছে।

পর্বত ভ্রমণকারী যেমন তার হারানো পথ খুঁজে পায়, তেমন একটি সংলাপ রচনা করে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলাম—কেন, এখানেই তো শেষ করা যেতে পারে।

আমি একমনে লিখে যাচ্ছিলাম। পরিচালক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তিনি উঁকি মেরে দেখে বললেন, ঠিক—ঠিক বলেছেন, সত্যিই তো' এখানে শেষ করা যায়।

তাই পাণ্ডুলিপির শেষ পাতার সমাপ্ত লিখে কাজ শেষ করলাম।

দুজনে অনেকক্ষণ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম, দুজনের নজর ডেস্ক এর ওপর নিবদ্ধ যেন দুজন অবসন্ন পর্বতারোহী অতিকষ্টে একটি অপরিসর হ্রদে বা চূড়ায় এসে মুগ্ধ বিস্ময়ে পরম তৃপ্তি ভরে চেয়ে আছে।

অবশেষে পরিচালক বললেন, কাজ শেষ হল তাহলে। মুখে মুচকি হাসির রেখা টেনে বলেন, কাঁচা পয়সার বশবর্তী হয়ে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করতে পারলেন—না?

তরুণ সুদর্শন চেহারার পরিচালক মিঃ পাসোত্তির। বয়েসে প্রায় আমরাই সমবয়েসী। কিন্তু তিনি পরিচালক আর আমি চিত্রনাট্য সম্পাদক, দুজনের মধ্যে মনিব ও চাকরের মত সম্পর্ক।

আমার সঙ্গে তাঁর জীবন ও চরিত্রের কোন সাদৃশ্য ছিল না। কল্পনা শক্তি ও সাহস না থাকলেও ভদ্রলোককে মোটামুটি শিষ্টাচারী বলা চলে।

তাঁর রসিকতায় গম্ভীরভাবে বললাম, হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন।

তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, মনে করবেন না আপনার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তাই আপনার প্রাপ্য সবটা না দিয়ে কিছু হাতে রেখে দেবো—বুঝলেন তো?

পরিচালকের কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর লক্ষ্য করলাম। তাঁর মত তরুণের মুখে এ কথা অচিন্ত্যনীয়। তিনি তাঁর সহযোগীদের ক্ষণেকের মধ্যে প্রশংসাও করছেন আবার দোষারোপ করতেও ছাড়ছেন না। কখনও তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে তোষমোদ, আবার আবেগের সুরে অনুরোধও তাল মেশায়। কাজ করিয়ে নেবার পটুতার ওপরই পরিচালকের কৃতিত্ব নির্ভর করে। এদিক থেকে তাঁকে

একজন অভিজ্ঞ চিত্র পরিচালক বলা যায়

আমি বলে উঠলাম, না, আমার সবটাকাটা দিতে বলবেন, যখনই দরকার হবে ডাকলেই আমি এসে কাজ করে দিয়ে যাব।

উনি ঠাট্টা করে বললেন, এতটাকা দিয়ে আপনি কি করেন মশাই? আপনার কোন দেনা নেই, উপপত্নী নেই, এমনকি ছেলেপিলেও নেই—

আমি তাঁর কথায় একটু মুষড়ে পড়লাম। বললাম, ফ্ল্যাটের কিস্তি দিতে হয়।

অনেক টাকা বাকী রয়েছে বুঝি?

প্রায় সব টাকাই বাকী।

তবু, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, পাওনা টাকা আদায় করতে না পারলে আপনার স্ত্রী আপনাকে ধমকান—আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি তাঁর কণ্ঠস্বর তিনি আপনাকে বলছেন, দেখ রিকার্ডো, ওদের কাছ থেকে সব টাকা নিয়ে এসো কিন্তু—কি তাই না?

আমাকে বাধ্য হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল। বললাম, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী - কিন্তু আপনি তো জানেন—মেয়েদের স্বভাব—ঘর তাদের কাছে অতি মূল্যবান।

আমায় ও কথা বলছেন আপনি।

এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীর গুণগান করতে লাগলেন। পাসেত্তির যোগ্য স্ত্রী। পাসেত্তি মনে করেন—তিনি একটি চঞ্চল জীব……

পরিচালকের কথা আমার কানে একটাও পেঁছিলো না। মন চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। মুখ চোখের এমন ভঙ্গি করলাম, যেন কত মনোযোগ দিয়ে শুনছি তাঁর কথা। হঠাৎ তিনি তাঁর গল্প শেষ করলেন। কিন্তু আমি জানি, আপনারা অর্থাৎ চিত্রসম্পাদকেরা টাকাটা হাতে পেলেই ব্যস্, আর তার নাগাল পাওয়া যায় না, না, না, বাত্তিসতাকে বলতে হবে, আপনার একটা কিস্তির টাকা যেন আটকে রাখে।

দেখুন, আমি যা বলেছি দয়া করে তাই করবেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে, তবে একেবারে ঐ আশায় বসে থাকবেন না।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। আমি তাঁর উত্তর শুনে খুশী হয়ে বললাম —কাজটি শেষ হয়েছে। যাবার সময় হয়েছে আমর।

নিশ্চিন্ত মনে আনন্দের সঙ্গে বললেন, সে কি, আসুন, আমাদের আগামী

চিত্রের সাফল্যের জন্যে পানাহার করা যাক—চিত্রনাট্য শেষ করার পর আপনাকে তো আর এমনি চলে যেতে দিতে পারি না—আমার বাড়ী যেতে কী আপনার আপত্তি আছে ?

না, আপত্তি কিসের ?

বেশ, তবে আসুন, আমার স্ত্রী এ আনন্দে যোগ দিতে পারলে আনন্দ পাবে।

একটা সরু পথ ধরে পাসেত্তির পিছু পিছু চললাম। পাসেত্তি ঘরে ঢুকে ডাকলেন, লুইস। মলটেনি ও আমি আমাদের চিত্রনাট্য সমাপ্ত করেছি। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করো।

মিসেস পাসেত্তি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

ভদ্রমহিলা দেখতে বেঁটে, ফ্যাকাসে মুখের ওপর নেমে এসেছে কালো চুল। স্বামীর উপস্থিতিতে তাঁর ডাগর দুটি চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন মুখের দিকে। পরমুহূর্তেই ঠিক হয়ে যান। বিয়ের চার বছরের মধ্যে চারটি সন্তানে মা হয়েছেন তিনি।

অগ্নি কুণ্ডের অপরদিকে চেয়ারে বসেছিলাম আমি। চুপ করে বসে আমি ঘরটির চারদিকে চোখ বোলাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় করবার কোন প্রয়োজনই বোধ করলেন না মিসেস পাসেত্তি। একভাবে ঘাড় নীচু করে কোলের ওপর হাত রেখে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

পাসেত্তি দু বোতল মদ এনে টেবিলের ওপর রাখলেন। আবার বরফ আনার জন্যে বাইরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হটাৎ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, মিসেস পাসেত্তি, জানেন, আমাদের চিত্রনাট্যটি শেষ হয়েছে।

মিসেস পাসেত্তি একইভাবে বসে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, জিনোর মুখে শুনেছি—

আচ্ছা, গল্পটি আপনি জানেন নিশ্চয়ই ? আপনার কেমন লেগেছে ?

হ্যাঁ, শুনেছি। জিনোর যখন ভালো লেগেছে তখন আমার ভালো না লেগে পারে ?

সব সময় আপনারা দুজনেই বুঝি একমত হন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়, জিনো ও আমি।

তবু কার মত বেশী শক্তিশালী।

কেন। জিনোর।

আমি সারাক্ষণ কথার মধ্যে লক্ষ্য করে গেলাম, ভদ্রমহিলার মুখে জিনোর ছাড়া আর কোন কথা নেই।

পার্সেত্তি বরফ নিয়ে ফিরে এসেই বললেন, রিকার্ডো, আপনার স্ত্রী আপনাকে টেলিফোন করেছেন।

মনে করলাম আমার সুখের দিন বুঝি ফিরে এল। তাই ব্যস্ত পায়ে উঠে দাঁড়ালাম।

অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটি বাক্সের ওপর ছিল টেলিফোনটি। রিসিভার তুলে নিলাম। ওপর থেকে এমিলিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, আমি মার কাছে যাচ্ছি, বুঝলে, তুমি বাইরে খেয়ে এসো। তোমার কাছে বাধা পাব বলে আগে কিছুই জানাই নি।

ঠিক আছে, আমি রেস্তোরায় খেয়ে নেব। ভেবেছিলাব চিত্রনাট্যটি শেষ হবার পর খবরটা দেব এমিলিয়াকে। তাই একা রেস্তোরায় খাওয়ার কথা ভাবতেই নিরাশ হয়ে পড়লাম। হয়তো অবশেষে তাকে জানাতাম না। কারণ এ বিষয়ে তার তেমন উৎসাহ নেই। তবু, দুজনের পুরোণো সম্পর্কের কথা যে ভুলতে পারিনি।

পার্সেত্তি জানালো, কেন আর রেস্তোরায় খেতে যাবেন। বরং এখানে আমাদের সাথে সাধারণ খাওয়া খেলেই আমরা দুজনেই আনন্দ। তাই পার্সেত্তির নিমন্ত্রণে খুশী হলাম। কেবল রাজীই হলাম তা না, কৃতজ্ঞত বোধ করলাম।

বোতল দুটোর মুখ খুলে পার্সেত্তি জিন ও সুরা মিশিয়ে গ্লাসে ঢালতে লাগলেন। অপলক চোখে মিসেস পার্সেত্তি তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে।

ব্যস্ত ভাবে বলে উঠলেন, শুধু একফোঁটা—এত দিও না, আর তুমি—তুমিও বেশী খেয়ো না জিনো, শরীরের ক্ষতি হতে পারে।

পার্সেত্তি হেসে বললেন, কি যে বল তুমি। রোজই তো আর চিত্রনাট্য শেষ হয় না।

পার্সেত্তি একটা গ্লাসে অল্প দিলেন আর বাকী দুটো গ্লাস ভর্তি করে দিলেন, যে যার গ্লাস হাতে তুলে নিলাম।

একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে মিসেস পার্সেত্তি বললেন, এবার রান্না-ঘরের দিকে যেতে হবে, দেখি কাজের লোকটা কি করছে—কিছু মনে

করবেন না।

মিসেস পাসেত্তি অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেলেন। পাসেত্তি চেয়ারে বসে চিত্রনাট্য সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন, আমি মাঝে মধ্যে সায় দিতে লাগলাম। মনের দুঃখ ভোলার জন্য তিন চার গ্লাস মদ খেয়েছি। কিন্তু নেশা হয়নি, দুঃখ আরো বাড়ছে। মনে পড়ে গেল, একটু আগে ফোনে শোনা এমিলিয়ার উদাস ও যুক্তিপূর্ণ গলার স্বর। মিসের পাসেত্তির সঙ্গে কত পার্থক্য তার। আমার চিন্তা শক্তি লোপ পেল।

কিছুক্ষণ পরেই মিসেস পাসেত্তি খেতে ডাকলেন।

পরিষ্কার পরিপাটি ঘরে বসে নীরবে খেতে লাগলাম। আমি পাসেত্তির সেই একঘেয়ে কথা শুনতে লাগলাম। আমার দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ মিসেস পাসেত্তির ওপর নজর পড়তেই দেখি, তিনি গালে হাত দিয়ে মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছেন এবং একভাবে স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছেন।

আমি তার রহস্যময় আবেগ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। নারীর মনহরণ করার মত কোন গুণই নেই পাসেত্তির। মনে মনে বললাম—পুরুষ মাত্রেই সন্ধান করে নেয় এমন নারী, যে তাকে ভালবাসে ও তার গুণাবধারণ করে। নিজের মন দিয়ে তো অপরের মন যাচাই করা যায় না। পতিভক্তির জন্য মিসেস পাসেত্তির ওপর আমার সহানুভূতি জাগল।

হয়তো মুগ্ধ হয়ে ভাবছিলম, ঐ নারীর দুটি চোখে ফুটে উঠেছে—স্বামীর প্রতি অকপট প্রেম তাঁর স্বামী তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, কারণ তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভালবাসে। কিন্তু এমিলিয়ার চোখে সে আসক্তি নেই, এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না।

আচমকা সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। আমি পাসেত্তির একটা কথাও শুনতে পাচ্ছিলাম না। মুহূর্তের মধ্যে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, না না, এমনি করে বসে থাকতে পারি না—এমিলিয়ার কাছে কৈফিয়ৎ চাইব, দরকার হলে তার কাছ থেকে ছেড়ে চলে যাব।

বার বার চিন্তা করে মনে গভীর হতাশায় দৃঢ় সংকল্প হলাম। তবু পুরো-মাত্রায় বিশ্বাস হলো না। প্রেম হারিয়েছি এমিলিয়ার, তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হবে, সিনেমার কাজ ছাড়ব। নির্মম নিশ্চিত এই অভিনব অনুভূতি। কেন? এই মর্মন্তুদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে চাই প্রমাণ—আরো পরিষ্কার ভাবে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ। তার নিজের মুখ থেকে শুনতে

হবে, যে আঘাতকে এতদিন ভ্রূক্ষেপ করিনি, আজ তার ভেতর দিয়ে শানিত ছুরি চালিয়ে তদন্ত করতে হবে। মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম। তবু বুঝলাম চরম অনুসন্ধানের পরেই এমিলিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার সাহস হবে।

আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হল। ধাত্রী এসে দাঁড়ালো পাসেত্তির বড় মেয়েকে নিয়ে। বাইরে যাবার আগে মেয়েকে বাপ-মাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে এসেছে সে। মিসেস পাসেত্তি মেয়েটিকে বুকে নিয়ে তার কচি মুখে চুমু খেলেন।

এই দৃশ্য দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল। ভাবলাম, এ সুখের স্পর্শ কোনদিনই পাব না আমি। এমিলিয়াও আমার সন্তান হবে না এ জীবনে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে অধীর হয়ে বললাম—এবার যাব।

আমার অপ্রত্যাশিত বিদায়ে মিসেস পাসেত্তি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। হয়তো মনে করলেন, তাঁর মাতৃ-মমতার মধুর দৃশ্য দেখে কেন এমন মোহিত হয়ে পড়লাম আমি!

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাতে দেড় ঘণ্টা সময়, কোন কাজ নেই। রাস্তায় নেমে অভ্যেস বশতঃ বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। আমি জানতাম, এমিলিয়া তার মার কাছে গেছে। তবু আশা করলাম, এমিলিয়া হয়তো যায়নি, ঘরেই আছে। স্থির করলাম, তার সঙ্গে আজই যা করবার করে নেব। হয়তো, এমিলিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে, বাত্তিসতার কাছ থেকে চিত্র-নাট্য সম্পাদনার দায়িত্ব নেব না। সে-ও অনেক ভালো। অনিশ্চিত আমার অবস্থা—একদিকে মিথ্যা আর অন্য দিকে আত্ম-গ্লানি। আমি এখন সত্যই চাই।

বাড়ীর কাছে এসেই মন উদাসীন হয়ে গেল। এমিলিয়া যখন ঘরে নেই, তখন নতুন ফ্ল্যাটে ঢুকলেই মন চঞ্চল হয়ে উঠবে। তার চেয়ে বাইরে থাকাই শ্রেয়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বাত্তিসতাকে কথা দিয়েছি, তিনি টেলিফোন করে আমায় জানিয়ে দেবেন—কখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

এখন যদি বাড়ীতে না থাকি, তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। এই সুযোগের জন্যে বাড়ী যাওয়া দরকার।

আমি লিফটে উঠে বোতাম টিপে দিলাম।

আর বাত্তিসতার সঙ্গে বোঝাপড়ার কি দরকার? এমিলিয়ার সঙ্গে যদি মনোমালিন্য ঘটে তাহলে আর কি প্রয়োজন। তবে, হ্যাঁ, এমিলিয়া এখন ঘরে নেই, বাত্তিসতার টেলিফোনের উত্তরে তাঁকে আমার মত জানানো যাবে না। এতদূর এগিয়ে এসে আবার পিছিয়ে পড়া আরও অসঙ্গত হবে। রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি রি করছিল। এমিলিয়ার সঙ্গে দেখা করে বাত্তিসতাকে জানিয়ে দেব যে:কি করবো।

বোতাম টিপে নিচে নেমে এলাম।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মনে আরেকটা প্রসঙ্গ এসে হাজির হল। আচ্ছা,

এমিলিয়া যদি আমাকে আগের মত ভালবাসার অঙ্গীকার করে, আর ব্যক্তিসত্তা টেলিফোন করে আমায় না পান, ব্যক্তিসত্তা তখন আমাকে না পেয়ে অন্য কাউকে কাজটা দেবেন। নিজেকে ভীষণ একা মনে হল। স্বার্থ ও প্রেমের মাঝ-দরিয়ায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন্ দিকে যাব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি স্থাণুর মত লিফ্টে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ এক জনৈকা তরুনী একটা ছোট্ট কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে লিফটে চড়লেন। আমাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে লিফ্টের বোতাম টিপলেন।

ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখলাম, একটি সোফার ওপর শুয়ে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়ে এমিলিয়া পড়ছে। পাশে দুটি প্লেটে ভুক্তাবশিষ্ট পড়ে রয়েছে। বাইরে যায়নি, আমাকে মিথ্যে বলেছে সে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত ভাবে প্রশ্ন করল—কী হয়েছে তোমার?

আমি শ্বাস রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম—তুমি মার কাছে যাও নি?

সহজ ও স্পষ্টস্বরে এমিলিয়া বলল—না, টেলিফোনে পরে মা বারণ করেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ফোন করেছিলেন। ভেবেছিলাম, তুমি পাসেত্তির বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে আর জানাই নি।

হঠাৎ পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

মনে করলাম ব্যক্তিসত্তার ফোন এসেছে। তাঁকে বলবো—আমি আর চিত্রনাট্য করবো না, সব চুলোয় যাক, এমিলিয়া আমাকে আর ভালবাসে না।

চুপ করে বসে থাকতে দেখে এমিলিয়া বলল, আরে দেখই না, কে ডাকছে।

অগত্যা ও ঘরে গিয়ে রিসিভার তুললাম। ওপার থেকে আমার শাশুড়ির কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এমিলিয়া আছে রিকার্ডো?

আমি চাতুরীর আশ্রয় নিলাম। বললাম, না, সে তো আপনার কাছে খাবার জন্যে বেরিয়েছে—সে আপনার কাছেই গেছে।

কেন, আমি তো আগেই টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছি—আজ ঝি আসেস নি।

লক্ষ্য করলাম এমিলিয়ার দিকে, ওর চোখ দুটো আমার দিকেই অবস্থান করে আছে। বিড় বিড় করে দু একটা কথা বলে হঠাৎ নিজেরই ভুল-সংশোধন করলাম, না—ও, ঐ যে এমিলিয়া আসছে—তাকে এখুনি ডেকে দিচ্ছি।

আমি ইশারায় তাকে ডাকলাম। এগিয়ে এসে আমার দিকে না তাকিয়েই রিসিভার তুলে ধরল। আমি শোবার ঘরে এসে এমিলিয়ার ইঙ্গিতে দরজা বন্ধ করে দিলাম। চুপ করে সোফার ওপরে বসে রইলাম।

এমিলিয়া অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে। আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম। হামেশাই তো সে এমান করে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে। বিধবা মা, সে মাকে খুব ভালবাসে। সে সব কথাই মাকে বলে।

এক সময়ে এমিলিয়া দরজা খুলে ভেতরে এল। কিন্তু তার মুখ-চোখে ফুটে উঠেছে অসন্তোষ।

এমিলিয়া বলল, তুমি আমায় পরীক্ষা করছিলে তাই না? দেখছিলে আমি যে মার কাছে যেতে পারিনি—এ কথা মিথ্যে না সত্যি?

—হয়তো তাই।

তুমি আর দয়া করে ওরকম কথা বলবে না। আমি সব সময় তোমায় সত্যি কথাই বলি। কখনও কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করি না। তাই তো সহ্য করতে পারি না আমি—

বাকী কথা না বলেই এমিলিয়া প্লেট ও গ্লাস সমেত ট্রে-টি বেরিয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্যে বিয়ের তিক্ত আবেগে একাকীত্ব অনুভব করলাম।

তাহলে, সত্যিই এমিলিয়া আমায় ভালবাসে না। শান্ত মধুর বিস্ময় জড়িত কণ্ঠে বলতো, তুমি—তুমি ভেবেছিলে আমি মিথ্যে বলেছি? তার পর শিশুর মত খিলখিল করে হেসে উঠত। বলত, তোমার নিশ্চয় হিংসা হচ্ছিল। আচ্ছা, তুমি কি জান না, তোমায় ছাড়া আর কাউকে আমি ভালবাসি না? শেষ পর্যন্ত চুম্বনে এর পরিসমাপ্তি ঘটত। এখন সে যেন পাল্টে গেছে। প্রেম তার রূপ বদলেছে, তার সঙ্গে আমিও বদলে গেছি। সম্পূর্ণ অদৃশ্য ভাবে সবই আস্তে আস্তে অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

গভীর হতাশার অন্ধকারেও মানুষের মনে জেগে ওঠে ক্ষীণ আশার আলো। তেমনি আমি পরিষ্কার প্রমাণ পাচ্ছি, তবু সংশয়, সংশয় নয় আশা। তবু, আমি এমিলিয়ার মুখ থেকেই সেই নিষ্ঠুর সত্য শুনতে চাই—সে আমায় ভালবাসে না।

চোখ দুটি বাইরের দিকে মেলে দিলাম। এমিলিয়া আবার ভেতরে এল। আমার পেছনে সোফার ওপর পা এলিয়ে দিয়ে সাময়িক পত্রিকাটি হাতে তুলে নিল। আমি ওর দিকে না ফিরেই বললাম, চিত্রনাট্য সম্বন্ধে এক্ষুণি বাত্তিসতার

আর একটি টেলিফোন আসবে। সেই ফিল্মটি খুব ভালো হবে। চিত্রনাট্য করে অনেক পয়সা পাওয়া যাবে, লীজ এর দুটো কিস্তি একসঙ্গে দিতে পারব।

এমিলিয়ার কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। আমি আবার বলতে শুরু করলাম, এ কাজটি করতে পারলে আরও অনেক কাজ পাওয়া যাবে—ছবিটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাবে। তবে স্থির করেছি কাজটি করবো না।

ধীর, উদাস ভাবে বলল এমিলিয়া—কেন?

আমি এমিলিয়ার পাশে এসে বসে ওর মুখের দিকে তাকালাম। কারণটা তোমার ভালোমতই জানা, এ কাজ আমার পছন্দ নয়, একমাত্র তোমায় ভালোবাসি, বলে মূল্যবান ফ্ল্যাটটি কিনে কিস্তিতে টাকা দেব ঠিক করেছি। কিন্তু যখন জেনেছি যে তুমি আমায় ভালবাসো না আর, এ অনর্থক, কোন দরকার নেই এর—

এমিলিয়া কিছু না বলে বোকার মত শুধু তাকিয়ে রইল।

আমি বলে চললাম, তুমি আমায় আর ভালবাসো না। কার জন্যে এসব কাজ করবো? ফ্ল্যাটটি হয় বিক্রী করে দেবো নয়তো বাঁধা দিয়ে দেবো—এক্ষুনি বাত্তিসতা টেলিফোন করবেন,—তাকে জানিয়ে দেব, আর তাঁর কাজ করব না।

আমার বক্তব্য শেষ করে উন্মুখ হয়ে এমিলিয়ার উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইলাম। আমার বক্তব্য শুনে তার বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। অবশেষে বলল, তোমায় ভালবাসি না কিসে বুঝলে?

আমি বললাম, আগে তুমি বল, আমার ধারণা ঠিক কিনা।

না, আগে তুমিই বল।

সব—সব কিছুতেই। আমার সঙ্গে তোমার কথার ভঙ্গিতে, তোমার চোখের চাউনিতে, ব্যবহারে। এক মাস আগেও তুমি আলাদা থাকতে চেয়েছিলে, এর আগে তো তুমি কখনও ওরকম করতে না।

সে স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার জলে ভরা চোখ দুটি লক্ষ্য করলাম।

স্মিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে এমিলিয়া উত্তর দিল, বিশ্বাস কর, খড়খড়ি খুলে রাখলে আমার একদম ঘুম হয় না। তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি। এছাড়া তুমি যা জোরে নাক ডাকো, আমার রোজ ঘুম ভেঙে যায়। তাই একা ঘুমোতে

চেয়েছিলাম।

কিন্তু তুমি তো আমাকে এর আগে কখনও বলোনি। আমি বিশ্বাস করলাম না ওর কথা। বললাম, আমি জানি, তুমি আমায় ভালোবাসো না, যে স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে সে তোমার মত আচরণ করে না।

এমিলিয়া আমায় বাধা দিল। সত্যি তুমি কি চাও আমি জানি না। তুমি যখনই আমায় কাছে পেতে চাও, তখনই কাছে এসেছি, কখনও কি না বলেছি তোমায়?

আমি এমিলিয়ার স্পষ্ট কথায় লজ্জা পেলাম। যে এমিলিয়া এতদিন সংযত গম্ভীর ছিল—সে যেন তার শালীনতাবোধও সারল্য হারিয়ে ফেলেছে। এখন তার চরিত্রে কপটতা স্থান পেয়েছে।

এমিলিয়া আবার বলল, তুমি তাতেও খুশী হওনি। তাছাড়া শুধু সম্ভোগেই তৃপ্তি পাওয়ার পাত্র তুমি নও—তুমি তো ও কাজে পটু।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমায় ভালো না বাসলে তোমার প্রেমলীলায় আপত্তি করতাম, তোমায় পাশ কাটিয়ে চলতাম। মেয়েরা ইচ্ছে করলে একটা না একটা অছিলায় পুরুষকে এড়িয়ে যেতে পারে, তাই না?

বললাম, বুঝলাম সবই, তবু যে ভালবাসে সে তোমার মত করে না।

কী করি আমি, বলল এমিলিয়া।

যাই বল না কেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই ব্যস্।

আমার মুখের গতিবিধি লক্ষ্য করল সে। তার মুখটা কুঁচকে গেল। দুচোখে ফুটে উঠল বিস্ময়, স্তিমিত চোখের তারা চক্ষুকোটরের মধ্যে মামের মত গলে পড়ল। কোন বিপদে পড়লে কিংবা নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে হলেই এমন অবস্থা হয় তার।

ও ওর নরম হাত দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো আমায়। বলল, ছিঃ ও কথা বলছো কেন রিকার্ডো। আমি তোমায় ভালবাসি আজও। ভালোবাসি ঠিক আগের মতন।

এমিলিয়ার উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার কপালে অনুভব করলাম। আমার মাথাটা বুকের ভেতর টেনে নিল সে।

আমার মনে হল, এ চাতুরী। মুখের ভাব লুকোবার জন্যেই সে আমায় জড়িয়ে ধরেছে। তখন কিছু বললেই ও রেগে যাবে। তাই তার এ হাবভাব

অর্থপূর্ণ হলেও চুপ করে রইলাম।

সে সাবধানী কণ্ঠে বলল, আচ্ছা তোমায় যদি না ভালোবাসি তাহলে কি করবে বলো তো?

আমি তাহলে ভুল করিনি। আমি জিতে গেছি এমিলিয়ার কাছে। তার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সে যেন পরিমাপ করতে চায়, জানতে চায়, তার স্পষ্ট উক্তির বিপদ কতটা। তার নরম উষ্ণ বুকে মুখ রেখেই বললাম, তোমায় তো প্রথমেই বলেছি, তাহলে ব্যক্তিসত্তার কাজটা নেব না।

মনে করলাম, একবার তাকে জানিয়ে দিই তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাব। কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সমর্থন পেলাম না। তখনও আশা করেছিলাম—সে ভালোবাসে আমায়।

মনোমালিন্যের ভয়ে আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। এমিলিয়া তার বুকের কাছে নিবিড়ভাবে টেনে নিল। বলল, সত্যিই—আমি তোমায় ভালোবাসি—ভালোবাসি—। আর সব সত্যি নয়—আজগুবি, মিথ্যে। এখন তুমি কি করবে জানো? ব্যক্তিসত্তার ফোন এলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করার দিন ঠিক করে নাও। তারপর কাজটি আরম্ভ কর।

আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। বললাম, কেন, কেন আমি তোমার কথা শুনবো?

বলেছি তো, আমি তোমায় ভালোবাসি? তবু কেন বার বার একই কথা বলাতে চাইছো—আমি তো তোমার সঙ্গেই রয়েছি—এও কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়? তবে হ্যাঁ, যদি ভেবে থাক যে আমি তোমায় ভালোবাসি না বলেই কাজটা নিচ্ছ না, তাহলে তুমি ভীষণ ভুল করছো?

মনটা কিছুটা আশ্বস্ত হল। তবু তার প্রেমের অকাট্য প্রমাণ পেতে চাই।

সে যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরে আলিঙ্গন আলগা করে চাপা স্বরে বলল, একটা চুমু খাও না—খাবে না বুঝি?

চুমু খাবার জন্য মুখটা তুলে ধরলাম। এ কি তার মুখে অবসাদের ছায়া কেন? তার চিবুকটি ধরে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট আনলাম।

এমন সময় ফোন বেজে উঠলো। এমিলিয়া নিজেকে মুক্ত করে ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে। আমি চুপ করে বসে রইলাম সোফায়।

এমিলিয়া বাত্তিসতার সঙ্গে দু চারটে কথা বলার পর বলল, এবার আপনি রিকার্ডোর সঙ্গে কথা বলুন, মিঃ বাত্তিসতা।

আমি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরলাম।

বাত্তিসতাকে জানিয়ে দিলাম কাল তার অফিসে যাব।

ইতিমধ্যে এমিলিয়া চলে গেছে। সে তার কাজ হাসিল করেছে। এখন তার উপস্থিতি কিংবা সোহাগের প্রয়োজন নেই আর।

সপ্তম অধ্যায়

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে বাপ্তিসতার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একটি পুরোনো আমলের বাড়ির দোতলায় বাপ্তিসতার অফিস। এখানে আরও অনেক অফিস আছে। ছোট ছোট কাঠের পার্টিশান দিয়ে কামরাগুলি ভাগ করা আছে।

চিত্রনাট্য নির্মাতা বয়েসে এখনও তরুণ। কয়েক বছরের মধ্যে বেশ পয়সা রোজগার করেছে। তাঁর চিত্রনাট্য-প্রতিষ্ঠানের নামহলো—'বিজয় ফিল্মস'। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য প্রতিষ্ঠান।

বাইরের ঘরে তখন বেশ ভীড় জমেছে। এ-লাইনে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। মুখ দেখেই বলতে পারি, কে কোন উদ্দেশ্যে এসেছে। তাদের মধ্যে দুচারজন নাট্যকার, সিনেমা অরগানাইজার, অভিনেতা· বেকার, পরামর্শদাতা ও মিস্ত্রী রয়েছে। দু'তিনটে ভাবী অভিনেত্রীও চোখে পড়ল। তরুণী ও সুন্দরী হলেও ভাব ভঙ্গিমায়, অতিরিক্ত প্রসাধনে ও পোষাকের চাকচিক্যে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল তাদের। ঘন ঘন টেলিফোন বেজে উঠছে, সামনে দুজন মহিলা বসে আছেন, তাঁরাই যোগাযোগ রক্ষা করছেন।

মাঝে মাঝে জোরে বেল বেজে উঠছে, মহিলা দুজন এক একজন ভিজিটারের নাম ধরে ডাকছেন, তারা ডাক শুনে লাফিয়ে উঠে সাদা ও সোনালী দরজার ভেতর দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছেন।

আমি আমার নামটা লিখিয়ে ঘরের শেষ সীমান্তে গিয়ে বসলাম। আমার মনের ভাব অপরিবর্তিত রয়েছে। ভেবে দেখেছি. এমিলিরা আমায় ভালবাসে না। তবু ঠিক করেছি, বাপ্তিসতার নতুন কাজটা করবো। প্রয়োজন হলে এমিলিয়ার কাছ থেকে তার মনের কথা জেনে নিয়ে কাজ ছেড়ে দিতে পারবো।

অনেকটা শান্ত হয়ে অপেক্ষা করছি। কিন্তু জানি, এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। বেদনা, বিষণ্নতা ও বিদ্রোহের ভাব মনে জেগে উঠবে। এতক্ষণ কেবল ভেবেছি। এমিলিয়া আমায় ভালোবাসে কি না। এবার মনে হল, না, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন—কেন সে ভালোবাসে না আমায়? তার অবজ্ঞার কারণ জানতে পারলেই জোর করে কৈফিয়ৎ আদায় করা সহজ হবে।

মনে এই বিশ্বাস আনতে পারলাম না। আমাকে ভালো না লাগার কোন কারণই থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, অকারণেই সে আমায় ভালোবাসে না। কারণটা কি হতে পারে। সংশয় যেখানে বেশী সেখানেই মানুষ মনের মিথ্যা বিশ্বাসকে আশ্রয় করে আঁকড়ে ধরে, মনের আবেগে যা কিছু অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে তাই যেন যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে চায়।

রহস্য কাহিনীর গোয়েন্দার মত আমি অনুসন্ধান করবো।

এমিলিয়া আমায় যে ভালোবাসে না, তার কারণটা কি? সে হয়তো অন্য কাউকে ভালোবাসে। এ ধারণাও মনে পোষণ করা যায় না। তার আচার-ব্যবহারে এতটুকু সন্দেহ হয় না যে তার জীবনের সঙ্গে অন্য কেউ জড়িয়ে আছে। বরং তার উল্টো দেখা গেছে। আমার ওপর বেশী নির্ভর করে সে। সারাক্ষণ একলা ঘরে কাটায়। দু'চারজন বান্ধবী ছিল, বিয়ের পরেও কিছুদিন বন্ধুত্ব বজায় ছিল, কিন্তু অবশেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আমি তাতে বিরক্ত বোধ করলেও তার এতটুকু নির্ভরতা কমলো না, আর কাউকে খুজল না। আজও সে একইভাবে আমার প্রতীক্ষায় দিন গোনে।

কিন্তু তার ভালোবাসাটুকু লোপ পেয়ে গেছে। এক কথায় বলা যেতে পারে, আমার ওপর ভালোবাসা না থাকলেও এটা প্রায় নিঃসন্দেহ যে আমি ছাড়া এমিলিয়ার জীবনে দ্বিতীয় পুরুষের স্থান নেই।

এ ছাড়া আর একটি প্রমাণ আছে, সে কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। যা সত্য নয় কিংবা যার কোন অস্তিত্ব নেই, তা সে বানিয়ে বলতে পারে না। এটাই তার চরিত্রের বিশেষত্ব। চুপ করে থাকাও তার পক্ষে কঠিন নয়। তার ঔদাসীন্যের অর্থ অন্যজনের প্রতি আকর্ষণ নয়। কারণ যদি কিছু থাকে, তাহলে তা আমার জীবনেই সুপ্ত আছে।

আমি এত চিন্তায় মগ্ন ছিলাম যে শুনতেই পাচ্ছিলাম না, বাত্তিসতার সেক্রেটারী আমার সামনে দাঁড়িয়ে বার বার বলছেন, মিঃ মলটোনি, আপনার জন্যে ডঃ বাত্তিসতা অপেক্ষা করছেন।

হঠাৎ চমকে উঠে আত্মস্থ হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটলাম।

ঝকঝকে সুসজ্জিত একটি ঘরে বাত্তিসতা বসেছিলেন। বাত্তিসতা লম্বা নন, কাঁধ দুটি বেশ চওড়া, দেহটাও মোটা, পা দুটো সেই তুলনায় সরু ও ছোট। মাথায় বিরাট টাক, ছোট ছোট চোখ, মোটা নাক, সারা গায়ে কালো কালো লোম। কিম্ভূতকিমাকার দেখতে হলেও তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। উচ্চারণ

ছিল স্পষ্ট ও সুন্দর। কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি।

বাত্তিসতার সঙ্গে অন্য আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন। বাত্তিসতা তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, নাম রেনগোল্ড।

আমার সঙ্গে তার পরিচয় না থাকলেও নাম শুনেই চিনতে পারলাম। প্রাক মহাযুদ্ধের যুগে জার্মান চিত্রনাট্য নির্দেশক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন তিনি।

রেনগোল্ড আমার সঙ্গে করমর্দন করার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

বাত্তিসতা বললেন, রেনগোল্ড ও আমি বলছিলাম ক্যাপ্রির কথা—ক্যাপ্রি জানেন তো, মিঃ মলটেনি ?

হ্যাঁ।

বাত্তিসতা বললেন, ওখানে আমার একটা সুন্দর বাগানবাড়ী আছে। যেখানে গেলে আমার মত নীরস পাকা ব্যবসায়ীরও কাব্য-চর্চা করতে হচ্ছে করবে—সব ত্যাগ করে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাত্তিসতা নিজের কথায় নিজেই মোহিত হতে শুরু করলেন, নয়ন-মুগ্ধ প্রকৃতি উদার-নির্মল আকাশ, চির নীল সমুদ্র আর সর্বত্র ফুলের অপূর্ব সমারোহ, আপনার মত লেখক হলে আমি ক্যাপ্রিতে বাস করে প্রকৃতির থেকে প্রেরণা পেতাম। কেবলই মনে হয়, শিল্পীরা ক্যাপ্রির প্রাকৃতিক দৃশ্য না এঁকে এমন সব ছবি আঁকে যার কোন মানে হয় না।

আমি কোন কথা না বলে রেনগোল্ডের দিকে আড়চোখে তাকালাম।

বাত্তিসতা সমানে বলে চললেন, জানেন, এক এক সময় ভাবি কাজ কর্ম সব ছেড়ে কিছুদিন গিয়ে থাকি। কিন্তু সময়ের বড়ই অভাব। আমাদের চেয়ে ক্যাপ্রির লোকেরা ঢের বেশী সুখী। ওরা উচ্চাভিলাষী ও স্বার্থপর নয়, তাই ওদের দুঃখ ও অভাবের মাত্রাও কম—সত্যিই কি সুখী তারা!

বাত্তিসতা মুহূর্তের জন্যে কথা বন্ধ করলেন। আবার শুরু করলেন, জানেন, চিত্রনাট্য রচনার পক্ষে ক্যাপ্রিই হবে সর্বোত্তম স্থান, বাইরের প্রকৃতি থেকে উৎসাহ পাওয়া যাবে যথেষ্ট—বিশেষ করে রেনগোল্ডকে বলছিলাম—সেখানকার বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্রনাট্যের বিষয়-বস্তুর সাদৃশ্য রয়েছে।

রেনগোল্ড বললেন, দেখুন বাত্তিসতা, কাজ যেখানে খুশী করা যায়—তবে,

ক্যাপ্রি আমাদের কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হতে পারে—যদি কয়েকটি শট্‌স নেপল্‌স্‌ উপসাগরে গিয়ে নেওয়া যায়।

বাত্তিসতা বললেন, নিশ্চয়ই, রেনগোল্ড ঠিকই বলেছেন। আপনি ও আপনার স্ত্রী আমার বাগান বাড়ীতে গিয়ে থাকুন না, মিঃ মলটোনি অন্ততঃ কেউ সেখানে থাকলে আমি খুশী হব। সব সুবিধা রয়েছে সেখানে—ঝি-চাকর পেতে কোন কষ্ট হবে না।

সেই সময় এমিলিয়ার কথা মনে পড়ল আমার। কেন জানি না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হল আমার ধারণা।

তাই বাত্তিসতাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, চিত্রনাট্য রচনার পক্ষে ক্যাপ্রি যে প্রশস্ত এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই—আপনার বাগান বাড়ীতে বাস করতে পারলে আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই আনন্দিত হবো।

বাত্তিসতা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে আমার হাতটা ধরলেন। তাহলে আপনারা ক্যাপ্রিতে যাবেন! বেশ, বেশ, এবার আমাদের চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

মনে ভাবলাম, আমার এ হঠকারিতা নিশ্চয় সমর্থন করবে না এমিলিয়া। সত্যি, এমন আগ্রহ দেখানো ঠিক হয়নি। বলা উচিত ছিল—ভেবে দেখি। লজ্জা বোধ করলাম তাই।

বাত্তিসতা বললেন, আমরা সবাই একমত যে চিত্রশিল্পে নতুনত্ব আমদানি করতে হবে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবো, কী চায়—আজকের দর্শক সমাজ ?

প্রত্যক্ষ আক্রমণের পক্ষপাতী নন বাত্তিসতা। তিনি ছিদ্রান্বেষী নন—হয়তো নিজেকে সেভাবে জাহির করতে চান না। পরিষ্কারভাবে না বলাই তাঁর স্বভাব।

একটু চিন্তা করে বাত্তিসতা বললেন, আমার ধারণা, লোকে এখন আর একঘেঁয়ে উগ্র আধুনিক বাস্তবধর্মী চিত্র পছন্দ করে না। কারণ ওসব ছবি স্বাস্থ্যকর নয়। এ ধরণের ছবি মানুষের মনে প্রেরণা জাগাতে পারে না, জীবনকে অবিশ্বাসী করে তোলে, জীবনের অন্ধকার দিকটাই সেখানে প্রতিফলিত হয়, এসব ছবি সুস্থ আনন্দময় জীবনযাপনের পথ দেখায় না।

আমি বাত্তিসতার মুখের দিকে তাকালাম। তিনি যা বলছেন তা নিজে বিশ্বাস না করলেও তার কথার মধ্যে আন্তরিকতা রয়েছে।

বাত্তিসতা বললেন, এইমাত্র রেনগোল্ডে যা প্রস্তাব করেছেন আপনাদের—মানে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতিপুঞ্জের কাছে হোমার অ্যাংলো স্যাক্সনদের 'বাইবেল'এর মতো—যেমন ধরুন, হোমারের 'ওডিসি'—'ওডিসি'র রূপায়ণ করেন না কেন আপনারা ?

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, গোটা ওডিসি. না তার কোন একটি উপাখ্যান ?

গোটা ওডিসিটা নিলেই ভালো হয়। তার চেয়ে বড় কথা হলো, ওডিসিটা একবার ভালো করে পড়া—বুঝেছি—অতি বাস্তবধর্মী চিত্রে কোন জিনিসটার সত্যিকারের অভাব। সবার মূলে রয়েছে কাব্য। আপনিও রেনগোল্ড সেই কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করবেন।

বললাম ওডিসি হল একটি স্বতন্ত্র জগৎ, সেখান থেকে লোকে যা চায়, তাই পেতে পারে, তবে সেটা নির্ভর করে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।

আমার উৎসাহের অভাব দেখে বাত্তিসতা একটু ভীত হলেন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। বললেন 'ওডিসি' পড়ে আমার ধারণা হয়েছে, তার কাব্যে সৌন্দর্য্য অতুলনীয় অপরূপ, বিজয় ফিল্মস আধুনিক রুচির উপযোগী করে ফুটিয়ে তুলবে 'ওডিসি'র সেই অভিনব দৃষ্টিগুলি।

চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, বাত্তিসতার যা ধারণা, আমার ধারণা তা নয়। হলিউড থেকে বাইবেল অবলম্বনে যে সব ছবি বেরোয় ঠিক তেমনি। সেখানে থাকবে দৈত্য-দানব, নর-নারী, প্রেম-প্রতিহিংসা, বা গাড়ম্বর।

বললাম, বিষয়বস্তুটি আমার পক্ষে একটু কঠিন হবে। আমি হয়তো পারবো না, আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। দেখুন বাত্তিসতা, মননত্বমূলক চিত্রই আমার ভালো লাগে—আমার মনে হয়, আপনাদের প্রস্তাবিত চিত্রে শুধু দৃশ্য ছাড়া আর কিছু নেই।

বাত্তিসতা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না। রেনগোল্ড হঠাৎ বলে উঠলেন, চিত্রটি সম্বন্ধে মিঃ বাত্তিসতা বিশদভাবে সবই বলেছেন, অবশ্য চিত্র-নির্মাতা হিসাবে বলেছেন। আপনি যদি মনস্তত্ত্ব চান, তাহলে নিঃসন্দেহে কাজটি নিতে পারেন। কারণ চিত্রের কাহিনীর মধ্যে ইউলিসিস ও চানিলোপের মনস্তত্ত্ব গৌণ—আমি ছবি তুলবো এমন একটি লোক নিয়ে যে তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসে, কিন্তু স্ত্রীর ভালোবাসা পায় না পরিবর্তে।

হঠাৎ আমার বুকটা ছ্যাং করে উঠল। মনে পড়ে গেল এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা।

কল্পনা—নয়নে দেখলাম—

আমি আমার চিত্রনাট্য লিখছি। এত কাজে ব্যস্ত যে আমার টাইপিষ্ট মেয়েটির দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারিনি একবারও। টাইপ মেশিনের চাবি টিপে ভুলটি সংশোধন করতে চাইলাম। হঠাৎ তার হাতে হাত লাগল। সে হাতটা সরিয়ে নিল। এবার ইচ্ছে করেই তার আঙুল স্পর্শ করলাম, তার মুখের দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হতেই বলল, মাফ করবেন. ভুলটা চোখে পড়েনি। তার দিকে আবার নজর করলাম। আমি কি কোন আবেগ দেখিয়েছি? অবশেষে সে যা চেয়েছিল তাই হল, দৃষ্টি বিনিময় হল, ব্যাকুল চঞ্চলভাবে তার লাল ঠোঁটে একটু চুমো খেলাম।

সে যেন ভাবলো—আমায় তার নাগালের মধ্যে পেয়েছে। মুখ নীচু করে টাইপ করতে লাগল। জানি, তাকে আমি ভালবাসি না। আমার কাছ থেকে সে জোর করেই চুমু আদায় করেছে। খর্ব করেছে আমার পৌরুষের অভিমান।

ইচ্ছে করেই যেন আর একটা ভুল করলাম। শুধরে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম। মুখটি মুখের কাছে আনতেই সে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে রইলাম দুজনে। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে এমিলিয়া ঘরে ঢুকল। তারপর তখুনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মেয়েটিকে বিদায় দিয়ে শঙ্কিত মনে শোবার ঘরে এলাম। আমায় দেখে বলল, এমিলিয়া, ঠোঁটের লাল রঙটা দয়া করে মুছে ফেলো।

রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছে নিয়ে ওর পাশে বসলাম। বোঝাবার চেষ্টা করলাম, আমার কোন দোষ নেই। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল এমিলিয়া। বলল, সত্যিই যদি ঐ টাইপিষ্ট-মেয়েটাকে ভালোবাস, তাহলে বললেই পারো—আমি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিতাম বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব।

তার করুণ-বিষাদ মাখা কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল কৈফিয়ৎ চাওয়ার জিজ্ঞাসা। আমি তাকে অনেক বোঝানো সত্ত্বেও কোন কথা শুনলো না। শেষ পর্যন্ত আমায় ক্ষমা করতে রাজী হল।

এমিলিয়া আমায় ছেড়ে চলে যাবে এ যেন অচিন্ত্যনীয়। আমি সেই দিনই মেয়েটাকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলাম, তাকে আর আমার দরকার নেই।

আগে একথা ভাবিনি কেন ?

এমিলিয়া তখন দেখিয়েছে—ঘটনাটিকে সে গুরুত্বই দেয়নি, কিন্তু আসলে অজ্ঞাতসারে অশান্ত হয়ে উঠেছিল তার হৃদয়। সে নীরবে মেনে নিয়েছিল—ওটা আমার সাময়িক দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছু নয়, কিন্তু কষ্ট পেয়েছিল তাতে।

স্বপ্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ রেনগোল্ডের কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল, শুনছেন মিঃ মলটেনি।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। গা ঝেড়ে ঠিক হয়ে বসলাম। আমি আমার মতামত জানালাম, এক হিসেবে ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপের প্রেমই হল সমগ্র ওডিসির ভিত্তি।

রেনগোল্ড স্মিতহাস্যে আমার এ উক্তি খণ্ডন করলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আনুগত্যও একরকম প্রতিহিংসা—জোর করে ভালবাসা আদায় করা। আনুগত্য আর প্রেম এক নয়—

সত্যিই তো। আনুগত্য ও ঔদাসীন্যের জায়গায় যদি হয়তো বিশ্বাস-ঘাতকতা—তাহলে দুঃখ থাকতো না। যদি অবিশ্বাসিনী এমিলিয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতাম। কিন্তু তার বদলে আমিই যে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি তার কাছে।

মন অথৈ সাগরে ডুব দিচ্ছিল। অশান্ত হয়ে উঠলাম বাত্তিসতার কথায়—তাহলে আপনি রেনগোল্ডের সঙ্গে কাজ করতে রাজী আছেন মিঃ মলটেনি ?

হ্যাঁ, হাঁ, রাজী।

বাত্তিসতার মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তি ও আনন্দ। বললেন, তাহলে রেনগোল্ড একসপ্তাহের জন্যে প্যারিস যাচ্ছেন। আর আপনি এর মধ্যে ওডিসির একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরী করে ফেলুন। রেনগোল্ড ফিরে এলেই আমরা ক্যাপ্রিতে যাব। কাজ শীঘ্র আরম্ভ করব।

রেনগোল্ড ও আমি উঠে দাঁড়ালাম। অপ্রত্যাশিত ভঙ্গীতে নির্লিপ্ত সুরে বাত্তিসতা বললেন, আপনার চুক্তিপত্র তৈরী আছে। এ ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে আপনার পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুধু একবার সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে সই করে টাকাটা নিতে হবে আপনাকে।

আমি ওঁর ব্যবহারে অবাক হয়ে গেলাম। মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

তারপর সেক্রেটারীর ঘরে গিয়ে চুক্তিনামায় সই করে চেকটি নিয়ে এলাম।

বাত্তিসতা রেনগোল্ডের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর আমার কাঁধ চাপড়ে নতুন কাজে সাফল্যের জন্যে তাঁর শুভেচ্ছা জানালেন।

বাত্তিসতা তাঁর দপ্তরে ঢুকলেন।

আমি অবাক হয়ে রেনগোল্ডের দিকে তাকালাম। তিনি যেন আমার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে জড়িয়ে ধরে কানের ওপর মুখ রেখে বললেন, কিছু ভাববেন না মশাই—বাত্তিসতা যা বলেন বলতে দিন। আমরা মনস্তত্ত্ব-মূলক ছবিই তুলবো—একেবারে খাঁটি মনস্তত্ত্বমূলক।

আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চললেন। আমিও সামনের দিকে অগ্রসর হলাম।

অষ্টম অধ্যায়

বেলা সাতটার সময় বাড়ী ফিরে দেখি এমিলিয়া নেই। বুঝলাম বাইরে গেছে, দু ঘণ্টার আগে ফিরবে না। গভীর হতাশায় মনটা ভরে গেল। ভেবেছিলাম, সেই টাইপিণ্ট মেয়েটির সম্বন্ধে কথা বলব আজ। সেই চুম্বনই অসন্তোষের মূল কারণ। কয়েকটি কথা বলে এমিলিয়ার মনের মেঘ কাটিয়ে ফেলব, তারপর তাকে দেব সুসংবাদ। বলব - 'ওডিসি' চিত্রনাট্যের কথা, অগ্রিম টাকা পাওয়ার কথা, ক্যাপ্রিতে যাবার কথা।

এখন মাত্র দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। দু-ঘণ্টা পরে হয়তো মনের বল থাকবে না। তবু আশান্বিত হয়ে রইলাম।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে শেল্‌ফের ওপর থেকে 'ওডিসি'র অনুবাদটি খুঁজে বের করলাম। তারপর টাইপ-রাইটারে কাগজ লাগিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সংক্ষিপ্তসার তৈরী করতে বসলাম।

কিছুটা টাইপ করার পর নানা চিন্তা মনের মধ্যে এসে ভিড় করলো। অবসন্ন মন নাগালের বাইরে চলে গেল, তাকে কিছুতেই হাতের মুঠোয় আনতে পারছিলাম না।

বিতৃষ্ণা এসে গেল নিজের এই বৃত্তির ওপর। আর আসবে নাই বা কেন? জেনেছি—এমিলিয়া ভালবাসে না আমায়; এতদিন শুধু তাকে খুশী করার জন্য কাজ করেছি। আমার ওপর যদি তার ভালবাসা না থাকে, তাহলে কাজ করে কি হবে?

কতক্ষণ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম জানি না। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ ও পায়ের আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম এসেছে। দরজাটি ঠেলে বন্ধ করে এমিলিয়া আমার পাশে এল। বলল, বাত্তিসতার সঙ্গে দেখা করেছো?

বললাম, হ্যাঁ, সবই ঠিক হয়ে গেছে। অনেক টাকাও দেবেন এবং চুক্তিপত্রে সইও হয়ে গেছে। একটির বিষয়বস্তু হল 'ওডিসি'। কিন্তু আমার ওটা করতে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু আজ সকালেও তো ইচ্ছে ছিল তোমার—বলল এমিলিয়া।

এই তো তার সঙ্গে বোঝাপড়ার সুযোগ। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর হাতখানি চেপে ধরলাম। বললাম, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

সজোরে টানতে টানতে পাশের ঘরের একটি চেয়ারের দিকে তাকে ঠেলে দিলাম। বললাম, বসো, এবার শোনো।

অসহিষ্ণুভাবে আমার দিকে চেয়ে এমিলিয়া বলল, বল—

মনে পড়ে, কাল তোমায় বলেছিলাম, তুমি আমায় ভালবাসো কিনা ঠিক জানি না বলেই চিত্রনাট্য সম্পাদনার ভার নেবার ইচ্ছে নেই—তুমি বলেছিলে আমায় তুমি ভালবাসো, কাজটি নেওয়া উচিত, না? কিন্তু আমি বলেছিলাম তুমি মিথ্যে বলছো—আমারই প্রতি সমবেদনায় করুণায় কিংবা নিজের স্বার্থে।

বাধা দিয়ে এমিলিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলল—কি স্বার্থে?

আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটলো ওর চোখে মুখে। চেঁচিয়ে উঠে বলল, কে বলেছে তোমায়, তুমি আমায় জানো না। যে কোন মুহূর্তে আমি এই ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে পারি, আমার আছে এটা অতি সামান্য—

মনে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম, এই ফ্ল্যাটের জন্যে আমি কি না করেছি। নিজের আদর্শ, নীতি সব বিসর্জন দিয়ে চিত্রসম্পাদকের কাজ নিয়েছি। এ যেন আমার কল্পনার বাইরে।

আমার যন্ত্রণা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হল না। নিজেকে সংযত করে বললাম, আচ্ছা, সে কথা থাক, কাল কোন কারণে বলেছ. আমায় ভালবাসো একথা মিথ্যে। তাই আমার একাজে উৎসাহ নেই আমার, কি লাভ হবে কাজ করে?

জানলার দিকে চেয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে সে বলে, কেন এসব জানতে চাও তুমি? এসব নিয়ে মাথাব্যথা করো না, দুজনেরই মঙ্গল হবে। আমি কিছুই বলতে চাই না। কেবল একটু শান্তি চাই। আমি এবার যাই। জামাকাপড় ছাড়া হয়নি—

সে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই আমি ধরে ফেললাম হাতটা। সে আমাকে বাধা দিল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বলল—বল, কী চাও তুমি? ও হ্যাঁ, কয়েকটা কথা বলার ছিল। যাক, আমার হাতটা ছেড়ে দাও।

সে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইল না, নড়ল না এক পাও। এই অবজ্ঞামাখা আত্মসমর্পণের চাইতে সে যদি বিদ্রোহ করতো, তাহলে তা ভালোই হত। ওর হাতটা ছেড়ে দিয়ে সজোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। হঠাৎ উত্তেজনা অনুভব করলাম। পরক্ষণেই মনে নিরাশার ঝঙ্কার বেজে উঠলো।

আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়বো না। সত্যি কথা বলতে হবে এক্ষুণি, সত্যি কথা না বলে এ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না—বলে উঠলাম আমি।

আমার দিকে তাকিয়ে রইল এমিলিয়া আমার মাথার ওপর তার চঞ্চল দৃষ্টি অনুভব করলাম। শেষে বলল—ঠিক আছে শোনো তবে, ভেবেছিলাম যেমন চলছে চলুক, কিন্তু সত্যিই তোমায় আর ভালবাসতে পারি না আমি।

যখন কোন কল্পনা নির্মম সত্যের আকার ধারণ করে তখন বেদনায় ছেড়ে যায় মন, বিশ্বাস হয় না কিছুতেই—এ সত্য। জানি এমিলিয়া আমায় ভালোবাসে না। তবু তার মুখে একথা শুনে বুক কেঁপে উঠলো। এ যেন কল্পনা নয়—অবাঞ্ছিত সত্য।

প্রকৃতিস্থ হয়ে যথাসম্ভব ধীর কণ্ঠে বললাম, এসো বসো, বল কেন ভালোবাসো না আমায়।

কি আর বলবো? তোমায় ভালবাসি না, এই পর্যন্তই।

সীমাহীন অব্যক্ত বেদনা সর্বাঙ্গে কাঁটার মত বিঁধে হল। তবু মুখে ম্লান হাসি টেনে বললাম, এ কথা অস্বীকার করবে না নিশ্চয়ই—কারণটা আমায় জানানো দরকার। আচ্ছা, তুমি তো আগে আমায় ভালবাসতে।

হ্যাঁ, আগে বাসতাম। এখন সব শেষ হয়ে গেছে। কোন কারণ নেই। শুধু জানি, আমি তোমায় ভালবাসি না।

এখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই—ভারাক্রান্ত চিত্তে বলি।

দুজনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। শেষে বললাম, ভালো না বাসার কারণটা যদি আমি বলে দিই, তাহলে তুমি সত্যি বলবে। বেশ, বল, শুনি।

কারণ আমার চিত্রনাট্যটি টাইপ করেছিল যে মেয়েটি তাকে আমি চুমু খেয়েছিলাম একটা। এটাই প্রথম এবং শেষ। এবার সত্যি করে বলতো ঐ চুমুটাই কি আমাদের ব্যবধানের মূল কারণ নয়?

বিস্ময় ও অস্বীকৃতির চিহ্ন ফুটে উঠল এমিলিয়ার মুখে। ধীরে ধীরে মুখের ভাব বদলে বলল—আচ্ছা যদি তাই হয়, কী হবে জেনে ?

বুঝলাম সামান্য একটি চুম্বনই তার অকৃত্রিম ভালবাসা হারাবার কারণ নয়, আরও মারাত্মক কারণ আছে। নিষ্ঠুর নয় এমিলিয়া। আমি ব্যথা পাব বলেই আসল কথাটি বলছে না— সত্য প্রকাশ করছে না।

আমি তবু বারবার একই প্রশ্ন করে চললাম— আর কোন কারণ আছে ?

মা যেমন অশান্ত শিশুকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি বিরক্ত হয়ে উঠলো এমিলিয়া।

না, তুমি সত্যি কথা না বলে যেতে পারবে না, বললাম আমি।

এমিলিয়া বলে, বলেছি তো তোমায় আমি ভালোবাসি না।

—কি গভীর প্রতিক্রিয়াই না শুরু হলো এ তিনটি শব্দে। মুখখানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বললাম, ভেবেছো কি, তোমার সঙ্গে খোস গল্প করতে এসেছি ?

এমিলিয়ার ঘাড় ধরে মাটিতে ফেলে দিলাম। গর্জে উঠলাম—এক্ষুণি বল, আসল কারণটা কি।

এমিলিয়া নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। ওর মুখটা লাল হয়ে গেল।

তার গলা জোরে টিপে ধরলাম। চিরদিনের জন্যে শত্রু করে রাখার চেয়ে খুন করে ফেলাই ভালো।

আমার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি মেরে এমিলিয়া নিজেকে মুক্ত করে নিল। না না না, তোমায় আমি ভালোবাসি না। আমি তোমায় ঘৃণা করি, তোমার স্পর্শে বিরক্তি অনুভব করি। এই হল আসল কথা।

নবম অধ্যায়

এমিলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে কিছুদিন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়েছিল। তারপর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড শেখে। তার বাবা অর্থ দপ্তরে সামান্য মাইনের কাজ করতেন। তবে সদ্বংশে তার জন্ম। সাধারণ জ্ঞানই এমিলিয়ার একমাত্র সম্বল। কোন বিষয় সম্বন্ধে একটু চিন্তা করে সত্যেরই মত অভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করতে পারতো এমিলিয়া, কিন্তু নিজে তা বুঝতে পারতো না। তাই আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ পেতো না।

তাই যেদিন এমিলিয়া জানালো—আমি ভালোবাসি না তোমায়, ঘৃণা করি—সেদিনই আমার মনে এতটুকু সন্দেহ রইল না, যে তার কথা একবিন্দুও মিথ্যে নয়। তবু লক্ষ্য করলাম, সে যেদিন আমায় তার প্রথম প্রেম জানিয়েছিল, সেদিন যেমন অকপটে বলেছিল—আমি তোমায় ভালোবাসি, আজও ঠিক তেমনি সরলভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছে—আমি তোমায় ঘৃণা করি।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলাম। নিজের বোধশক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি। বিত্তহীন হলেও নিজের ওপর এতদিন আমার শ্রদ্ধা ছিল। জীবনে আজ প্রথম অনুভব করলাম—এতদিন কেবল মিথ্যে তোষামোদ করে এসেছি নিজেকে।

মস্তিকের ভেতর যেন দাবানল জ্বলছে, বাথরুমে গিয়ে কলের তলায় মাথা দিলাম। তারপর শোবার ঘরে ফিরে এলাম। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এখানে বসে দুজনে রোজকার মত একসঙ্গে খেতে পারবো না। এ ঘরেই যে ধ্বনিত হচ্ছে সেই ভয়ংকর শব্দহীন, যা শুনে এমন বিমূর হয়ে পড়েছি আমি।

দরজা খুলে এমিলিয়া দেখল। ওর মুখের ভাব এমনই, যেন কিছুই হয়নি।

কোনদিকে না তাকিয়েই বলল—আমরা বাইরে যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে এসো।

একটু পরেই বেরোলাম। গাড়ীতে উঠলাম, পাশে বসলো এমিলিয়া।

দুজনের অবস্থানের মধ্যে একটু ফাঁক রয়ে গেছে।

গাড়ী চালাতে লাগলাম। নগরীর মাঝপথ ফেলে শেওলা-ঢাকা প্রাচীন প্রাচীর, বাগান, ছায়া-ঘেরা বাগানবাড়ী সব পেছনে ফেলে প্রবেশ পথে পেঁৗছলাম।

রেস্তোঁরায় ঢুকে দেখলাম, টেবিল খালি। বেয়ারারা অলসভাবে গল্পগুজব করছে। এখানে বড্ড শীত, তাই এখন কেউ বেড়াতে আসে না।

মেনু নিয়ে এল বেয়ারা। ডিনারের অর্ডার দিলাম। তালিকা পড়ে শোনালাম। এমিলিয়া মদ খাবে না জেনেও দামী এক বোতল মদ নিলাম।

টেবিলে খাবার এল, দুজনে খেতে লাগলাম।

এতদিন সবই হতো সহজ সরল ভাবে। ছোটো খাটো ব্যাপারে খেয়ালই ছিল না, একটা কিছু করে ফেলার পর চৈতন্য হত আমার। আমার প্রতিটি ভঙ্গিতে লেগে রয়েছে যেন এক বেদনাময় অর্থহীন চেতনা। স্তব্ধ অবশ হয়ে পড়লাম। বারবার ভাবতে লাগলাম, আমি ভুল করছি না তো?

দুজনেই নীরব, মাঝে মাঝে দু'একটি ভাঙা ভাঙা কথা—রুটি চাই, তোমার — মাংস, মদ—

আমাদের মিলিত জীবনে অমর হয়ে রয়েছে এই সন্ধ্যা।

কত কিছু বলতে চাই, কিন্তু পারছি না. ভেবেই পারছি না কি বলব। মনের আবেগ রুদ্ধ করে নীরব থাকলাম তাই। কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। তবু মনে হলো চুপ করে থাকাই ভালো। মৌনতা ভাঙলেই তো এক তিক্ত আলোচনার মধ্যে নিজেকে টেনে আনতে হবে।

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, চুপ করে আছ কেন, এমিলিয়া। একটু আগে যা বলেছ, তাই নিয়েই তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা যেতে পারে।

এমিলিয়া বলে, ভুলে যাও ওকথা। মনে কর কিছু বলিনি—

আশায় দীপ্ত হলো অন্তর। হয়তো তার কথাই ঠিক, তার ওপর বল প্রয়োগ করেছিলাম, তাই সে ঘৃণা করেছিল আমায়।

তাই সাবধানতার সঙ্গে বললাম, তবে বল, আজ যে ভয়ংকর উক্তিটি করেছ তা সত্যি নয়। শুধু একবার বল, তখন সেই মুহূর্তে তোমার মনে হয়েছিল— আমায় ঘৃণা কর তুমি।

আমার দিকে তাকালো সে। কিন্তু একি! ভুল করিনি তো? ভালো

করে দেখলাম। না, সন্দেহ নেই এতটুকু। সত্যিই তার দুটি চোখ জলে ভরা।

আমি তাই আনন্দিত হয়ে তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলাম। বললাম বল এমিলিয়া, বল প্রিয়তমে, সত্যি নয়—সত্যি নয় তোমার কথা

একটানে হাত সরিয়ে নিল সে। বলল, সত্যি।

তার জবাব শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সে জানে একটা মিথ্যে কথা। বললেই সব গোলমাল চুকে যায়।

বললাম, বলতে হবে, কেন তুমি আমায় ঘৃণা কর।

মরে গেলেও বলব না, বলে সে।

রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম হঠাৎ। খপ করে তার হাত ধরে বললাম বল বল—কেন ঘৃণা কর আমায় ?

রাগে তার আঙুলে চাপ দিলাম।

উঃ, বেদনায় মুখখানি কুঞ্চিত করলো এমিলিয়া। রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, থাম থাম - ছিঃ, আরও ব্যথা দিতে চাও আমায় ?

আমার যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এলো এমিলিয়ার কথা শুনে। আগে যেন আমি তাকে এভাবে ব্যথা দিয়েছি! তবু তার হাত ছাড়লাম না।

এমিলিয়া বলল, ছিঃ, লজ্জা করে না তোমার! বেয়ারারা দেখছে—আঙুল ঘুরিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল এমিলিয়া। একটা গ্লাস মাটিতে পড়ে গেল।

এমিলিয়া এক লাফে দরজার কাছে গিয়ে বলল, আমি গাড়ীতে যাচ্ছি। তুমি বিলটা মিটিয়ে দাও।

এমিলিয়া যাবার পর আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

বেয়ারারা বসে বসে আমাদের লক্ষ্য করেছে সর্বক্ষণ। তাই লজ্জার চেয়ে অপমানই বেশী বোধ করলাম। এক অপ্রীতিকর প্রহেলিকার মতো কানের কাছে বাজতে লাগল সেই শব্দটি 'আরও'।

বিলটা মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোঁরার বাইরে এলাম।

মাথার ওপর আকাশ টুকরো টুকরো মেঘে আচ্ছন্ন। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। লক্ষ্য করলাম, এমিলিয়া গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। গাড়ীর দরজা তালা বন্ধ।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কম্পিত কণ্ঠে বললাম, ইস্, ভুলেই গিয়েছিলাম—গাড়ীর দরজা বন্ধ, কিছু মনে করো না, লক্ষীটি।

সে শান্ত ভাবে বললো, না, সামান্য বৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। কি হয়েছে তাতে।

দরজা খুলে গাড়ীতে উঠলাম, এমিলিয়া পাশে বসলো। আনন্দের সঙ্গে গাড়ী চালাতে লাগলাম। মনে হয়, সমস্ত ঘটনাটিকে কৌতুক হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। এমিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কে সমস্যা মিটবে।

এমিলিয়া নীরব। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে গাড়ী চলছে। কিছুদূর এগিয়ে এসে কৃত্রিম উল্লাস ভরে বললাম, চল, এবার আমরা ভুলে যাই নিজেদের। মনে কর, আমরা দুটি তরুণ ছাত্র-ছাত্রী। দুজনে খুঁজে বেড়াচ্ছি নির্জন কোণ: রচনা করবো নিভৃত মিলন কুঞ্জ।

তবুও এমিলিয়া চুপ। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। সাহসে ভর দিয়ে গাড়ী থামালাম। বললাম, মনে কর—আমি মেরিও আর তুমি মেরিয়া। অবশেষে আমরা খুঁজে পেয়েছি বৃষ্টি ভেজা একটি নিস্তব্ধ স্থান, কিন্তু আমরা তো রয়েছি গাড়ীতে। এসো, একটু আদর করো আমায়—

হাত দিয়ে জড়িয়ে তার কাঁধে চুমু খেতে গেলাম। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ছিঃ, তুমি কি পাগল হয়েছো, না নেশা করেছো ?

না, আমার কিছুই হয়নি, তুমি কেবল একটি চুমু খেতে দাও।

আবেগের সুরে সে জানালো, ও কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না আমি যখন বলি, তোমায় ঘৃণা করি, তখন আশ্চর্য হয়ে যাও, অথচ যখন এমন ব্যবহার কর, এত কিছু হবার পরও—

—কিন্তু আমি যে তোমায় ভালোবাসি।

আমি তোমায় ভালোবাসি না।

মনে ধিক্কার এলো। তবু বললাম, একটি চুমু খাও, লক্ষ্মীটি। খাও।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম এমিলিয়ার গায়ের ওপর। সে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়লো গাড়ী থেকে।

বাইরে সমানে বৃষ্টি পড়ছে। সে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। আমিও রাস্তায় নেমে পড়লাম। উত্তেজিত ভাবে বললাম, এমিলিয়া, এমিলিয়া ফিরে এসো, তোমার কোন ভয় নেই—তোমায় স্পর্শ করবো না আর—

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। দূর থেকে ওর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, তুমি এসো না, ওখানেই থাক নইলে কিন্তু হেঁটেই রোমে চলে যাব আমি।

বৃষ্টিতে জামা ভিজে গেল, গা বেয়ে জল পড়তে লাগল টপটপ করে। গাড়ীর আলোয় বেশীদূরে দেখা যাচ্ছিল না। চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না এমিলিয়াকে। নিরাশ হয়ে ভাবলাম, এমিলিয়া—আমার কান্না পেয়ে গেল।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে এমিলিয়া দাঁড়ালো আমার সামনে। বলল, দিব্যি করে বল আমায় ছোঁবে না।

তার কাছে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হলাম। এমিলিয়া গাড়ীতে উঠে বসলো।

গাড়ী চালাতে লাগলাম আবার। দু-একবার হাঁচলো এমিলিয়া—যেন দেখালো, আমারই জন্য তার সর্দি হয়েছে।

গাড়ী চালাতে চালাতে এক স্বপ্ন দেখলাম, এক দুঃস্বপ্ন –

আমি রিকার্ডো, আমার স্ত্রীর নাম এমিলিয়া—আমি তাকে ভালোবাসি, সে আমায় ভালোবাসে না, ঘৃণা করে।

দশম অধ্যায়

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন শরীরে অসহ্য বেদনা অনুভব করলাম। অবসন্ন নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। এমিলিয়া তখনও ঘুমোচ্ছে। আধো অন্ধকারে অনেকক্ষণ অলসভাবে শুয়ে রইলাম। বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলাম আস্তে আস্তে। স্থির করতে হবে, ওডিসির চিত্র সম্পাদনার ভার নেবো কি না, জানতে হবে এমিলিয়া কেন ঘৃণা করে আমায়, আবিষ্কার করতে হবে তার ভালবাসা ফিরে পাবার উপায়।

চোখ বন্ধ করে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আমার জীবনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এমনি করে সমাধান করার চেষ্টা করা কি শুধু শক্তির অপচয় নয়?

কল্পনার চোখে দেখলাম—আমি 'ওডিসি'র চিত্রনাট্য রচনা করছি। এমিলিয়ার সঙ্গে আমার কোন মনোমালিন্য নেই, আমার সঙ্গে তার ঘটনা শিশু সুলভ ভুল বোঝা বুঝিমাত্র। তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে আবার।

ভাবতে ভাবতে একটু ঘুমের আচ্ছন্ন ভাব নেমে এল চোখে। ধীরে ধীরে কখন যে গভীর ঘুমে ডুবে গেছি জানি না। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখি—এমিলিয়া চির-পরিচিত বেশে সেজে গুজে বসে আছে আমার পায়ের কাছে। টেবিলের ওপর একটা ল্যাম্প জ্বলছে। কখন ল্যাম্পের আলো জ্বালিয়ে এমিলিয়া এসে পাশে বসেছে জানি না।

মনে পড়লো, হারানো অতীতের মধুর স্মৃতির কথা। চাপা কণ্ঠে বললাম—বল, বল এমিলিয়া, তুমি ভালবাস আমায়।

সে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমাদেরই সম্বন্ধে—

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, আর কি বলার বাকী আছে? তুমি আমায় ভালোবাসো না, ঘৃণা কর—

সে কথা নয়। বলছি, আজ আমি মার কাছে যাচ্ছি। তোমাকে বলে তারপর মাকে টেলিফোন করবো।

এ ধারণা তো মনে কোনদিন উদয় হয়নি যে এমিলিয়া আমায় ত্যাগ করে

চলে যাবে। আমার প্রতি তার নিষ্ঠুরতার সীমা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। আমি তবুও তার উক্তির মানে বুঝতে পারলাম না।

বলছ, আমায় ছেড়ে চলে যাবে? যদি তাই হয়, তবে তুমি অমন করে যেতে পারবে না। আমি চাই না তুমি যাও।

ছেলেমানুষি করো না। বিচ্ছেদ ছাড়া আর কোন পথ নেই। আমাদের মধ্যে আর কিছু বাকী নেই। এতে দুজনেরই ভালো হবে—

আমার ঠিক মনে নেই, তার উক্তির পরিবর্তে কি বলেছিলাম। তবে মনে পড়ে—হাত পা ছুঁড়েছিলাম, ঘরের ভেতর পায়চারি করেছিলাম, এমিলিয়াকে বার বার বলেছিলাম—যেয়ো না, যেয়ো না। তাকে জানিয়েছিলাম, আমার মনের অবস্থা। আরও কত কি বলেছিলাম।

বিচ্ছেদ ও নিঃসঙ্গতার চিন্তায় বিদ্রোহী হয়ে উঠলো আমার মন। বিশ্বাস হলো না কিছুতেই। আশঙ্কা ও ভয়ের মেঘ আমার চারপাশে বেষ্টন করে আছে। তারই ফাঁকে মাঝে মাঝে এমিলিয়ার নিশ্চল মুখটা দেখা যাচ্ছে।

সে বলল, রিকার্ডো অবুঝ হয়ো না। এই হলো আমাদের উপায়।

যা বলতে চেয়েছিলাম কিছুই বলা হলো না। নিজেকে সংযত করে বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইলাম।

আজই আমি চলে যেতে চাই। আমায় দিকে না তাকিয়েই সে গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এ যেন আমারই ভুল। ঘরের চারদিকে একবার নজর বোলালাম।

তীব্র উত্তেজনায় মনে হলো—ঘরটির রূপ বদলে গেছে। এ সেই ঘর, যে ঘরে এমিলিয়া নেই, আর কখনও ফিরে আসবে না। আমাকে অনির্দিষ্টকাল ধরে একা কাটাতে হবে। ভবিষ্যতের ছবি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একটা বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডদেশ বেয়ে নামলো।

আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। চলে এলাম শোবার ঘরে। লক্ষ্য করলাম, এমিলিয়া বিছানার ওপর বসে টেলিফোন করছে। দু একটা কথা কানে আসতেই বুঝলাম, সে তার মাকে ফোন করছে। অদূরে বসে মুখখানি হাত দিয়ে চেপে ধরে ফোঁপাতে লাগলাম। ঝাপসা চোখে দেখলাম —প্রকৃতির ওপর কালো মেঘের ছায়ার মত একটি নিরাশ রুষ্ট ভাব ফুটে উঠলো এমিলিয়ার মুখের ওপর।

এমিলিয়া এবার রিসিভারটা রেখে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো। সে যেন বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে। তার হাতটা ধরে বললাম, যেয়ো না, যেয়ো না, লক্ষ্মীটি আমার।

শিশু, নারী আর কাপুরুষেরা ভাবে চোখের জলের আবেদন গভীর। চোখের জলে সহজেই মানুষের মন গলানো যায়। মনের দুঃখেই কাঁদছিলাম। কিন্তু চোখের জল ফেলছিলাম কাপুরুষের মতো। আশা ছিল, আমার অশ্রু দেখে এমিলিয়ার মনে মায়া হবে। পরমুহূর্তেই মনে হলো এমিলিয়াকে ছলনা করার জন্যই চোখের জল ফেলেছি। লজ্জা পেয়ে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। চেয়ারে বসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা সিগারেট ধরালাম।

এমিলিয়া এসে জানাল, তোমার কোন ভাবনা নেই ; ভয়ের কোন হেতু নেই—আমি যাচ্ছি না, যাচ্ছি না।

বিচলিত ও বিব্রত দেখালো তাকে। লক্ষ্য করলাম, ওর ঠোঁটের দুটি কোন কাঁপছে, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে সে।

কান্না ভেজা কণ্ঠে বললো—'আমার মা আমায় চান না। আমার ঘরটি তিনি ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন। আমি যে যাচ্ছি, তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছেন না। কেউ চায় না আমায়, তোমারই সঙ্গে থাকতে হবে আমায় বাধ্য হয়ে।

এ কি নিদারুণ উক্তি ? কে যেন ছুরি বসালো আমার বুকে। ঘৃণা-জড়িত কণ্ঠে বললাম—'আমার সঙ্গে অমন করে কথা বলছ কেন ? বাধ্য হবে কেন ? কেন তুমি অমন ঘৃণা কর আমায় ?

এমিলিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর চোখ মুছে বললো—'তুমিই তো আমায় যেতে দিতে চাওনি। তা বেশ, আমি থাকছি, তোমার তো খুশী হওয়া উচিত না ?'

আমি মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু ভুলে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

এমিলিয়া বলে চলল—যদি তুমি চাও, তাহলে আমি চলে যাব, আবার টাইপিস্ট হব। তবে বেশী দিন তোমাকে সাহায্য করতে হবে না। একটা কাজ পেলেই তোমার কাছে কিছু চাইব না।

—না না, এমিলিয়া, আমি চাই তুমি এখানেই থাক—কিন্তু আবার বলছি বাধ্য হয়ে নয়, বাধ্য হয়ে নয়। বেশ, আর অলোচনায় কাজ নেই, তাতে কেবল কষ্টই বাড়বে। হ্যাঁ, একটা কথা—আমি 'ওডিসি' চিত্রনাট্যের ভার নিয়েছি।

—কিন্তু বাত্তিসতা বলেছেন, প্রাকৃতিক দৃশ্য তোলার জন্য ক্যাপ্রিতে যেতে হবে। আমরা সেখানে যাব, তুমি তোমার ইচ্ছে মত নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে পারবে, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না। এই তিন চার মাসের মধ্যে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত আমাকে জানাতে পারবে। এর আগে সে সম্বন্ধে আর একটা কথাও বলব না। পরিচালক প্যারিস থেকে ফিরে এলেই আমরা যাব। প্রায় দিনদশেক পরেই যাব।

এমিলিয়ার নরম বুকটি তখনো আমার বুকে লেগে রয়েছে। একটা চুমো খাবার ইচ্ছে হলো। আমার বেষ্টনে সে রয়েছে নির্বিকার।

শান্তস্বরে প্রশ্ন করলো - 'সেখানে আমরা কি হোটেলে থাকব?'

আমি তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললাম—'হোটেল কেন? হোটেলে কি থাকা যায়? বাত্তিসতা তার বাগানবাড়ীটি দেবেন। সেখানেই আমরা থাকবো।

এমিলিয়ার মুখভঙ্গি দেখে মনে হল, পরিকল্পনাটি তার মনমতন হয় নি। সে নিজেকে মুক্ত করে নিল। বললাম—বাত্তিসতা হয়তো মাঝে মধ্যে সেখানে যাবেন। শুধু উনি দেখবেন কাজটা কেমন এগোচ্ছে। আর পরিচালক হোটেলে থাকবেন।

এমিলিয়ার পরণের জামাটি কোমর পর্যন্ত নেমে এল। ইচ্ছে হল কাছে টেনে নিই। কিন্তু স্পর্শ না করে একভাবে চেয়ে রইলাম তার দিকে, যদি চোখাচোখি হয়ে যায়. তাই বুক কাঁপতে লাগল।

মুখ মুছে হাসি টেনে ধীর কণ্ঠে বলল এমিলিয়া—তুমি দেখছি তোমার স্ত্রীর নগ্ন রূপ দেখতে লজ্জা পাওনা—অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে।

সে তার জামাটা টেনে তুলে বলল—আমি ক্যাপ্রিতে যেতে রাজী আছি, তবে একটা শর্তে—

—'কোন শর্ত আমি শুনতে চাই না। আমরা যাব—ব্যস, কোন অছিলায় আমায় ভোলাতে পারবে না, এখন নাও তো…'

আমার উক্তিতে প্রকাশ পেল যেন ক্রোধ। তাই হয়তো ভীত হয়েই এমিলিয়া ওখান থেকে চলে গেল।

একাদশ অধ্যায়

ক্যাপ্রিদ্বীপে যাবার জন্যে তৈরী হলাম। বাত্তিসতা আমাদের সঙ্গে যাবেন. আমরা তার বাড়ীতে যাচ্ছি, তাকে ছাড়া কি যাওয়া যায়? নতুন জায়গা—সব ব্যবস্থা উনি করে দিয়ে আসবেন।

জুন মাসের গোড়ার দিকে নির্মল আকাশ, ফুরফুরে মিষ্টি হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বাত্তিসতা রেনগোল্ডের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। আমি আর এমিলিয়া তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলাম।

আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বাত্তিসতা বললেন—'এবার বলুন তো ব্যবস্থাটা কেমন করা যায়?'

ঠিক আছে আমিই বলছি। মিসেস মলটোনি আমার গাড়ীতে যাবেন আর আপনি রেনগোল্ডের সঙ্গে যাবেন। আপনার যেতে যেতে চিত্রনাট্যটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।'

আমি এমিলিয়াকে লক্ষ্য করলাম। তার মুখে ফুটে উঠেছে অবজ্ঞা আর উদ্বেগ।

এমিলিয়া এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাত্তিসতা এক প্রকার তাকে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। জিজ্ঞাসু বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল এমিলিয়া। একবার মনে করলাম তাকে আমাদের সঙ্গে আসতে বলব কিনা। কিন্তু বাত্তিসতা রাগ করবেন। কিছু তাই বললাম না।

বাত্তিসতা গাড়ীর দরজা খুললেন, এমিলিয়া ভেতবে গিয়ে বসলো। বাত্তিসতা তার পাশে বসলেন। আমি আর রেনগোল্ড আমার গাড়ীতে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে বাত্তিসতার গাড়ী আমাদের পেছনে ফেলে সবেগে নেমে গেল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে, তারপর একটি বাঁক ঘুরে মিলিয়ে গেল।

নগরীর সীমা ছাড়িয়ে এলাম। রেনগোল্ড এবার কথা বললেন—'সেদিন বাত্তিসতার অফিসে আপনি ভয় পেয়েছিলেন নিশ্চয়, ভেবেছিলেন—এমন একটা চিত্রে আপনাকে নামানো হচ্ছে—তাই না।'

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললাম—'এখনও ভয় পাচ্ছি'?

—কোন ভয় নেই আপনার। আমরা মনস্তত্ত্বমূলক ছবিই তুলব। আপনাকে

যেমন বলছি ঠিক তেমনিই। আর জানেন মিঃ মলটেনি, অন্যান্য চিত্র নির্মাতারা যেমন ভয় করেন আমি তেমন ভয় করি না। আমি চাই, আমার হাতে চলচ্চিত্রের দৃশ্যসজ্জার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে। নাহলে ছবি তুলবই না। এই আমার স্পষ্ট কথা।

আমি তাঁর কথা শুনে খুশী হলাম। মনে ভাবলাম, বাস্তিসতার সঙ্গে কাজে আমাকে নাজেহাল হতে হবে না।

—'দেখুন মলটেনি, ক্যাপ্রিতে যেতে তাই আমি আপত্তি করিনি। বহির্দৃশ্য-গুলি নেপল্স উপসাগরেই তুলবো। কিন্তু সেটা হবে কেবল পটভূমি। বাকীটার জন্যে তো রোম-এ থাকতেই হবে। ইউলিসিস নাটকটি কোন নাবিক, সৈনিক বা আবিষ্কারের কাহিনী নয়। এ নাটক সব লোকের জন্যে, সব কালের জন্যে। ইউলিসিসের উপকথার আড়ালে রয়েছে এক জাতের লোকের সত্যিকারের জীবন।'

আমি কোন চিন্তা না করেই বললাম—'গ্রীক উপকথা মাত্রই মানুষের জীবন নাট্য কল্পাতীত, স্থানাতীত, চিরন্তন।'

—'আপনি ঠিকই বলেছেন মলটেনি। প্রতিটি গ্রীক উপকথাই বলতে গেলে মানব জীবনের আদর্শ রূপক উপকথাগুলির ওপর ভিত্তি করে রচিত। গ্রীক সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব না হারিয়ে আধুনিক জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপন করে সম্পূর্ণ স্বাধীন যুগোপ-যোগী করে রূপায়িত হয়।'

আমরা নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। সোনালী ধানের পিঙ্গল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমরা বাস্তিসতার অনেক পেছনে পড়ে রয়েছি। যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়, শূন্য পথ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

রেনগোল্ড আবার বলতে শুরু করলেন—ও'নীল যদি বুঝতেন আধুনিকতম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হবে উপকথাগুলির। বিষয়বস্তুর ওপর প্রাধান্য না দেওয়াই উচিত ছিল তাঁর, প্রয়োজন ছিল নতুন জীবনের অবতারণা। তিনি তা করেন নি। তাই কোন আবেদন নেই তাঁর চিত্রের মধ্যে।

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম—'আমার তো মনে হয় এটাই বরং সুন্দর হয়েছে।'

আমার কথায় কান না দিয়ে রেনগোল্ড বললেন—এখন 'ওডিসি'কে আমরা এমন করতে চলেছি, যা ও'নীল করতে চায়নি বা কখনও কল্পনা করতে

পারেননি। এ শুধু বাহ্যিক ঘটনা। তাতে 'ওডিসি' হবে একটি বিরাট অভিযানের চিত্র—ব্যক্তিসত্তা যেমন মনে করেন, ঠিক তেমনি। কিন্তু ব্যক্তিসত্তা হচ্ছেন চিত্র-নির্মাতা, আপনি তা নন। আপনি জ্ঞানী, রুচিবান, ও বুদ্ধিমান। আপনাকে মাথা খাটাতে হবে। বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে।'

—তাই তো আমি করছি।

—না না, আপনি তা করছেন না।

সবার আগে খেয়াল করুন, ইউলিসিসের মূল কাহিনী হল, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পেনিলোপের সম্পর্ক।

আমি কেবল শুনে যেতে লাগলাম। কোন সাড়া দিলাম না।

'ওডিসি'র প্রথমেই নজরে পড়ে, ইউলিসিসের বিলম্বিত প্রত্যাবর্তন। যে দশ বছর সময় লেগেছে তার মধ্যে তার প্রতি পেনিলোপের প্রেম থাকা সত্ত্বেও তিনি বারবার সুযোগ অবহেলা করেছেন, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। হোমারের মতে, পেনিলোপ ছাড়া আর কোন চিন্তার স্থান ছিল না ইউলিসিসের মনে। তাঁর একমাত্র কামনা ছিল পেনিলোপের সঙ্গে পুনর্মিলন, কিন্তু আমরাও কি বিশ্বাস করবো হোমারের এই উক্তি। দেখুন মনটেনি, একাধিবার 'ওডিসি' পড়ে আমি এই ঠিক পরিকল্পনায় এসে হাজির হয়েছি যে ইউলিসিস নিজের থেকে বাড়ী ফিরে আসতে চাননি। পেনিলোপের সঙ্গে পুনর্মিলনের বাসনা তাঁর ছিল না। আপনারা যে যাই বলুন না কেন—

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

আমার কোন সাড়া না পেয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন—সত্যিই ইউলিসিস হচ্ছেন এমন একটি লোক যিনি সত্যিই তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। তার কারণ, ভয়ই মনের অবচেতনার উৎসাহে নিজের যাত্রাপথ দীর্ঘতর করারই এক অপরিজ্ঞাত আকাঙ্খা ছাড়া আর কিছু নয়।

'ওডিসি'-র এমন ভাষ্য কখনও কল্পনা করিনি। তাই অবাক হয়ে গেলাম—ইউলিসিসের মত একটি সহজ চরিত্রের এমন জটিল বিশ্লেষণে। মনস্তত্ব নিয়েই কারবার করেছেন রেনগোল্ড। তাই এটা অস্বাভাবিক নয় তার পক্ষে।

আমি নীরস কণ্ঠে বললাম—"আপনার কথাটা ঠিক। কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কেমন করে…

—দাঁড়ান, আমি আপনাকে স্পষ্ট করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। 'ওডিসি' দাম্পত্য বিরোধেরই কাহিনী। এই দাম্পত্য বিরোধ সম্পর্কে বহুদিন পরীক্ষা

চলেছে, অনেক বিতর্ক হয়েছে। দশ বছর ধরে তিনি যতদূর সম্ভব বিলম্ব করেন, দাম্পত্য জীবনের ছায়াতলে ফিরে না আসার অনেক অজুহাত দেখাল। এমন কি অন্য একজনকে বিয়ে করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। অবশেষে আত্মদমন না করতে পেরে গৃহে ফিরে আসেন। তবে একটা কথা মনে রাখার চেষ্টা করবেন ইউলিসিস কোন ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে সংঘটিত দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প নয়। তাতে যা ঘটেছে সবই হলো ইউলিসিসের অবচেতন মনের প্রতীক—আপনি 'ফ্রয়েড' পড়েছেন নিশ্চয়ই ?

—হ্যাঁ, কিছুটা পড়েছি।

—বেশ, ঐ 'ফ্রয়েড'ই হবে ইউলিসিসের মনোরাজ্যের পথপ্রদর্শক। ভূমধ্যসাগরের পরিবর্তে আমরা দেখবো ইউলিসিসের অন্তর্জগৎ বা অবচেতনা। আমরা ক্যাপ্রিতে গিয়ে আবার শান্ত মস্তিষ্কে আলোচনা করব। মোটর চালানো ও 'ওডিসি' সম্পর্কে আলোচনা একসঙ্গে হয় না মিঃ মলটোন। আপনি বরং মন দিয়ে গাড়ী চালান, আমি বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ করে রইলাম। শান্ত সমুদ্রের পাশ দিয়ে পথ। অবসন্ন ভাবে ঢেউ উঠছে। হলদে ও কালো বালির পাহাড়ের পরেই আবছা সবুজ জলরাশি। আরও দূরে সমুদ্র গতিশীল, কিন্তু নিস্তরঙ্গ। আকাশেও তেমনি অস্থিরতা। অনন্ত নীল আকাশ জ্বলজ্বল করছে, সাদা মেঘ ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামুদ্রিক পাখিরা ঘুরছে।

সমুদ্রের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে গাড়ী চালাচ্ছিলাম। উজ্জ্বল নীল আকাশ তলে এই বর্ণাঢ্য সমুদ্রের বিক্ষিপ্ত তরঙ্গরাজির মধ্যে, ভূমধ্যসাগরের বুকে অজ্ঞাত, অপরিচিত রাজ্যসন্ধানী ইউলিসিসের অর্ণবপোত কল্পনা করা সহজ। এখানে সবই রয়েছে। রেনগোল্ডের কাছে ওডিসি মনস্তত্ত্বের অসঙ্গতির মধ্যে জড়িত এক আধুনিক মানুষের অন্তর্রাজ্যের নাটক। মনে মনে চিন্তা করলাম, এর চেয়ে নিকৃষ্ট চিত্র নাট্যচিন্তা করা যায় না।

রাস্তার ধারে বালুকাময় ক্ষেত্রে অজস্র আঙুর গাছের সবুজ শীষ দেখা যাচ্ছে। তারপরে খানিকটা বেলাভূমি। সেখানে জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে।

আমার মনে আনন্দ জেগে উঠলো। বললাম—দেখুন রেনগোল্ড। এবার একটু হাত পা ছড়িয়ে বসলে ভালো হত।

গাড়ী থামালাম। আঙুর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সমুদ্র-তীরের দিকে অগ্রসর

হলাম। বললাম—'চলুন, এবার সমুদ্রের তীরে গিয়ে বসি।'

রেনগোল্ড নির্বিকার চিত্তে আমার পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন।—দেখুন আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা পরিষ্কার বলতে পারিনি, আপনি যদি রাজী থাকেন তাহলে বলতে পারি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না।

—দেখুন সবটা বিশ্বাস করতে পারছি না, আবার আপনার ব্যাখ্যাকেও অবিশ্বাস করছি না। আমি বলতে চাই, ওডিসি'র প্রকৃত সৌন্দর্য হল—প্রত্যক্ষ বাস্তবের ওপর বিশ্বাস। তাতে কোন ভাষ্য বা বিশ্লেষণের স্থান নেই।

সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে বললাম—'যখন সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখে, হোমার হলেন সেই যুগের লোক। দৃশ্যমান জগতের সত্যকে খালি চোখে না দেখে তাই এঁকে গেছেন তিনি। এর তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা না করে হুবহু যেমনটি রয়েছে ঠিক তেমনটিই নেওয়া উচিত।

রেনগোল্ড হো হো করে হেসে উঠলেন। সে হাসিতে ফুটে উঠল বিজয়-অহংকার। বললেন– আপনার দৃষ্টি সম্পূর্ণ বহির্মুখী। যাদের অন্তর্মুখী দৃষ্টি তাদের আপনি বুঝতে পারেন না। অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আপনার বহির্মুখিতা আমার অন্তর্মুখিতার সমতা রক্ষা করবে। দেখবেন, আমরা দুজনে মিলে করবো এক অত্যাশ্চর্য শিল্প সৃষ্টি।

আমি রেনগোল্ডের কথায় বিব্রত বোধ করলাম। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম - রেনগোল্ড, মলটোনি, আপনারা এখানে কি করছেন? হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি?

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, বাত্তিসতা আর এমিলিয়া। বাত্তিসতার সর্বাঙ্গে উল্লাসের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আর এমিলিয়াকে বিব্রত, অতৃপ্ত ও চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে।

বাত্তিসতা বললেন—আমরা অনেক ঘুরে এলাম। রোমের একটা জায়গা দেখিয়ে এনেছি আপনার স্ত্রীকে, মিঃ মলটোনি। সেখানে আমার একটা বাড়ী হচ্ছে। আচ্ছা, রেনগোল্ড, 'ওডিসি' সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তো আপনারা?

রেনগোল্ড ছোট্ট করে উত্তর দিলেন যেন তিনি বাত্তিসতার উপস্থিতি পছন্দ করছেন না।

কিছুটা দূরে এমিলিয়া দাঁড়িয়ে ছিল। আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বাত্তিসত্তা বললেন—বলুন মহাশয়া, আমাদের লাঞ্চটা কোথায় হবে—নেপল্‌স,এ না ফার্মিয়ায় ?

এমিলিয়া প্রথমে চমকে উঠল। বলল—আপনারাই ঠিক করুন না, আমার কোন আপত্তি নেই।

তবুও বাত্তিসতা কোন কথা শুনলেন না। অনেক পেড়াপেড়ির পর এমিলিয়া বলল—তাহলে নেপল্‌স-এ হবে। এখনও আমার খিদে পায়নি।

উল্লাসের সঙ্গে বাত্তিসতা বললেন—ঠিক আছে তাই হবে। চলুন, এবার যাওয়া যাক। বাত্তিসতা আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। এমিলিয়া কিন্তু এক পাও হাঁটলো না। আমি এগিয়ে আসতেই নীচু স্বরে বলল—আমি এবার তোমার গাড়ীতেই আসছি। লক্ষ্মীটি, বারণ করো না। বাত্তিসতা ভীষণ জোরে গাড়ী চালান।

আমি তার কথার ভঙ্গিতে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে এমিলিয়া আমার গাড়ীর দিকে এগিয়ে এল। আগেই বাত্তিসতা নিজের গাড়ীর দরজা খুলে রেখেছিলেন। তিনি এমিলিয়াকে আমার গাড়ীতে উঠতে দেখে আপত্তি জানালেন।

গাড়ী থেকে নেবে এসে বললেন—দেখুন মিসেস মলটোনি, আপনি তো ক্যাপ্রিতে গিয়ে আপনার স্বামীর সঙ্গে দুমাস থাকবেন। গলার স্বর নীচু পর্দায় নামিয়ে বললেন, আর আমি রেনগোল্ডের সঙ্গে রোমে অনেকদিন কাটিয়েছি। ওর মত লোকের সঙ্গে থাকা ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার। আর আপনার স্বামী নিশ্চয়ই আপত্তি করছেন না, কি বলেন—মিঃ মলটোনি ?

আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম—না, তবে এমিলিয়া বলছিল আপনি ভীষণ জোরে গাড়ী চালান।

উৎফুল্ল হলেন বাত্তিসতা,—ঠিক আছে আমি এখন থেকে এত আস্তে গাড়ী চালাবো যে মনে হবে পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। আর রেনগোল্ডের মুখে ফিল্ম ছাড়া অন্য কোন কথা নেই।

আমি একটুও না ভেবে বললাম—এসো এমিলিয়া, তুমি মিঃ বাত্তিসতার জন্য এইটুকু কষ্ট স্বীকার করতে পারো না ?

এমিলিয়া আমার দিকে একবার তাকালো। তার চাউনির অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। বলল—বেশ আসুন।

বাত্তিসতা আর এমিলিয়া পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। এমিলিয়া ধীর আলস্য ভরা পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। যে আকাশ ও সমুদ্রের মাঝে সে দাঁড়িয়েছে তারই সঙ্গে সঙ্গীত রেখেই যেন তার মূর্তি গড়া হয়েছে।

মনে হয় এমিলিয়া খুশী নয়। কি বুদ্ধু আমি। হয়তো সে আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল। আমায় বলতে চেয়েছিল তোমায় ভালোবাসি। আর আমি। আমি তাকে বাত্তিসতার সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছি।

হাত তুলে ডাকতে গেলাম। কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে। সে বাত্তিসতার সঙ্গে গাড়ীতে উঠছে।

বাত্তিসতার গাড়ী চলল, অনেকদূর ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

রেনগোল্ড হয়তো আমার মনের উৎকণ্ঠা বুঝতে পেরেছিলেন। ভেবেছিলাম, তিনি আমার চিত্রনাট্য নিয়ে গল্প করবেন। কিন্তু না, তিনি চোখের ওপর টুপিটা টেনে নিয়ে চুপ করে বসলেন। একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

আমি দ্রুত গতিতে নিঃশব্দে গাড়ী চালাতে লাগলাম। সমুদ্র পেছনে ফেলে মিষ্টি রোদমাখা সবুজ স্নিগ্ধ গ্রামাঞ্চলে এসে হাজির হয়েছি। চারিদিকে ছায়াভরা মায়াময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

কিন্তু এত সুন্দর দৃশ্যগুলি আমি দেখেও দেখতে পেলাম না। সম্পূর্ণ মন তিক্ততায় ভরে গেল। এমিলিয়াকে কেন যেতে দিলাম, কারণ কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। মনটা ভার হয়ে রইলো।

নেপলস্-এর কাছাকাছি আসতেই দৃশ্যাবলীর রঙ পরিবর্তন হল। সমুদ্রের দিকে পথটা বেঁকে গেছে, আমরা পাহাড়ের নীচে দিয়ে এগোচ্ছি। পাইন গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে উপসাগরের উজ্জ্বল নীল জল চোখে পড়েছে।

মন বিষণ্ন হয়ে পড়ছিল। হঠাৎ সমস্ত শরীর ও মন কেঁপে উঠলো। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না কিছুই।

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্যাপ্রিতে এসে রেনগোল্ডকে হোটেলে পেঁছে দিয়ে আমরা তিনজন একটা সরু গলি দিয়ে বাগান বাড়ির দিকে এগোলাম। আমরা অবশেষে পাহাড়ের ধারে এসে হাজির হলাম। সূর্য পাটে বসেছে। রাস্তায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। বাত্তিসতা আর এমিলিয়া রয়েছে আগে, আমি পেছনে, মুগ্ধ বিস্ময়ে নিসর্গ শোভা উপভোগ করছি। কিছুটা প্রকৃতিস্থ বোধ করলাম।

রাস্তাটা পেরিয়ে একটা সরু রাস্তায় আসতেই এমিলিয়ার আনন্দের সংকেত পেলাম। কারণ এর আগে ও এখানে আসেনি। এখান থেকে সমুদ্রের ওপর দুটি নীল পাহাড় বড়ই অদ্ভুত, মনে হয় আয়নার ওপর দুটি তারা খসে পড়েছে আকাশ থেকে।

আমি তাকে বললাম, জানো এখানে এক ধরণের নীল টিকটিকি আছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এদের দেখা যায় না। কারণ ওরা নীল পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে থাকতে ভালবাসে।

এমিলিয়া এমন মন দিয়ে শুনছিলো আমার কথা যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল তার বিদ্বেষ ভাব। আমারও মনে তখন জেগে উঠল নতুন আশা—পবিত্র নীল আলোক ফুটে উঠবে অন্তরে। চিকচিকে সমুদ্র ও আকাশের মত উজ্জ্বল, আনন্দময় এবং নির্মল হয়ে উঠবে আমাদের জীবন।

পাহাড়ের অদূরেই সাদা প্রাসাদের ওপর ঝোলানো বারান্দা দেখতে পেলাম, এটাই বাত্তিসতার বাগানবাড়ী। বাত্তিসতা আমাদের আগে চললেন। বললেন—'বাড়ীটা পেয়েছি একজনের কাছে টাকা পেতাম তার পরিবর্তে। আসুন, একবার সব ঘরগুলো দেখে নিন, তারপর বিশ্রাম করবেন।'

বাত্তিসতাকে অনুসরণ করে হাঁটলাম। পরিপাটি করে তিনি সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। শোবার ঘরে ফুলদানীতে ফুল সাজানো, রান্না ঘরে ব্যস্ততা শুরু হয়েছে, আজ যেন তার বাড়ীতে উৎসব।

ফিরে এসে বসলাম। হঠাৎ বিনা ভূমিকায় বাত্তিসতা প্রশ্ন করলেন—'দেখুন মলটোনি, রেনগোল্ড সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?'

আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কতটুকুই বা দেখেছি তাঁকে। কেমন করে বলবো। তবে মনে হয় খুব বেশী সীরিয়াস—সবাই তাঁর সুনাম করে চিত্রনাট্য নির্দেশক হিসেবে।

খানিক কি ভেবে নিয়ে বাত্তিসতা বললেন, আমিও তাঁকে ভালো করে জানি না। তাছাড়া উনি হচ্ছেন জার্মান আর আমরা দুজন ইতালীয়। আমাদের অনুভূতি ও জীবনবোধ স্বতন্ত্র।

আমি কোন সাড়া না দিয়ে চুপ করে শুনতে লাগলাম।

জার্মাণ রেনগোল্ডের সঙ্গে আপনাকে রাখতে চাই এই কারণে, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। তাই স্থির করেছি যাবার আগে আপনাকে কয়েকটি কথা বলে যাব।

এই ফিল্ম সম্বন্ধে আলোচনা-কালীন আমি লক্ষ্য করেছি; রেনগোল্ড আমার সঙ্গে হয় একমত হন কিংবা নীরব থাকেন, নিজে কিছু বলেন না। তাঁর মতে, চুপ করে থাকলেই সহজে বোকা বানানো যায়। কিন্তু আসলে আমি খুব সাবধানী, একথা ভুললে চলবে না ?

তার মানে আপনি রেনগোল্ডকে বিশ্বাস করেন না ?

বিশ্বাস করি আবার করি না। শিল্পী ও ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ভরসা রাখতে পারি না তাঁর ওপর। পরিস্কার করে কথাটা বলি, আমি চাই হোমারের 'ওডিসি'র মত একটি ফিল্ম। হোমার যেমন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন অভিনব একটি কাহিনী, দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না। আমিও সেই রকমই চাই। হোমার তাঁর কাহিনীর মধ্যে দানব, অলৌকিক ঘটনা, ঝড়, ডাইনী ও চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন, আপনিও তাই করুন।" আপনি হয়তো মনে করছেন আমি একটা বোকা। যদি তা মনে করেন ভুল করবেন বুঝলেন।

আমি ধীর কণ্ঠে বললাম, আপনি একথা ভাবছেন কেন যে আপনাকে আমি নির্বোধ মনে করি ?

আপনাদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পায়। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বাত্তিসতা একটু শান্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সেদিনের কথা আপনার মনে পড়ে, যেদিন আমার অফিসে রেনগোল্ডের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেদিন আপনি বলেছিলে। আচ্ছা, আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, তিনি একটি মনস্তত্ত্বমূলক ছবি

তুলবেন—ইউলিসিস ও পেনিলোপের দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে—তাই না ?

অবাক কাণ্ড। বাত্তিসতাকে যেমন ভেবেছিলাম তেমন তিনি নন। বললাম হ্যাঁ, এই ধরণের একটা কিছু বলেছিলেন হয়তো।

বেশ, এখন দেখছি চিত্রনাট্য তৈরী হয়নি। আপনাকে তাই জানাচ্ছি আধুনিক কালের কোন স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে চিত্র নির্মাণ করতে চাই না। তাহলে আর হোমারের 'ওডিসি' নিয়ে মাথা ব্যথা করতাম না। 'ওডিসি' হচ্ছে শুধু একটি দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। এ সম্বন্ধে যাতে আপনাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে. সেজন্য বলছি, আমি চাই সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটা ছবি। আপনার কথা মতই হবে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

আমি অবিশ্বাস করছি না, সবই খুলে বললাম আপনাকে। কাল সকালেই কাজ আরম্ভ করুন আপনি। আপনার নিজেরই স্বার্থে সময় থাকতে সতর্ক করে দিলাম শুধু। রেনগোল্ডের কাছে আপনিই হবেন আমার মুখপাত্র। প্রয়োজন হলে আপনিই তাঁকে মনে করিয়ে দেবেন। আমি চাই 'ওডিসি' কাব্যে যেমনটি থাকবে, আমার চিত্রে ঠিক তেমনই থাকবে।

আমি মুখে হাসি এনে বললাম—আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, মিঃ বাত্তিসতা। হোমারের সংটুকু কাব্যই আপনি পাবেন।

বাত্তিসতা উৎফুল্ল হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি আমায় একা রেখে বেরিয়ে গেলেন।

বাত্তিসতার কথায় উত্তেজিত বোধ করলাম। তাঁর কথায় টের পেলাম; অর্থের জন্য আমি যে কাজটি নিরুদ্বেগে গ্রহন করেছি, সেটি কত কঠিন। চিত্রনাট্যটি লিখতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, ভেবে আঁৎকে উঠলাম। কেন এ অন্যায় কাজ আমি করতে যাব ? রেনগোল্ড ও আমার মধ্যে যে আলোচনা হবে তা গোপন রাখব কেন ? কেন আপোষে মীমাংসার চেষ্টা করবো ? কেন-র উত্তর আমি খুঁজে পেলাম না।

যে ক্যাপ্রি খানিক আগে পরম রমনীয় ও শোভনীয় মনে হয়েছিল আমার কাছে, এখন আমার মত শিক্ষিত রুচিবান ব্যাক্তির মনের চাহিদার সঙ্গে চিত্র নির্মাতার চাহিদার সঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে তা বদলে গেল, বাত্তিসতা প্রভু আর আমি চাকর। প্রভুর কর্তৃত্ব এড়াবার জন্যে শঠতা বা ছলনার আশ্রয় নেওয়া আরও বেশী অসম্মান কর। আসল কথা, চুক্তিপত্রে সই করে আমি

আমার মনটা বিকিয়ে দিয়েছে এক শয়তানের কাছে। কড়ায় গণ্ডায় তার সবটুকু আদায় করে তবেই ছাড়বে। পরিষ্কার করে বলেছেন ব্যক্তিসত্তা, টাকাটা আমিই দিচ্ছি।

কথাকটা বারবার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ব্যক্তিসত্তার কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা জাগলো। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো, জানলাটা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ালাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সমস্ত ছাদটা মৃদু চাঁদের আলোয় ভরে আছে। বড় ছাদ থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে একটা সিঁড়ি। মনে হল একবার নীচে নেমে বেড়াই। কিন্তু এখন আর সময় নেই। ছাদে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম অন্ধকারের রূপ।

নক্ষত্রভরা আকাশের নীচে দ্বীপের ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কালো পাহাড়গুলো। নীচের পাহাড় ওপরের পাহাড়গুলির চেয়ে আবছা। দিগন্তে সীমাহীন অন্ধকার, অনন্ত নীরবতা বিরাজ করছে। দিগন্তের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। দূরে বাতিঘরে ক্ষীণ আলো নজরে পড়লো। এ ছাড়া আর কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই।

নীরব রাত্রির প্রভাবে মন ক্রমশঃ শান্ত হয়ে উঠছিল। পৃথিবীর সবটুকু সৌন্দর্য্য এই অনন্ত বেদনার পথে ক্ষণিকের বাধা সৃষ্টি করতে পারে হয়তো, কিন্তু আমার দুঃখের তিমির রাত্রির অবসান কখনও হবে না।

কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ এমিলিয়ার অবাঞ্ছিত চিন্তা মনে পড়ল। বাত্তিসতা ও রেনগোল্ডের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে আমার, আমি রয়েছি হোমারের কাব্য বর্ণিত একটি স্থানে। তাই 'ও ডিসি' চিত্রনাট্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেল মন। বার বার পড়ে ও মনে মনে আবৃত্তি করে মুখস্থ হয়ে গেছে পেনিলোপের সেই উক্তি—

আমার ওপর রাগ করো না, ইউলিসিস তোমার প্রতিটি কাজেই তো বিজ্ঞতার পরিচয় দাও। আমাদের—দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী দেবতারা, তাঁদের ইচ্ছে ছিল না যে আমাদের যৌবনের স্বপ্নরঞ্জিত দিনগুলি মিলনের মধুর আনন্দে কেটে যাক, কিন্তু আমরা যথারীতি দেখি জরায় শুভ্র হয়ে গেছে দুজনের কেশদাম, তবু প্রেমবন্ধন এতটুকু শিথিল হয়নি, অমলিন রয়েছে আমাদের প্রেম—

অনুবাদে হোমারের ভাষায় অবিকল ধ্বনি মাধুর্যে না থাকলেও এই উক্তির মধ্যে যে আবেগ রয়েছে তাতেই যথেষ্ট আনন্দ পেতাম অংশটি পড়ে। হায় যদি আমাদের সম্পর্কের মধ্যে আশা থাকতো। কেন মনে হলো, বাগান বাড়ীর যে কক্ষে এমিলিয়া রয়েছে সেখান থেকেই এর উত্তর পাব।

সমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে জানলার কাছে গেলাম, দাঁড়িয়ে রইলাম ছাদের এক কোণে। সেখান থেকে খাবার ঘরের ভেতরটা দেখা যায়, অথচ ভেতর থেকে বাইরের কিছু দেখা যায় না।

লক্ষ্য করলাম, এমিলিয়া বাত্তিসতার সঙ্গে সে ঘরে রয়েছে। উপুড় হয়ে একটি কাঁচের গ্লাসে সরবৎ তৈরী করছেন বাত্তিসতা। এমিলিয়ার চোখে উদ্বিগ্ন উদ্ধত দৃষ্টি। সে যেন বাত্তিসতার হাত থেকে গ্লাসটা নিতে চায়। তারপর বাত্তিসতা একটি গ্লাস এমিলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। প্রথমে সে একটু চমকে উঠেছিল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে গ্লাসটা নিল।

যা মনে মনে চিন্তা করেছিলাম তাই হল। ঘরের মাঝখানে এসে এমিলিয়ার মুখের কাছে মুখ আনলেন বাত্তিসতা। বাত্তিসতা ঘাড় নাড়লেন, আরোও কাছে তাকে টেনে নিলেন। চুমু না খেয়ে একটানে এমিলিয়ার গায়ের জামাটি ছিড়ে ফেললেন। এমিলিয়ার নগ্ন কাঁধে বাত্তিসতার মাথাটি নেমে এলো। এমিলিয়া নিশ্চল—সে যেন শেষ পর্বের প্রত্যাশায় রয়েছে।

হঠাৎ জানলার দিকে লক্ষ্য পড়ল তার। আমাকে দেখতে পেল, অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গি করে এক হাতে জামাটা চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত গতিতে।

আমি আর স্থির হয়ে না দাঁড়িয়ে ছাদে পায়চারি করতে লাগলাম। হতবাক হয়ে গেলাম। যা জানি, যা মনে করেছি, এ যেন তার চেয়েও বেশী ভয়ঙ্কর। আমি আজ সত্য উদ্ধার করেছি। আবিষ্কার করেছি এমিলিয়ার বিশ্বাস-ঘাতকতা। ছাদের ধারে থামের দিকে আসতেই অসহ্য বেদনা জাগল মনে। না না না, যা দেখেছি সত্য নয়—সত্য হতে পারে না। অব্যাহত আছে আমার পূর্ব অধিকার। না, আমি ভুল করেছি। সে অবিশ্বাসী নয়, বিশ্বাস-ঘাতকতার মূলে এখনো রয়েছে অনাবিষ্কৃত—

মনে পড়লো—বাত্তিসতার প্রতি সর্বদাই অব্যক্ত ঘৃণার ভাব দেখিয়েছে এমিলিয়া। নিঃসন্দেহে এই প্রথম চুম্বন। এমিলিয়াকে একা পেয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন বাত্তিসতা। সুতরাং এখনও যথেষ্ট সময় আছে। জানতে হবে কেন বাত্তিসতাকে চুমো খেতে দিল এমিলিয়া। বার বার মনে হলো, সেই চুম্বন সত্ত্বেও আমাদের সম্পর্ক রয়েছে অপরিবর্তিত। তবে আগের মত আমাকে ভালো না বাসার বা ঘৃণা করার অধিকার রয়েছে এমিলিয়ার।

ঝড়ের বেগের মত এসব চিন্তার উদয় হলো আমার মনে। অন্ধকারের মধ্যে একভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

বুঝলাম মনের চিন্তা ও আবেগ আর নেই। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জানলার কাছে এসে জানলা খুলে খাবার ঘরে নেমে এলাম। দেখলাম—বাস্তিসতা আর এমিলিয়া খেতে বসেছে। এমিলিয়া ছেঁড়া জামাটা পাল্টে ফেলেছে। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার এই মর্মান্তিক জাজ্বল্যমান প্রমাণ পেয়ে আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম।

আমায় দেখে বাস্তিসতা আনন্দের সঙ্গে বললেন—'আরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন'—

'একটু বাইরে গিয়েছিলাম।'

আমার দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে এমিলিয়া চোখ নামাল। ছাদের ওপর থেকে আমি যে তাদের লক্ষ্য করেছি সেটা সে দেখেছে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

চুপচাপ নিজের মনে খেয়ে চলেছে এমিলিয়া। আমার ধারণা ছিল সে ছলনা জানে না। আজ তা মিথ্যে হয়ে গেল।

মনের নিদারুণ স্ফূর্তি গোপন না রেখে বিজয়ীর উল্লাসে অনর্গল বকে যাচ্ছেন, যাচ্ছেন, সুরা পান করছেন বাত্তিসতা। ভদ্রলোকের আমিত্ব গর্ব দেখে মনে হচ্ছে—তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এমিলিয়াকে জয় করেছেন তিনি। পরিহাসের মাধ্যমেই তাঁর গর্ব প্রকাশ করছেন। মনে হলো যা দেখেছি তা সত্ত্বেও এমিলিয়া যেন তাঁর ওপর বিরূপ। না না, আমারই যেন ভুল। লক্ষ্য করলাম, যখনই বাত্তিসতা কথা বলছেন তখন কামার্ত না হলেও কৌতূহলী, বিস্ময়াকুল ও শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে উঠেছে এমিলিয়ার দৃষ্টি। মনে পড়ে গেল এরকম আর একটা চাউনি আমি দেখেছি। অনেকদিন আগে ফিল্ম ডিরেকটার পাসেত্তির বাড়ীতে যখন লাঞ্চ করছিলাম তখন তাঁর স্ত্রীর চোখে ওরকম দৃষ্টি লক্ষ্য করেছিলাম। এমিলিয়া ও বাত্তিসতাকে চুম্বনরত অবস্থায় দেখে যতটা মনঃকষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়েও বেশী বেদনা অনুভব করতে লাগলাম।

বাত্তিসতা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন আমার মনের অবস্থা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ তিনি বললেন—'কী হয়েছে মলটোনি? ক্যাপ্রিতে এসে কি আপনি খুশী হননি? আপনাকে ভীষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছে।'

বললাম—'ছাদে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলাম। তখন থেকে মনটা খারাপ হয়ে গেছে অকারণে।'

এমিলিয়ার দিকে তাকালাম। তারও মুখে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না। তারা দুজনেই নিঃসন্দিগ্ধ। হঠাৎ বলে ফেললাম—'আপনাকে একটা কথা বলব?'

—'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বলুন—আমি সব সময় সহজ স্পষ্ট কথাই পছন্দ করি।'

—'দেখুন, যখন সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলাম, তখন মনে হয়েছিল আমি নিজেরই স্বার্থে এখানে এসেছি—আপনি তো জানেন আমার জীবনের আশা রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক লেখা। তাই মনে করেছিলাম আমার কাজের পক্ষে

প্রশান্ত হবে এ জায়গাটি, এখানে সৌন্দর্য্য, নীরবতা ও শান্তি সবই রয়েছে, আর সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী। কোন চিন্তা নেই। তারপর মনে হলো, এই রমণীয় জায়গায় এসেছি নিজের জন্যে নয়, এসেছি একটি ফরমায়েসি চিত্রনাট্য লিখতে। জানি এসব কথা আপনাকে বলা উচিত নয়। তবু আপনি জানতে চেয়েছেন বলেই বলছি। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, আমার মন খারাপের কারণটা কি?

কিন্তু এ কি? আমি এ বলতে চাই নি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আচরণের কথা না বলে এগুলো বললাম কেন? বুঝলাম মনের দুর্বলতা, আমার এই অশুভ ভূমিকায় ওরা কেউই কোন অস্তিত্বের ভাব দেখালেন না।

গম্ভীরভাবে বাত্তিসতা বললেন—'আমি জানি মলটোনি, অন্যবদ্য চিত্রনাট্যই লিখবেন আপনি।'

—'দেখুন, আমি পেশাদার চিত্রনাট্য রচয়িতা নই। আমার জীবনে একটিমাত্র আদর্শ রয়েছে। তা হলো রঙ্গমঞ্চের উপযোগী নাটক রচনা। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে যে কেউ তার ইচ্ছেমতো কিছু করতে পারে না। কারণ টাকার প্রশ্নটাই তখন বড় হয়ে ওঠে। আমাদের কাছে অস্তিত্বের উচ্চাকাঙ্খায়, এমনকি যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে সম্পর্কেও সর্বাগ্রে টাকার প্রশ্ন আসে।'

বুঝলাম আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে বাত্তিসতা মাথা ঘামাল না। তিনি বললেন—'দেখুন মলটোনি, আপনার কথা শুনে আমার মনে পড়ে সে সময়কার কথা। যখর আমার বয়েস আপনার মত ছিল। একটা আদর্শও ছিল, কিন্তু আদর্শটা যে কি তা জানা ছিল না। তারপর একজনের সঙ্গে দেখা হল, তিনি আমায় কয়েকটি উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাঁর উপদেশ পালন করে তারপর বলেছিলাম আপনার মত। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ জানতে পারে—সত্যিই সে কি চায়, ততক্ষণ কোন আদর্শের কথা চিন্তা না করাই ভালো। নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শকে স্মরণ করে পালন করা দরকার। আপনিও আপনার আদর্শানুযায়ী নাটক লিখুন।'

জানেন, মলটোনি, সাফল্যের গুপ্ত মন্ত্র কি? স্টেশনে বুকিং অফিসের সামনে সকলেই টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হয়। পালানুক্রমে যে যেখানে যায় সেখানের টিকিট হাতে পায়। আপনিও অনেক দূরদেশের টিকিট পেতে পারেন, যেমন আমেরিকা, কেমন হয়? তবে হ্যাঁ, ঠিক তেমনি করে জীবনেও

লাইনে দাঁড়াতে হবে, বুঝলেন তো এবার।'

মুখ টিপে বাত্তিসতা হাসলেন। এমিলিয়ার ঠোঁটেও ম্লান হাসি ফুটে উঠল। মিসেস পাসোত্তির দৃষ্টি নতুন করে দেখতে লাগলাম তার চোখে। দুর্বিসহ মর্মবেদনার তলে হারিয়ে গেল আমার ঈর্ষা, বিষাদে ভরে গেল আমার সারা হৃদয়।

অপ্রত্যাশিত ভাবে ডিনার শেষ হল। বাত্তিসতার কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনার পর আমাকে যেন মনে পড়লো এমিলিয়ার।

এমিলিয়া কিছু না বলে হঠাৎ বিদায় নিল। বাত্তিসতাকে সন্তুষ্ট ও উৎফুল্ল দেখালো। এমিলিয়ার মনে তিনি যেন বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চান, এ যেন তারই ইঙ্গিত। কিন্তু আমার অধীরতা আরও দ্বিগুণ বাড়লো। কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ঘুমোবার অজুহাতে বাত্তিসতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এমিলিয়ার ঘরের দরজায় টোকা মারতেই আমায় সে ডাকলো। বিরক্ত ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো,—'বলতো আমার কাছ থেকে তুমি আর কি চাও ?'

—'কিছুই না, এসেছি তোমার কাজ থেকে রাত্রির জন্য বিদায় নিতে।'

—'না জানতে চাও, আজ সন্ধ্যায় বাত্তিসতার সঙ্গে তোমার আলোচনা সম্বন্ধে আমার মত কি ? শোনো, তোমার কথাবার্তা কেবল যে সময়োচিত হয়নি এমন নয়, হাস্যকরও হয়েছে। আমি তোমায় বুঝতে পারি না ঠিক, চিত্রনাট্য লিখে টাকা পাচ্ছ, অথচ বলছ তোমার ভালো লাগে এ কাজ। আজ ভদ্রতার খাতিরে বাত্তিসতা কিছু না বললেও কাল তিনি ভাববেন এ সম্বন্ধে। দেখবেন—যাতে আর কাজ না দেওয়া হয়।

একবার ভাবলাম চুপ করে থাকি। তার অবজ্ঞা মাখা কণ্ঠস্বর শুনে ভেবে পেলাম না কি বলবো। তবুও বললাম—'তবে এটা জেনো, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। তাছাড়া এও ঠিক নয় যে আমি এ কাজ করবো।'—আলবৎ করবে।'

আমি এতটা অপমান তার কাছ থেকে আশা করিনি। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম—'নাও করতে পারি। আজকের মধ্যে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার ফলে হয়তো কাল সকালেই জানিয়ে দিতে হবে—কাজ ছেড়ে দিলাম।'

আমি ইচ্ছে করেই কথাগুলো বললাম। আমায় যেমন সে ব্যথা দিয়েছে, তেমনি আমিও তাকে ব্যথা দিতে চাইলাম।

—কিন্তু কি ঘটনা খুলেই বলো না।

ওকে এড়িয়ে যেতে চাইলাম। বললাম—'ফিল্ম সংক্রান্ত ঘটনা। ওসব ভালো লাগবে না তোমার।'

—তাই হবে হয়তো। তবে কাজ ছাড়বার সাহস নেই তোমার—ঠিক কাজ করে যাবে।

—ও কথা ভাবছো কেন ?'

—কারণ, আমি তোমায় জানি। মুখেই বল বারবার, আবার সেই চিত্র-

নাট্য সম্পাদনার সব অসুবিধেই দূর হয়ে যায় অবশেষে।'

—'হতে পারে, তবে অসুবিধেটা চিত্রনাট্য নয়। অসুবিধে হলো ব্যক্তিগত। আর এর মানেটা তুমি ভালো করেই জানো। ডিনারের টেবিলেই তো বলেছি, অপরের জন্যে কাজ করতে পারছি না আমি, নিজের জন্যে কাজ করতে চাই।'

—কে বারণ করেছে তোমায় ?

—'তুমি তবে প্রত্যক্ষ ভাবে নয়। আমার জীবনে তোমার উপস্থিতি, আমাদের বর্তমান সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথমেই জানিয়েছি, তুমি আমার স্ত্রী, তোমার জন্য সব করেছি। যাক ওসব কথা, এখন একটি প্রস্তাব করবো তোমার কাছে।'

কি প্রস্তাব শুনি ?

তোমার কি মত এ সম্বন্ধে। তুমি যা বলবে তাই। বারণ করলে ব্যক্তিসত্তাকে কাল জানিয়ে দিয়ে প্রথম ষ্টীমারেই ক্যাপ্রি ছেড়ে চলে যাবো।

এমিলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—তুমি ভীষণ চালাক, কারণ পরে কোন অসুবিধে হলে যেন বলতে পারো দোষ আমারই।

না, আমি নিজেই তো তোমার মত চাইছি।

এমিলিয়া তারপর চুপ করে রইলো। আমি তার মতের প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

—আমি বলবো, একবার যখন কাজটি নিয়েছ তখন ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এমিলিয়া বিছানা ছেড়ে উঠে বলল—উঃ তুমি আমায় ভীষণ বিরক্ত করছো। তুমি তোমার যা খুশী করতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি আমায় রেহাই দাও।

ভীষণ মনে ব্যথা পেলাম। বললাম—আর কেন এমিলিয়া, কেন আমাদের এই বিরোধ ?

সে অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, হয়তো জীবনই এমনি।

আমি নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। ইচ্ছে হলো বলি, আমি তাকে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে দেখেছি। তার মতামত জানতে চেয়ে তাকে কেবল পরীক্ষা করছিলাম। আমাদের প্রশ্নের সমাধান হয়নি এখনও। কিন্তু বলা হলো না আসল কথাটি।

আমি ভীত কণ্ঠে বললাম—যতদিন ক্যাপ্রিতে থাকবো ততদিন তো আমি

কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবো আর তুমি একা একা থাকবে কি করে?

—কেন, বেড়াবো, সাঁতার কাটবো, সবাই যেমন করে। ভালই লাগবে, অনেক কিছু ভাববারও আছে আমার।

আমার কথা এখনও ভাবে? এমিলিয়ার হাতখানা টেনে নিয়ে বললাম—কি ভাব?

ঝাঁকুনি দিয়ে সে হাতটা টেনে নিল—বলেছি সে কথা অনেকবার। দেখ, এবার ঘুমোও গিয়ে, আমি জানি তুমি কতকগুলো জিনিষ পছন্দ করো না। তা স্বাভাবিকও। কিন্তু আগে যা বলেছি আমি, সে কথা বারবার বলতে ভালো লাগে না। ক্যাপ্রিতে এসেছি বলে আমার মত তো আর পরিবর্তিত হয়ে যায়নি।

এমিলিয়ার চোখ দুটি ছল ছল করে উঠলো। তুমি কি মনে কর তোমার চেয়ে আমিই বেশী অপছন্দ করি ওসব।

তার কণ্ঠস্বরে বেদনার আভাষ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমি কেবল তোমারই কথা ভাবি, চিরদিনই ভাববো—যাই ঘটুক না কেন।

শেষের কথাগুলো বলে বোঝাতে চাইলাম, এমিলিয়ার সত্যিকারের বিশ্বাসঘাতকতাও ক্ষমা করেছি আমি।

এমিলিয়া আর কোন জবাব দিল না। অবস্থা বুঝে তার কাছ থেকে রাত্রির জন্য বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই তালায় চাবি লাগানোর আওয়াজ হলো।

তীব্রতর নতুনতর হয়ে উঠলো আমার মনের যন্ত্রণা।

ষোড়শ অধ্যায়

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই কারুর কোন খোঁজ না করেই ঘর থেকে বেরোলাম, পালালামই বলা যায়। সারারাত বিশ্রামের পর অবিশ্বাস্য মনে হলো আগের দিনের ঘটনা ও আমার আচরণ। অসম্ভব—সবই অসম্ভব, মিথ্যা। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলা উচিত হবে না। ঘর ছাড়লাম তাই।

রেনগোল্ডের হোটেলে এসে দেখলাম, তিনি পথের শেষপ্রান্তে স্নিগ্ধ রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্র ও আকাশের বাধাহীন আলোমাখা একটি অপ্রশস্ত প্রাচীরের সামনে কয়েকটি চেয়ার ও টেবিলের মাঝখানে বড় কাগজ ও কলম নিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন আচ্ছা, মিঃ মলটোন, এমন সকাল কেমন লাগে আপনার ?

—'চমৎকার।'

প্রাচীরটা পেরিয়ে এসে আবার চেয়ারে বসলেন রেনগোল্ড এবং আমাকে বসতে বলে বললেন—অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনাকে আমি 'ওডিসি'র উৎস এবং মূলগত ভাব সম্বন্ধেও বলেছিলাম কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করতে পারিনি। আমার মতে কেন তিনি দীর্ঘ দশ বছর বাড়ী ফিরতে চাননি ? কারণ, স্ত্রী পেনিলোপের সঙ্গে ইউলিসিসের সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল না। যুদ্ধযাত্রার আগে থেকেই মন কষাকষি ছিল, এছাড়া, গৃহের অশান্তিই ছিল তাঁর যুদ্ধযাত্রার কারণ। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর ছিল না বলেই পারিবারিক জীবনে সুখী ছিলেন না ইউলিসিস।

আমি দুচোখ ভরে শুনতে লাগলাম।

তিনি বলে চললেন—'তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও সাবধানী। পত্নীর সঙ্গে সদ্ভাব থাকলে শুধু বীরত্ব খ্যাতি অর্জনের জন্য তিনি ঘর ছাড়তেন না। যুদ্ধের সুযোগে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন।'

—'আপনার উক্তি যুক্তিপূর্ণ বটে।'

'তাহলে স্বীকার করছেন, মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করছে সব। এখানে ওঁদের মনস্তত্ত্বটা হচ্ছে, পেনিলোপ ছিলেন ধর্মপরায়না, গর্বিতা, সুগৃহিণী,

জননী ও জায়া। আর ইউলিসিসের চরিত্র হচ্ছে পরবর্তী যুগের। সংস্কার মুক্ত, সুচতুর, যুক্তিপরায়ন, বুদ্ধিমান, নাস্তিক ও সন্দেহবাদী ছিলেন ইউলিসিস।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম—'আমার ধারণা আপনি ইউলিসিসের চরিত্র কলংকিত করছেন—'ওডিসি' তে—

—'ওডিসি' নিয়ে আমরা মাথাব্যথা করতে চাই না। 'ওডিসিকে' সম্প্রসারিত করতে আমরা চিত্রনাট্য নির্মান করতে চলেছি 'ওডিসি রচিত হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ফিল্ম এখনও আরম্ভ হয়নি।

ইউলিসিস ও পেনিলোপের মধ্যে বিরোধের কারণ হলো—পেনিলোপের পাণি প্রার্থীরা ট্রয় যুদ্ধের আগে থেকেই তার প্রণয়াসক্ত হয় এবং তাঁকে নানা উপহার পাঠায়। কিন্তু পেনিলোপ সেগুলি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর ইচ্ছা স্বামী এই অবাঞ্ছিত প্রার্থীদের দূর করে দেন। কিন্তু ইউলিসিস কোন কারণে এর ওপর গুরুত্ব দেননি। ঝামেলা তিনি পছন্দ করতেন না, শান্তি তিনি ভালোবাসেন।

স্বামীর এই ভাব দেখে পেনিলোপ প্রতিবাদ করেন। মনে অবিশ্বাস জেগে ওঠে। কিন্তু তবুও ইউলিসিস তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নানা উপদেশ দিতেন। পেনিলোপ তাঁর স্বামীর উপদেশ মেনেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মনে একটা বিদ্বেষ জেগে ওঠে। ভাবেন, আর স্বামীকে ভালোবসতে পারবেন না। অবশেষে পেনিলোপ ইউলিসিসকে মনের ভাব জানান। ইউলিসিস নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে ফিরে পেতে চান, প্রতিকার করতে চান।

কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বিষময় হয়ে ওঠে তাঁর মন। এই অবস্থায় বাস করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অবশেষে ট্রয়-যুদ্ধের সুযোগে তিনি গৃহত্যাগ করেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তিনি সমুদ্রাভিমুখে দেশের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি জানেন স্ত্রী তাঁকে ভালবাসে না তাই অজ্ঞাতসারে ফিরে না যাবার অজুহাত খুঁজতে থাকেন। অবশেষে একদিন তিনি ফিরলেন ঠিকই। স্বামী প্রত্যাবর্তনের পর পতিপরায়ণা স্ত্রী জানালেন, একটি শর্তে স্বামীকে আবার ভালবাসবে, পাণিপ্রার্থীদের হত্যা করতে হবে। আমরা জানি, ইউলিসিসের রক্তপিয়াসী মন নয়, তিনি ব্যাপারটা শান্তির মধ্যে নিষ্পত্তি করতে পারলেই খুশী হবেন। বুঝলেন, পেনিলোপের প্রেম এবং

শ্রদ্ধা হত্যার ওপরেই নির্ভর করছে। তাই মনস্থির করে পাণি প্রার্থীদের হত্যা করলেন এবং পেনিলোপও আর তাঁকে ঘৃণা করলেন না। তারপর দীর্ঘ বিরহের পর শুরু হলো তাঁদের প্রণয়-মধুর মিলন।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিঃ মলটোঁন ?

হ্যাঁ· বুঝেছি। এ ব্যাখ্যা শুনে মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা তীব্রতর হলো।

রেনগোল্ড বললেন, ইউলিসিস এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করলেন কেন, না করলেও তিনি পারতেন। করলেন এই কারণে, তাঁর নিষ্ঠুর আচরণের দ্বারা প্রমাণ করলেন, তিনি শুধু শঠ, নমনীয় ও বিচক্ষণ নন, প্রয়োজন হলে যুক্তি-হীন, হৃদয়হীনও হতে পারেন। তিনি পেনিলোপের কাছে এটিই প্রমাণ করলেন।

রেনগোল্ডের যুক্তি চমৎকার। চুপ করে রইলাম।

রেনগোল্ড এবার উপসংহার করলেন—দেখলেন তো মলটোঁন, চিত্রনাট্য পুরোপুরি শুধু রেখায় ফুটিয়ে তুলতেই হলো।

বললাম—আপনার ব্যাখ্যা আমি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ, আপনার ব্যাখ্যায় ইউলিসিসের মূল চরিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। একটি আদর্শ পুরুষকে অতি সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে আপনি বর্ণনা করেছেন।

মুহূর্তের মধ্যে রেনগোল্ডের ঠোঁটের কোণের হাসি মিলিয়ে গেল। কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন—দেখুন, মিঃ মলটোঁন, আপনি কিছু বোঝেন না। বুঝবেনও না। আর কেনই বা একথা আমি বললাম, শুনে রাখুন। আপনি যেমন মনে করছেন, ইউলিসিসকে ঠিক তেমনি মর্যাদাহীন শিষ্টাচারহীন করে দেখাতে চাই না আমি। 'ওডিসি'তে তাঁকে যেভাবে আঁকা হয়েছে ঠিক সেইভাবেই দেখাতে চাই। ভেবেছিলাম, আপনিও ইউলিসিসের সুসভ্য ও সংস্কৃতি সম্পন্ন, কিন্তু এখন দেখছি আপনি তর্ক করছেন অমার্জিতরুচি পেনিলোপের মতো—রেনগোল্ড আত্মতৃপ্তির হাসি হাসলেন।

রাগে ফ্যাকাশে হয়ে গেল আমার মুখ। কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—যদি মনে করে থাকেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অর্থ এই যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রণয়ীকে পোষণ করবে, তবে আমি অমার্জিত থাকতেই প্রস্তুত, মিঃ রেনগোল্ড।

—'আপনি দেখছি আজ কোন যুক্তির ধার ধারছেন না। এক কাজ করুন বাড়ী গিয়ে শান্ত মনে আবার ভেবে দেখুন। কাল সকালে আপনার চিন্তার ফলাফল জানাবেন, কেমন ?

—বেশ। আমি ও রেনগোল্ড উঠে পড়লাম। আমি হোটেলের পথ ধরে এগোতে লাগলাম।

সপ্তদশ অধ্যায়

এখন আর রেনগোল্ডের ব্যাখ্যা ভেবে দেখতে ইচ্ছে করলো না। ইচ্ছে হলো একমনে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করি। রেনগোল্ড বলেছেন অব্যক্ত, অবর্ণনীয় একটা কিছু। তাই আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

স্থির করলাম ব্যক্তিসতার ঘরের ঠিক নীচে যে নির্জন জায়গাটা আছে ঐখানে বসে ভেবে দেখবো। আর যদি না পারি, তাহলে জলে সাঁতার কাটবো।

ছায়াঘেরা জনবিরল পথ। যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম সে পথ দিয়েই এলাম। যে রাস্তাটা গ্রীষ্মাবাসের দিকে গেছে শেষে ঐ পথ ধরেই হাঁটতে লাগলাম।

গ্রীষ্মাবাসে এসে নীচের দিকে তাকালাম তিনশো ফুট নীচে সমুদ্র কাঁপছে। চারিদিকে সূর্যের আলো ঝলমল করছে। কোথাও নীল, কোথাও সবুজ জল।

অতর্কিতে আত্মহত্যার আকাঙ্খা মনে জেগে উঠলো। আলোর এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করলো। মৃত্যুই আমার পরম শান্তি, একমাত্র কাম্য।

আত্মহত্যার প্রলোভনে উম্মাদ হয়ে উঠলাম। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে এমিলিয়ার মুখটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ভাবলাম আমার মৃত্যু সংবাদ শুনে সে কেমন করে তা সহ্য করবে? নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললাম, জীবনে ক্লান্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে চাও না তুমি, আত্মঘাতী হতে চাও এমিলিয়ার জন্যে?

ভীত হলাম, বিতৃষ্ণার ভাব কেটে গেল।

সে আমায় অন্যায় ভাবে ঘৃণা করে, ভালোবাসে 'না, তাই অনুতপ্ত হয়ে আমি মরতে চাই।

আমার মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। বর্তমান অবস্থায় চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ মনে জেগে উঠলো। ইউলিসিসের প্রতি পেনিলোপের অবজ্ঞার কথাটা যখন রেনগোল্ড বলছিলেন তখন আমার মনে পড়েছে এমিলিয়ার কথা

আমি মনে কষ্ট পেয়ে প্রতিবাদ করেছি। এমিলিয়ার শ্রদ্ধা অর্জন করতে হলে আত্মহত্যার প্রয়োজন নেই। সেদিক থেকে পেনিলোপের পাণীপ্রার্থীদের মত ব্যাত্তিসতাকে হত্যা করাই উচিত। কিন্তু আমাদের এই যুগে এসব কিছু চলবে না। সব থেকে ভালো হবে রোমে ফিরে যাওয়া। এমিলিয়ার উপদেশ না শুনে বীর ইউলিসিসের মত কাজ করবো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। সত্যিই তো।

আর ভেবে কাজ নেই। বাড়ী ফিরে এমিলিয়াকে সব গুছিয়ে নিতে বলবো। ব্যাত্তিসতাকে না জানিয়েই কাল সকালে চলে যাব। ব্যাত্তিসতার সঙ্গে দেখা না করাই ভালো। তিনি চালাক, সব বুঝে ফেলবেন।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে এলোমেলো পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম। একটি সরু গলি পেরিয়ে বাগান বাড়ীর নীচে এলাম। খাড়া পথটি ধরে নীচের দিকে নেমে হাঁপাতে লাগলাম।

সমুদ্রতীরে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে বড় বড় পাথর। দুটি শিলাময় অন্তরীপ চলেছে স্বচ্ছ জলের সীমানা পেরিয়ে, সূর্যালোকে জলের তলে সাদা নুড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। তারপর মরচে পড়া, ফাটল ধরা, বালি ও জলে আধো ডোবা প্রকাণ্ড কালো পাথর দেখতে পেলাম। ভাবলাম পাথরটার পেছনে গিয়ে শুয়ে পড়বো।

সেখানে গিয়ে দেখলাম, এমিলিয়া একেবারে অনাবৃত হয়ে শুয়ে আছে।

প্রথমটা আমি এমিলিয়াকে চিনতে পারিনি। তারপর নজর পড়লো নুড়ির ওপর ছড়ানো বাহুদুটির ওপর। দেখলাম, তর হাতে রয়েছে একটি সোনার আংটি। সেটা কিছুদিন আগেই পরিণয়সূত্রে আমার কাছ থেকেই পেয়েছে এমিলিয়া। বিশাল দেখাচ্ছে তার নগ্ন দেহটি। এই প্রত্যাশিত মুহূর্তে আমার মনে বাসনা জেগে উঠলো। দৈহিক মিলনের তীব্র আকাঙ্খা হল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এমিলিয়ার ওপর। সে তো রাজী হবে না।

আমি স্পষ্ঠ কণ্ঠে ডাকলাম—এমিলিয়া।

সে চমকে উঠলো। পেছনে তাকিয়েই জামা নেবার জন্যে হাত বাড়ালো। বললাম ভয় নেই এমিলিয়া আমি রিকার্ডো। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তোমাকে দেখছিলাম, মনে হচ্ছে আজ প্রথম দেখছি।

এমিলিয়া আর লজ্জা চাপা দেবার জন্য ব্যস্ততা দেখালো না। আমাকে দেখে ওর ভয় কেটে গেছে।

বললাম—জায়গাটা খুব সুন্দর, আমিও সূর্য-স্নান করবো। মনে হয়, বিশেষ করে প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যই এই জায়গাটা তৈরী।

এমিলিয়া বলল—হ্যাঁ সত্যিই তাই।

—তবে আমাদের মধ্যে তো আর প্রেম নেই।

এমিলিয়া চুপ। পাথরের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে তাকে দেখে যে কামনা জেগেছিল আবার তা প্রবল হয়ে উঠলো।

লক্ষ্য করলাম, কেমণ করে জানি না, এমিলিয়ার কাছে এসে পড়েছি; তারই পাশে বসে আছি। আমার মুখটি তার মুখের কাছে, নিশ্চল নিদ্রামগ্ন সে। খাবার মুখে দেবার আগে ক্ষুধিত যেমন আহার্যের দিকে তাকায়, আমিও তেমনি এমিলিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেকদিন চুমু খাইনি ও মুখে! সে যদি চুমু ফিরিয়ে দেয়, তবেই তার স্বাদ ও গন্ধ হবে পুরোণো মদের মত। ধীরে ধীরে ঠোঁট লাগালাম এমিলিয়ার ঠোঁটের কাছে। চুমু খেলাম না, অনুভব করলাম তপ্ত ঠোঁটের উষ্ণতা। আস্তে আস্তে এমিলিয়ার ঠোঁটের সঙ্গে আমার ঠোঁট মেলালাম। সেই ছোঁয়া পেয়ে সে জেগে উঠলো না। বিস্ময় দেখালো না এতটুকু। আবার ঠোঁটে ঠোঁট লাগালাম। মৃদু চাপ দিলাম। আর একটু জোরে চাপ দিলাম। একটি নিবিড় চুম্বন এঁকে দিলাম সে মুখ খুললো ধীরে ধীরে, তাঁর দাতের মাড়ির ওপর এলো আমার ঠোঁট দুটি অনুভব করলাম। একটা কোমল হাত, আমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলো—

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সমাধি থেকে জেগে উঠলাম। দেখলাম এমিলিয়া তেমন ভাবেই শুয়ে আছে। আমি তাহলে স্বপ্ন দেখছিলাম।

অস্ফুট স্বরে ডাকলাম—এমিলিয়া। আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি—তোমায় চুমু খাচ্ছি।'

নীরব রইলো এমিলিয়া। ওর মৌনতায় আমি আকাঙ্খা শেষ করলাম। প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে বললাম—'বাত্তিসতা কোথায় ?'

স্থির কণ্ঠে সে বললো—'জানি না, তবে তিনি আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন না'

হঠাৎ বলে ফেললাম—'দেখ এমিলিয়া, কাল সন্ধ্যায় দেখলাম, বাত্তিসতা তোমায় আদর করছে।

'হ্যাঁ জানি, তুমি তো আমায় দেখেছো আর আমিও তোমায় দেখেছি।'

তার স্বাভাবিকতা দেখে একটু বিব্রত বোধ করলাম। ভেবেছিলাম স্তব্ধ সূর্যালোকে ও সমুদ্রের নীরবতায় ঘুচে গেছে আমাদের বিরোধ, দাম্পত্য কলহ, স্বাভাবিক দম্ভ ও ও ঔদাসীন্যের স্তরে এসে পেঁছেচে। তবু অতিকষ্টে বললাম —'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, এমিলিয়া।'

এখন নয় আমি একটু রোদে থাকবো এখন। বিকেলে শুনবো।'

—'ঠিক আছে'।' পেছন না ফিরেই বাগান বাড়ীর পথ ধরে চলতে লাগলাম।

অষ্টাদশ অধ্যায়

লাঞ্চের সময় কোন কথাই হলো না। দুপুরের উজ্জ্বল আলো যেন বাগানবাড়ীর ভেতরে এনেছে অখণ্ড মৌনতা। এমিলিয়া আর আমার মধ্যে যেন সৃষ্টি হয়েছে অনন্ত ব্যবধান। স্থির করেছি, বিকেলের আগে এমিলিয়াকে কিছু বলবো না। সমুদ্র সৈকতে যে আনন্দ কৌতূহল, জড়তা ও ঔদাসীন্যে চুপ করেছিলাম, এখনও রয়েসে ঠিক সে ভাব।

লাঞ্চের শেষে এমিলিয়া বিশ্রামের জন্যে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একা একা বসে স্বচ্ছ আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের দিকে কিছুক্ষণ জানলা দিয়ে চেয়ে রইলাম। তন্দ্রা এলো ভাবলাম, রেনগোল্ডকে জানিয়ে দিয়ে আসবো আমার সংকল্পের কথা। হঠাৎ তন্দ্রার ভাব কেটে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

রেনগোল্ডের হোটেলে আসতে আধঘণ্টা সময় লাগলো। চঞ্চল হলেও যেন বেশ পরিষ্কার হয়েছে মন। স্বস্তি বোধ করলাম, আনন্দও হলো। হয়তো ঠিক পথে চলেছি এবার

আমরা বারএ এসে ঢুকলাম। আর কেউ নেই সেখানে। বললাম—'এত শিগগির আপনার কাছে ফিরে এলাম বলে নিশ্চয় অবাক হয়েছেন আপনি, অনেক ভেবেছি এ সম্বন্ধে—আপনাকে। আমার চিন্তার ফলাফল জানাতে এলাম। দেখুন, এই চিত্রনাট্য লিখতে আমি পারবো না। চাকরী ছেড়ে দেবো।

মনে হয় রেনগোল্ডও তাই আশা করে ছিলেন। তাই বিচলিত না হয়ে বললেন—'আমাদের মধ্যে আন্তরিক ও সুস্পষ্ট আলাপ হওয়া দরকার।'

আমি আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছি—'ওডিসি' চিত্রনাট্য লিখবো না আমি। কারণ আপনি যা ব্যাখ্যা করেছেন তা আমার মনঃপূত হয়নি। আপনার 'ওডিসি' হোমারের 'ওডিসি' নয়। হোমারের ওডিসি আমায় মুগ্ধ করে, আপনার 'ওসিসি' বিরক্ত আনে।

রেনগোল্ড উত্তেজিত দেখে। আমিও উত্তেজিত হয়ে গেলাম। বললাম—'এ অসহ্য, হোমার যেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে চিত্র রূপায়ণের অক্ষমতার জন্য হোমারের নায়ককে হীন প্রতিপন্ন করার এই সুপরিকল্পিত

প্রচেষ্টা আমার কাছে বিরক্তিকর—আমি কিছুতেই সে কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি না। প্রসারতা নেই আপনার পরিকল্পনায়। এবার বুঝলেন তো, কেন এই চিত্রনাট্য রচনা করতে চাই না? আপনি কেবল টাকাটাকেই বড় মনে করেন।

নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছিল। কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল আমার মুখ। আবার বললাম—'রেনগোল্ড।' অনুভব করলাম, আমার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে এক অব্যক্ত বেদনা ও অনুনয়।

রেনগোল্ড আমার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করলেন। একটু পেছনে সরে এসে বিনীত কণ্ঠে বললেন—'ক্ষমা করুন, মলটেন। হঠাৎ কথাটি বলে ফেলেছি।'

আমি চকিত চঞ্চল ভাবে বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্ষমা করলাম। আমার চোখ দুটি জলে ভরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রেনগোল্ড বললেন—আপনি যে চিত্রনাট্য লিখবেন না, সে কথা জানিয়েছেন বাত্তিসতাকে?

—না, আপনিই তাঁকে বলে দেবেন। তাঁর সঙ্গে আমার হয়তো আর দেখা হবে না। বাত্তিসতাকে বলে দেবেন, আমি একাজ করতে পারবো না। আপনারা 'ওডিসি'র যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন—আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই, আমার শরীর ভালো নেই।

—বাত্তিসতা কি বিশ্বাস করবেন?

—সেজন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।

—তবু আমি দুঃখিত, আপনার সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমাদের মধ্যে আপোষে মিটিয়ে নেওয়া যায় না?

এ আপনার ভুল ধারণা, মিঃ রেনগোল্ড, আপনি চান এক, আর আমি চাই অন্য। প্রচণ্ড গরমিল আমাদের দুজনের মতের মধ্যে তবু এখনও আমার দৃঢ় ধারণা, হোমার যেমন লিখেছেন হুবহু তেমনি করেই ওডিসি'কে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করা যেতে পারে।

এটা আমার দুর্ভাগ্য, মলটেন। আপনি চান হোমারের জগতের মতো একটি জগৎ, দুর্ভাগ্যের বিষয় সেটা সম্ভব নয়।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, রেনগোল্ড, দান্তের কাব্যে ইউলিসিস সর্গটি আপনি পড়েছেন? এই সর্গে দান্তে ইউলিসিসের মুখ দিয়ে তাঁর নিজের ও

সঙ্গীদের ধ্বংসের কথা বলেছেন।

—হ্যাঁ, আমি জানি।

—এ অংশটি আমি আবৃত্তি করে শোনাতে পারি আপনাকে?

—বেশ তো।

আমি মুখ নীচু করে আবৃত্তি করতে লাগলাম। সহজ স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বর আমার।

আবৃত্তি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। রেনগোল্ডও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আচ্ছা, এ অংশটি বেছে নিলেন কেন বলুন তো? এটি সুন্দর, তবু কি উদ্দেশ্যে অংশটি আবৃত্তি করলেন?

—ঠিক তেমনি একটি ইউলিসিসে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম আমি। আমার কল্পনায় রয়েছে এই ইউলিসিস। আবৃত্তির মাধ্যমে সে কথাটিই বলে গেলাম।

—কিন্তু দান্তে মধ্যযুগের লোক। আর আপনি হলেন আধুনিক যুগের।

এ কথার কোন উত্তর দিলাম না আর। রেনগোল্ডের হাতে হাত রেখে বললাম—আবার কখনও আপনার সঙ্গে কাজ করবো। পরিচয় তো রইলই। আজ চলি।

তাড়াতাড়ি বার-এর বাইরে এলাম। রেনগোল্ডের হাত দুখানা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। যেন বলতে চাইছেন—কেন যাচ্ছেন? কেন?

উনবিংশ অধ্যায়

সোজা বাড়ী ফিরে এলাম। মানসিক অস্থিরতা ও বিচিত্র উল্লাসে একমনে কিছুই ভাবতে পারিনি। কাজের সময় ভাবনার অস্তিত্ব থাকে না। এতক্ষণ কাজ করছিলাম, তাই কিছু ভাবিনি। জানতাম, কাজ হয়ে গেলেই সব কথা ভাববো আবার।

বাড়ী ফিরে শোবার ঘরে সোজা চলে এলাম। কেউ নেই। চেয়ারের ওপর একটা পত্রিকা খোলা পড়ে রয়েছে। অ্যাসট্রে থেকে অর্ধ-দগ্ধ সিগারেটের ধোঁয়া বেরোচ্ছে। রেডিওতে শোনা যাচ্ছে নাচ ও গানের শব্দ। বোঝা গেল একটু আগেই এমিলিয়া এখানে ছিল।

ঘরটির এই আশ্চর্য নীরব পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করে দিল। ঘরটিকে একান্ত আপন করে নিয়েছে এমিলিয়া।

হঠাৎ মনে পড়লো গৃহের প্রতি এমিলিয়ার অনুরাগের কথা, সে যেন একটা স্থায়ী আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে এখানে। সত্যি ক্যাপ্রিতে এসে এমিলিয়া খুশী হয়েছে। বাত্তিসতার বাড়ীতে বাস করার সুযোগে আরও বেশী তৃপ্ত হয়েছে সে। আর আমি তাকে জানাতে এসেছি যেতে হবে এবার।

উদ্বিগ্নচিত্তে এমিলিয়ার ঘরের দরজা খুললাম। এমিলিয়া নেই। বিছানার পাশে চেয়ারে তার গাউন ও শ্লিপার পড়ে রয়েছে। ড্রেসিং টেবিলে প্রসাধন সামগ্রী সুন্দর করে সাজানো রয়েছে। এমিলিয়ার জুতো, জামা, রুমাল সবই এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু রোম থেকে যে সুটকেশ সে এনেছিল তার চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।

ভাবলাম বাত্তিসতা বা আমাকে ; যাকেই সে ভালবাসুক না কেন তাতে তার কিছু যায় আসে না। সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা গৃহ, নিশ্চিন্ত নীরব শান্ত একটা আশ্রয় নীড়ই এমিলিয়ার কাছে বেশী মূল্যবান।

রান্নাঘরে দিকে গেলাম। শুনতে পেলাম এমিলিয়ার কণ্ঠস্বর। সে পরিচারিকাকে উপদেশ দিচ্ছে—মলটেনি সাধারণ খাবারই পছন্দ করে ঝোল বা ঝাল খেতে চায় না, সেদ্ধ হলেই চলবে। আচ্ছা এখন কি মাছ পাওয়া যায় ? শোনো যারা হোটেলে মাছ দেয় তাদের কাছে থেকে কাঁটা ছাড়া টাটকা মাছ এনে

ভেজে নিতে পারো, সেদ্ধ করে নিলেও চলবে।

চাটনি করতে জানতো ?

- হ্যাঁ জানি।

—ঠিক আছে, আর সে দাম করো। শাক সব্জি, গাজর, ডিম যা পাওয়া যায় সব এনে বরফের মধ্যে রেখে দিও। যেন খাবার আগে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর হ্যাঁ, রাত্রে আজ সাধারণ কিছু খাবো, ভালো দেখে মাংস এনো।

কেন জানি না, এই ঘরোয়া আলোচনা শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে পড়লো, রেনগোল্ডের সঙ্গে আলাপের শেষ অংশটুকু।

যাদুমন্ত্রের প্রভাবেই যেন মনে হলো এমিলিয়া পেনিলোপ, সে তার পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলছে। হ্যাঁ, সবই এক কিন্তু তবু যেন তফাৎ। জানলার কাছে গিয়ে ডাকলাম—এমিলিয়া : ন আছে, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে ?

—হ্যাঁ, ঘরে গিয়ে বসো। এর সঙ্গে কাজটা শেষ করে আসছি। খাবার ঘরে ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসলাম। যা বলতে যাচ্ছি তা ভেবে মনটা নিরাশ হয়ে গেল। যে বাগান বাড়ীতে এমিলিয়া থাকতে চায়, সেখান থেকে চলে যাবার কথা তাকে জানাতে এসেছি। যে দুর্বিসহ পরিবেশের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছিল, এখন তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এমিলিয়া। তবু এ যেন বিদ্রোহের চেয়েও অস্বস্তিকর। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই আমাদের উভয়ের মঙ্গলের জন্য যেতে হবে। তাকে জানাতে হবে।

খানিক পরেই এমিলিয়া এল বলল—বলো, কি বলতে চাইছিলে ?

তোমার জিনিষপত্র বেঁধে নাও। আমরা কাল সকালেই রোমে ফিরে যাচ্ছি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে বললাম—আমি ঠিক করেছি চিত্রনাট্যটি লিখবো না। তাই সব ছেড়ে রোমে চলে যাবো।

এমিলিয়া ভ্রূকুঁচকে বললো—কেন শুনি ? বাত্তিসতা জানেন।

শুষ্ক কণ্ঠে বললাম—আশ্চর্য হচ্ছি তোমার কথায়। কাল জানালা দিয়ে যা দেখেছি তারপর হয়তো—এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না আমি। বাত্তিসতা জানেন: তাঁকে এই মাত্র বলে এলাম আমি।

বিরক্ত হয়েই সে বললো—তুমি ভুল করেছো। কারণ ফ্ল্যাটের কিস্তি দিতে হবে। এছাড়া, তুমি নিজেই বলেছ, চুক্তি ভঙ্গ করা মানে ভবিষ্যতের

পথে বাধা সৃষ্টি করা।

আমি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম—এ কাজ কেন করছি তা তুমি জান না। এ যে আমার সংসার বাইরে। যে ব্যক্তি আমার স্ত্রীকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে, তার কাছ থেকে আমি টাকা নিই না। ছেড়ে দিচ্ছি একমাত্র তোমারই জন্য, যাতে আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণাটা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তোমার ধারণা ভুল। আমি তেমন লোক নই।

এমিলিয়ার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো—যদি তুমি তোমার নিজেরই জন্য এ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চাও, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আর যদি বল যে এই জন্য আমি দায়ী—তাহলে তোমার এখনও সময় আছে মত বদলাবার, এমন কাজ করলে তোমারই ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন করলাম—তারপর?

—আগে বল, তোমার এই স্বার্থ ত্যাগে আমার কি লাভ।

বুঝলাম চরম মুহূর্ত এসেছে। বললাম—আমার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে চাই, তুমি যেমন মনে কর তেমন নীচ, ঘৃণ্য আমি নই।

এমিলিয়া বললো—ওতে কিছু প্রমাণ হবে না। তাই বলছি, তোমার সিদ্ধান্ত ছাড়।

– কী বলছ তুমি? প্রমাণ হবে না কিছু?'

আবার বসলাম। হাত বাড়িয়ে এমিলিয়ার হাত ধরে বললাম—'বল এমিলিয়া।'

সে সুন্দর ভঙ্গীতে তার হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো—'ছেড়ে দাও, আমায় ছোঁয়ার চেষ্টা করো না। আমি ভালোবাসি না তোমায়, আর বলতে পারবো না তোমাকে।

আমি মনে মনে কষ্ট পেলাম। হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললাম—'ও কথা রাখ, তোমার ঘৃণা সম্বন্ধেই আলোচনা হোক—এ কাজটি ছেড়ে দিলেও কি আমায় ঘৃণা করবে তুমি?

এমিলিয়া হঠাৎ ধৈর্য্য হারিয়ে লাফিয়ে উঠে বললো—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এখন মুক্তি দাও আমায়। তুমি ঘৃণার যোগ্য, শত চেষ্টা করেও নিজেকে শোধরাতে পারো না। তুমি পুরুষ নও, তোমার আচরণ পুরুষোচিত নয়।'

আমি তার কথায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রাগ ও শ্লেষের সঙ্গে বললাম-

'তার মানে ?'

'—বোকা কোথাকার। জান না, তার মানে নেই কিছুই ?'

সে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, যেমন করে তার অন্তর ফিরিয়ে নিয়েছে সে। এ অবজ্ঞার কোন কারণ হয়তো আছে, কিন্তু সে সেটা বোঝাতে পারছে না। আমারও কোন দোষ থাকতে পারে।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলাম, গত কয়েকমাস ধরে বাত্তিসতা এমিলিয়াকে প্রেম নিবেদন করছেন. আমি নিজের স্বার্থে কোন প্রতিবাদ করছি না। মনে পড়ে গেল কয়েকটি ঘটনা।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে এমিলিয়া বলল কাল সন্ধ্যায় তুমি যা দেখেছ, সত্যিকারের পুরুষ হলে তোমার মতো ব্যবহার করতে পারে না। তুমিই আমার কাছে এসে জানতে চেয়েছিলে আমার মত—আর আমার মতটা তুমি মেনেছিলে। তারপর জানিনা জার্মানটার সঙ্গে কি কথা হয়েছে তোমার। আজ বলছো আমারই জন্যে তুমি কাজটা ছাড়ছো। তুমি ইচ্ছে হয়, পৃথিবীর সব কাজ ছেড়ে দিতে পারো, কিন্তু আমি আমার মত বদলাতে পারবো না—তোমায় ভালোবাসতে পারবো না। তাই বলছি ঝামেলা না করে আমায় একটু শান্তিতে একা থাকতে দাও।'

আমায় ঘৃণা করে এমিলিয়া। কিন্তু কেন ? তার ঘৃণার উৎস খুঁজে পেতে চেষ্টা করলাম। তাই যথাসম্ভব শান্তভাবে বললাম—দেখ এমিলিয়া তুমি আমায় ঘৃণার কারণটা বলছ না। আমি জানি তোমার কথা মিথ্যে। আচ্ছা, আমি যদি কারণটা জানাই, তাহলে তুমি বলবে আমার কথা সত্যি কি না।

এমিলিয়া স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল। শ্রান্ত ও বিরক্ত কণ্ঠে বললো—কিছু বলতে পারবো না আমি দোহাই তোমাকে, তুমি আমায় মুক্তি দাও। তুমি ভেবেছিলে, বাত্তিসতার চরিত্র জেনে আমি নিজের স্বার্থে তোমাকে ঠেলে দিয়েছিলাম তাই না ? যদি একথা সত্যি ভাব, তাহলে তুমি জেনে রেখো, ভুল করছ। কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত বাত্তিসতা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। আমায় তুমি বিশ্বাস কর, আর যদি না করো তাহলে বুঝবো তুমি আমায় অবজ্ঞা করতে চাও। আমার কথা বিশ্বাস করতে কিছুতেই চাও না।

তার পক্ষ থেকে উত্তর না পেয়ে হাত ধরে বললাম—বল এমিলিয়া, কেন তুমি

আমায় ঘৃণা কর ? তুমি ক্ষণিকের জন্যে কেন ভুলতে পারো না সে কথা ?

এমিলিয়া মুখ ফেরালো। আরও কাছে সরে এলাম। তার দিক থেকে কোন বাধা না পেয়ে সাহসে ভর করে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। লক্ষ্য করলাম, চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছে তার।

এইবার এমিলিয়া মুখ খুলল—'তোমায় আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না ! আমার ভালোবাসা নষ্ট করার মূলে তুমি। উঃ কি ভীষণ ভালোবাসতাম তোমায়। কাউকে এমন ভালোবাসিনি আর বাসবোও না। তোমার স্বভাবের দোষেই সব নষ্ট হয়েছে। আমরা সুখী হতে পারতাম। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়। কেমন করে সব ভুলে যাব তোমায় ঘৃণা না করে ?

আমার মনে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠলো। এমিলিয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম—'শোন, সব গুছিয়ে নাও। কাল সকালেই আমরা যাবো। রোমে গিয়ে সব তোমায় জানাবো, তাহলেই নিশ্চয়ই তোমার বিশ্বাস হবে ?

সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো—'না—না—না, রোমে গিয়ে কি হবে ? ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে, মা আমায় চান না, ভাড়াটে বাড়ীতে থেকে আবার আমায় টাইপিস্ট হতে হবে। বাত্তিসতা বলেছেন যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পারি। আমি এখানেই থাকবো।

আমি উন্মত্তের মত চেঁচিয়ে উঠলাম—কাল সকালেই তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। বুঝলে ? যদি তুমি না যাও, তাহলে আমিও থাকবো। দেখবো, বাত্তিসতা যাতে দুজনকেই তাড়িয়ে দেন।

—'না, তুমি থাকতে পারবে না।

একশোবার থাকবো।

সে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিংশ অধ্যায়

উত্তেজনার মুহূর্তে বলেছি এখানে থাকবো। বুঝলাম এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমাকে যেতেই হবে। আমার কারুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মনের ক্ষীন আশাটুকু তখনও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায় নি, তাই বলেছিলাম এখানেই থাকবো। দুর্গম পথের অভিযাত্রী যেন পর্বতের বিপজ্জনক স্থানে উঠে বুঝতে পারছে জায়গাটি নিরাপদ নয়। অথচ এগোবার বা পিছোবার কোন উপায় নেই—আমার মনের অবস্থাও ঠিক তাই।

ঘরের ভেতরে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ালাম। আজ আর ওদের সঙ্গে বসে থাকার ইচ্ছে নেই। ভাবলাম বাইরে কোথাও খেয়ে নেবো, দেরী করে ফিরবো। কিন্তু এই প্রখর রোদে চারবার একই রাস্তা ধরে আসা যাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তাই আর বেরুতে ইচ্ছে করলো না।

অবশেষে কর্তব্য স্থির করে ঘরে তালা লাগিয়ে ঘর বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম খানিক পড়ে গভীরঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম।

মনে হলো রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু বিছানা থেকে উঠে জানলা খুলে দেখলাম মাত্র নটা বাজে। ভাবলাম ডিনারের টেবিলে গিয়ে বাত্তিসতার সঙ্গে ঝগড়া করবো, যাতে তিনি ঘর থেকে বের করে দিতে বাধ্য হন।

খাবার ঘরে এসে দেখলাম কেউ নেই; পরিচারক জানালো, এমিলিয়া আর বাত্তিসতা বেরিয়েছে, ইচ্ছে হলে আমি রেস্তোরায় গিয়ে দেখা করতে পারি। নয়তো ঘরেও খেতে পারি।

ইচ্ছা, বিরক্তি বা হতাশা জাগলো না মনে, অসহ্য মর্মবেদনা অনুভব করলাম। এ যেন আমায় তাড়াবার একটা ছুতো।

পরিচারককে জানালাম, আমি এখানেই খাবো। খাবার টেবিলে এসে বসলাম। খাওয়া শেষ করে পরিচারককে ছুটি দিয়ে বারান্দায় এলাম। অন্ধকার অদৃশ্য সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। যা ভেবে ছিলাম তা হয়নি। আমাদের অতীত সম্পর্কটুকু অনুধাবন করলেই হয়তো আমার ওপর এমিলিয়ার বিদ্বেষের কারণ নির্নয় করতে পারতাম।

কিন্তু এমিলিয়া তা চায় না। সে চায় অকারণে ঘৃণা করতে। আমার ভালোবাসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে।

বুঝলাম কোন সত্য বা কাল্পনিক যুক্তি নেই এ ঘৃণার। জানিনা আমার আচরণ সে জন্যে দায়ী কিনা। কষ্টি পাথরে ঘষে কোনো সোনা খাঁটি কিনা যাচাই করে নিয়ে দেখা যায়। ঠিক তেমনি দুটি চরিত্রে দৈনন্দিন সংঘর্ষ থেকেই জন্মেছে তার সত্য ধারণা। বাত্তিনতার সঙ্গে তার ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে অমূলক সন্দেহ করেছি তাতেই আমায় অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করেছে এমিলিয়া। অবশ্য সে কোন প্রতিবাদ না করে চুপ করেছিল।

প্রথম থেকেই সে যেন ধারণা করে এসেছে আমি এমনিই, ঘৃণাই আমার ন্যায্য পাওনা। হয়তো অন্য ভাবে সে বিচার করেছে আমার। এমিলিয়ার অদ্ভুত আচরণই তার প্রমাণ। গোড়া থেকেই সে প্রতিরোধ করতে পারতো এই ভুল বোঝাবুঝি, স্পষ্ট ভাবে সব কথা বলে অটুট রাখতে পারতো আমাদের প্রণয় সম্পর্ক কিন্তু প্রতারিত করতে চায় সে, সে চায় আমায় ঘৃণা করতে।

মনে চিন্তা ও উত্তেজনা অসহ্য হওয়ায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রাত্রির মৌন শান্তির কথা ভেবে নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। আমি যেন স্বস্তি পাবার যোগ্য নই। আমি অবহেলার পাত্র, শান্তি পাব কেমন করে? শান্তির আশা নেই আমার জীবনে।

আবার চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালাম। আমি ঘৃণার পাত্র হলেও নগন্য নই। বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি আমার। এমিলিয়া আমার গুণ স্বীকার করেছে। এই তো আমার গর্ব! স্থির চিন্তা ও বুদ্ধি প্রয়োগ না করলে এই অকারণ অমাননার বোঝা আজীবন বয়ে বেড়াতে হবে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ভাবতে লাগলাম—কেন, আমার এই ঘৃণা অবস্থা? মনে পড়লো ইউলিসিসের সঙ্গে পেনিলোপের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে আমারই সঙ্গে এমিলিয়ার সম্পর্ক সম্বন্ধে রেনগোল্ড যে কথা গুলি বলেছিলেন—ইউলিসিস হচ্ছেন সুসভ্য পুরুষ, আর পেনিলোপ আদিম নারী—

হ্যাঁ, ইতিহাস আমাকে সুষ্ঠু আর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। কিন্তু এখন যে অবস্থায় রয়েছি তার যে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাই করি না কেন—এ অবস্থায় বাস করতে চাই না আমি।

তবে এমিলিয়া আমায় কেন ভালবাসে না? কেন সে ঘৃণা করে? তাতে কি লাভ তার? মনে পড়ে গেল তার পরিষ্কার উচ্চারণ—তুমি পুরুষ নও।

এই উক্তিটির মধ্যেই ফুটে উঠেছে এমিলিয়ার কল্পিত আদর্শ পুরুষের মূর্তি। এই হলো তার ঘৃণার মূল। এ-রূপ তার শুধু কল্পনায় গড়া নয়। যে পৃথিবীতে এতদিন সে বাস করে আসছে তার সংস্কার থেকেই এর জন্ম। তার প্রমাণ পেয়েছি বাস্তিসতার প্রতি এমিলিয়ার শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি থেকে; আর তার আত্মনিবেদনের দৃশ্য থেকে। বাস্তিসতার জীবনের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়েছে। জানি না, স্বার্থের খাতিরে আমি বাস্তিসতাকে সমর্থন করি—এ সন্দেহ সে পোষন করে কিনা, যদি তাই হয় তবে সে ভেবেছে—রিকার্ডো বাস্তিসতার মুখাপেক্ষী, বাস্তিসতা আমায় প্রেম নিবেদন করছে। রিকার্ডো চায় আমি বাস্তিসতার উপপত্নী হই।

আশ্চর্য, আমি আগে একথা ভাবিনি কেন? বাস্তিসতা ও রেনগোল্ড ও ডিসির যা ব্যাখ্যা করেছেন তাতে বুঝেছি, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কেন বুঝতে পারিনি এমিলিয়াও ঠিক তাঁদেরই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমার মূর্তি কল্পনা করে। অর্থাৎ শুধু এই যে, ওরা দুটি কাল্পনিক মূর্তির সমর্থনে যুক্তি দেখিয়েছেন, কিন্তু অবজ্ঞার ভেতর দিয়ে এমিলিয়া প্রকাশ করেছে তার মনের ভাব।

এমিলিয়া সরল প্রকৃতির, কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে ঔদ্ধত্য। হোমার ও দান্তের স্তরে সে উঠতে পারে না, কারণ সে আদর্শের জগতে বাস করে না, বাস করে—বাস্তিসতা ও রেনগোল্ডের মত লোকের জগতে।

তবু এই এমিলিয়াই ছিল আমার স্বপ্ন। আর আজ সে বিচার করছে, সামান্য ব্যাপারে আমাকে ঘৃণা করছে। আমার অভীপ্সিত যে জগৎ যার অস্তিত্ব নেই, সেখানে নিয়ে আসতে হবে এমিলিয়াকে। পরিচয় করিয়ে দিতে হবে আর একটি জগতের সঙ্গে।

হ্যাঁ, মনের সংকোচ কাটিয়ে ফেলতে হবে। এমিলিয়াকে বুঝিয়ে দিতে হবে—আমার আচরণের জন্যে নয়, প্রকৃতিগত দুর্বলতার জন্যেই সে আমায় ঘৃণা করে।

বাস্তিসতা, রেনগোল্ড ও আমি ইউলিসিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছি। কারণ আমাদের জীবন ও আদর্শও স্বতন্ত্র। বাস্তিসতার ব্যক্তিগত জীবন ও আদর্শ বা স্বার্থের সঙ্গে মিল রেখেই তিনি কল্পনা করেছেন ইউলিসিসকে। রেনগোল্ড এর কল্পিত রূপ আরও বাস্তব ও স্থূল—তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনারই অনুকূল। আর আমার রূপ হলো—মহান অথচ স্বাভাবিক, বাস্তব। অর্থ

যে জীবনকে কলঙ্কিত বা সঙ্কুচিত করতে পারে না কিংবা যে জীবন কখনও সম্পূর্ণ দৈহিক ও পার্থিব স্তরে নেমে আসে না—তেমনি একটি জীবনের নিষ্ফল অথচ আন্তরিক অভিলাষ থেকেই আমার এ রূপ কল্পনা।

হয়তো চিত্রনাট্যে ফুটিয়ে তোলা যাবে না এ রূপ, তবু ঠিক তেমন জীবন-যাপনের চেষ্টা করতে হবে আমাকে। এমনি করেই ফিরিয়ে আনতে হবে এমিলিয়ার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

কিন্তু কেমন করে? কি উপায়ে?

আরও বেশী তাকে ভালবাসতে হবে। যখন চাই, যতবার প্রয়োজন, ততবার। আমার প্রেমের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতার প্রমাণ দিতে হবে।

তবে হ্যাঁ, এখন এমিলিয়াকে জোর করলে ফল ভালো হবে না। আজ এখানেই থাকবো, কাল চলে যাবো। রোমে গিয়ে চিঠি লিখে জানাবো সব কথা—যা মুখে বলতে পারিনি।

এমিলিয়া ও বাত্তিসতার কণ্ঠস্বর বারান্দার নীচে শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু চোখে ঘুম এলো না। মনে হল ওরা—ওরা দুজনে বাগানবাড়ীতে ঘুরে ঘুরে আমার চারিদিকে গুঞ্জন করবে। আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুচোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। আর কানে এসে পৌঁছলো না বাত্তিসতা ও এমিলিয়ার গুঞ্জন রব।

একবিংশ অধ্যায়

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যালোক চোখে এসে পড়তেই ঘুম ভাঙলো। বেশ বেলা হয়েছে। বিছানায় শুয়ে চারদিকের মৌনতার ভাষা শুনলাম। সেখানকার পরিপূর্ণ পবিত্রতার মধ্যে যেন রয়েছে অতীত ক্ষত ও বেদনার প্রতিধ্বনি। বিছানায় কান পেতে আরও মন দিয়ে শুনলাম।

হঠাৎ কি একটা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব বোধ করলাম। এ যেন লোকালয়ের নীরবতা নয়, জড় জগতের নির্জনতা। বিছানা থেকে প্রায় ছুটে এমিলিয়ার দরজার সামনে গেলাম। দরজা খুলতেই পরিত্যক্ত, অবিন্যস্ত বিছানার ওপর মাথার বালিশের নীচে একটা চিঠি দেখতে পেলাম। পড়লাম—
প্রিয় রিকার্ডো,

তুমি যেতে চাও না বলে আমিই চলে যাচ্ছি। একা যাওয়ার সাহস হতো না। বাত্তিসতা যাচ্ছেন বলে সেই সুযোগটাই গ্রহণ করলাম। তাছাড়া, একেবারে নিঃসঙ্গ হওয়ার চেয়ে বাত্তিসতার সঙ্গ খারাপ নয়। রোমে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে চলে যাবো। নিজেই নিজের জীবিকা উপার্জন করবো। আর যদি শুনতে পাও বাত্তিসতার উপপত্নী হয়েছি, তাহলে একটুও অবাক হয়ো না যেন। কারণ আমিও তো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তখন জেনো যে নিজেকে বাঁচাতে পারিনি। বিদায়—এমিলিয়া।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বিছানার ওপর বসে রইলাম। একবার চোখ বুলিয়ে ঘরের চারিদিকটা দেখলাম। সবই এলোমেলো, ফাঁকা, এমিলিয়ার কোন জিনিষই নেই। ক'দিন ধরে যে বিপদের আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছি, সেই বিপদ আজ এসেছে। সত্যিই হঠাৎ আমি ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি, বৃক্ষের মতো আমার মূল উৎপাটিত হয়েছে। আমার মাটি—এমিলিয়া—যে তার প্রেম দিয়ে মূলগুলোকে সতেজ ও সজীব করেছিল, সে আজ দূরে সরে গেছে। মূল আর প্রেমের স্পর্শ পাবে না, আহরণ করতে পারবে না মাটির রসসুধা, নিষ্প্রাণ শুষ্ক হয়ে যাবে ধীরে ধীরে। বিষন্ন, ব্যথিত মনে ঘরে চলে এলাম। আমি যেন অনেক উঁচু থেকে ধপ করে নীচে পড়ে গেছি। নিদারুণ ব্যথা বুকে অনুভব করলাম।

বাইরে এসে একটা খবরের কাগজ নিয়ে কাফেতে এসে বসলাম। কী আশ্চর্য। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার কাগজ পড়া শেষ হয়ে গেল। নিষ্ঠুর শিশু যখন মাছি ধরে তার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলে, তখন মাছিটা কিছুই টের পায় না, যখন কিছুটা এগিয়ে যায়, তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আমার অবস্থাও ঠিক মাছির মতো।

দুপুরবেলা সমুদ্রতীরগামী বাসে চড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই রোদভরা ফাঁকা মাঠ চোখে পড়লো। ধীরে ধীরে স্নানের ঘাটে এসে নীচের দিকে সিঁড়িতে নেমে এলাম। সাদা বেলাভূমি প্রশান্ত নির্মল আকাশের নীচে নীল সমুদ্র স্থির, দিগন্তলীন।

সমুদ্রের জল রেশমের মতো চকচক করছে। পাঁবগুলি আলস্য ভরে ঘুরে ঘুরে চলেছে। ভাবলাম নৌকায় চড়বো। দাঁড় টানলে মনের চিন্তা কমে যাবে, তাছাড়া একা একা থাকবার সুযোগ পাবো। বৃদ্ধ রক্ষী মাথায় খড়ের টুপীটি চোখের ওপর টেনে নিয়ে নৌকাটি অর্ধেক জলে ঠেলে দিয়ে নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখলাম নৌকায় স্থিরভাবে বসে আছে এমিলিয়া। আমার বিস্ময় দেখে সে মুখটিপে হাসছে, চেয়ে আছে আমার চোখে চোখ রেখে। চোখের নীরব ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে—আমি এখানেই রয়েছি, কিছু বলো না আমায়—আজ কোন কথা নয়।

তার অপ্রত্যাশিত আদেশ আমি পালন করলাম। মনে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো, নৌকায় উঠে ঘাড় নীচু করে দাঁড় টানতে লাগলাম। দশ মিনিটের মধ্যেই নৌকা এসে অন্তরীপে পৌঁছালো। আমি এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না।

দাঁড় টানতে টানতে বিচিত্র অভিনব আনন্দের সঙ্গে মেশানো বেদনার অনুভূতিতে দুচোখ বেয়ে ঝরতে লাগল অশ্রু।

অন্তরীপের অপরদিকে উজান স্রোত লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। ডানদিকে একটা নীচু কালো পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে জলের ওপর। বামদিকে অন্তরীপের পেছনে উঁচু পাথরের প্রাচীর। পাহাড়টি যেখানে ডুবে রয়েছে সেখানে জল সাদা, ভাঁটার টানে সামুদ্রিক শেওলার সবুজ জল দেখা যাচ্ছে। সমুদ্র বক্ষও নির্জন, শরণার্থীর ভিড় নেই। নৌকা নেই। উজ্জ্বল ঘন নীল জল দেখে মনে হয় গভীর। আরও দূরে অন্তরীপের সারি—কাল্পনিক রঙ্গমঞ্চের পার্শ্বদেশের মতো।

নৌকার গতি কমিয়ে এমিলিয়ার দিকে এলাম। আমার দিকে চেয়ে হাসি মুখে সে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কাঁদছো কেন ?

বললাম—'আনন্দের আতিশয্যে।' ভেবেছিলাম তুমি আমায় একা ফেলে চলে গিয়েছো।

চোখ নামিয়ে এমিলিয়া বললো—যাবোই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু বাগ্‌দত্তার সঙ্গে ষ্টিমার ঘাট পর্যন্ত এসে রয়ে গেলাম। শেষ মুহূর্তে ঠিক করলাম যাবো না।

বাগা বাড়ীতে টেলিফোন করে জানলাম, তুমি বেরিয়েছো। ভাবলাম এখানেই এসেছো, তাইতো এলাম। দেখলাম তুমি নৌকা আনতে বলছো। একটু রোদে শুয়েছিলাম। আমার পাশ দিয়ে চলে গেলে, দেখতে পেলে না আমায়। তারপর তুমি যখন পোশাক পাল্টাচ্ছিলে তখন আমি এসে বসলাম নৌকায়।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম—'বাগ্‌দত্তা সঙ্গে গেল না কেন ?'

—ভেবে দেখলাম ভুল করেছি। সম্পূর্ণ ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়—

—'কি দেখে বুঝলে ?

'তা ঠিক জানি না। হয়তো কাল সন্ধ্যায় তোমার গলার আওয়াজ শুনে—

—তবে কি তুমি সত্যই বুঝেছ আমার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ ভিত্তিহীন ? তুমি কি মনে করো না, আমি ঘৃণ্য ? বল—বল এমিলিয়া। এই কি তোমার শেষ কথা ?'

—ভেবেছিলাম তুমি কি একটা করেছিলে, আর তাই আমার শ্রদ্ধা হারিয়েছিলে। কিন্তু এখন জেনেছি সবই ভুলবোঝাবুঝি।

দুজনের মুখে আর কোন কথা নেই।

আমার দেহে যেন দ্বিগুণ শক্তি ফিরে এসেছে, মনে স্ফূর্তির সীমা নেই। জোরে দাঁড় বাইতে লাগলাম। উষ্ণতায় শিহরণ জাগলো সর্বাঙ্গে।

সবুজ গুহার বিপরীত দিকে এসে প্রশ্ন করলাম—'তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাস ?'

এমিলিয়া একটু ইতস্তত করে বললো—'চিরদিনই তোমায় ভালোবেসেছি,

ভালোবাসবো চিরকাল—

কিন্তু একী? তার মুখে বেদনার ছাপ কেন?

বললাম—'কথাগুলো অমন বিমর্ষভাবে বলছো কেন?

—'জানি না। হয়তো তার কারণ, যদি দুজনের মধ্যে এমন ভুল বোঝাবুঝি না হতো তাহলে ভালোবাসা আগের মতো থাকতো।

—হ্যাঁ, সে তো বুঝলাম। কিন্তু এখন তো আর ভুল বোঝাবুঝি নেই। ও কথা আর না ভাবাই উচিত। এখন থেকে অবিচ্ছেদ হবে আমাদের প্রেমবন্ধন, কি বল?

এমিলিয়া কেবল ঘাড় নেড়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিল।

দাঁড়টানা বন্ধ করলাম। আবছা অন্ধকারে দেখলাম নির্জন ডাঙা আছে সবুজ গুহার। সেখানে গিয়ে নতুন করে আরম্ভ করবো সেই পুরোনো জীবন, চালাবো বাধাহীন প্রেমলীলা।

এমিলিয়া লজ্জা মাখা মুখটা তুলে একবার তাকালো। ঘাড় নেড়ে জানালো নীরব সম্মতি। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে এমিলিয়া। চোখে আকুলতা, সে যেন আত্ম-নিবেদনের চরম মুহূর্তের অপেক্ষা করছে।

সবুজ গুহায় এসে নৌকাটা টেনে আনলাম ভেতরে। অন্ধকারের মধ্যে নৌকাটি আর দেখতে পেলাম না। দাঁড় ছেড়ে দিয়ে বললাম—তোমার হাতটা দাও, আমার হাত ধরে নেবে এসো—

কোন সাড়া পেলাম না।

ডাকলাম—এমিলিয়া, হাত ধর।

হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। অন্ধকারে হাতড়ে দেখলাম। কোথায় গেল এমিলিয়া? বুক কেঁপে উঠলো। এমিলিয়া! এমিলিয়া!

প্রতিধ্বনি শুনলাম। নৌকাটি স্থিরভাবে রয়েছে সৈকতের ওপর। বেশ অন্ধকার, ঝিরঝির করে জল ঝরছে ওপর থেকে। নৌকায় কেউ নেই। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও, কেবল আমি একা।

আকুল কণ্ঠে আবার ডাকলাম—এমিলিয়া, তুমি কোথায়?

তক্ষুণি আমার ভুল ভেঙে গেল। নৌকা থেকে নেমে ভিজে নুড়ির ওপর

মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়লাম। হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে নৌকা বেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে। ঘড়ি দেখলাম দুটো বাজে। প্রায় একঘণ্টারও বেশী সময় কাটিয়েছি গুহার মধ্যে।

বুঝলাম সেই মধ্যাহ্নে এক ছায়ামূর্তির সঙ্গে কথা বলেছি, তারই কাছে ফেলেছি নিষ্ফল অশ্রু।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ধীরে ধীরে নৌকা বেয়ে আসতে লাগলাম স্নানের ঘাটের দিকে। মাঝে মাঝে দাঁড় যেন বন্ধ করে দাঁড়টি হাতে নিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো চেয়ে রইলাম রৌদ্রদীপ্ত নীল সমুদ্রের শান্ত বুকের দিকে।

আমার যেন মতিভ্রম ঘটেছে। দুদিন আগেও এমন হয়েছিল। দেখেছিলাম এমিলিয়া রোদে শুয়ে আছে। আমি তাকে চুমু খাচ্ছি। কিন্তু সে ছিল আমার কাছ থেকে কিছুটা দূরে। আজকের এই ভ্রমটা আরও স্পষ্ট। না-না, এ শুধু ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

আলেয়ার সঙ্গে কথা বলেছি আমি, এমিলিয়াকে যা বলতে চেয়েছি তাই বলেছি তাকে। এমিলিয়ার কাছ থেকে যা শুনতে চেয়েছি, শুনেছি তাই। তাকে যেমন ভেবেছি—দেখেছি ঠিক তেমন ভাবেই। কিন্তু এখনও কাটেনি সেই মায়া ঘোর। ভাবতে লাগলাম এ সম্ভব কিনা।

ইন্দ্রিয় সম্ভোগ স্বপ্ন দেখে লোকে যেমন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, পুলকাবিষ্ট হয়ে সে কল্পনায় গরিমসি করে, ঠিক তেমনি আমার মনে হলো—এ মারা নয়, সত্য। মনের আনন্দে স্মরণ করলাম সে দৃশ্য। হোক সে আলেয়া, আমার কাছে এ ঘটনা সত্য।

অশ্রান্ত, অনাবিল, অনির্বচনীয় তৃপ্তি ভরে ভাবতে লাগলাম। এ যেন আমার মনের গোপন আকাঙ্খারই প্রতীক। স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব মনে হলো। গুহায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমি কি দেখেছিলাম, এমিলিয়ার প্রেতাত্মা এসেছে আমার কাছে, না স্বপ্ন দেখছিলাম?

বার বার একই চিন্তা মনে জাগতে লাগলো। আমি কি স্বপ্ন দেখেছি, না মায়ায় বিভ্রান্ত হয়েছি, না আলেয়া দেখেছি? না—এ রহস্য সন্ধান করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

অবিলম্বে বাড়ী ফেরার ইচ্ছা জাগলো। কেন জানিনা ভাবলাম, বাড়ী

গেলে এ রহস্যের সমাধান হবে ; ছটার ষ্টিমার ধরে ফিরতে হবে।

তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ী ফিরে এলাম।

নির্জন খাবার ঘরে এসে ঢুকেই টেবিলের ওপর একটি টেলিগ্রাম দেখতে পেলাম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও হলদে খামটা খুললাম। নীচে বাস্তিসতার নাম দেখে অবাক হয়ে গেলাম। টেলিগ্রামটি পড়লাম—দুর্ঘটনায় আহত এমিলিয়ার অবস্থা আশংকাজনক—বাস্তিসতা।

মাথায় নিমেষের মধ্যে রক্ত উঠে গেল।

সেদিন বিকেলেই নেপল্‌স-এ গিয়ে জানলাম মোটর দুর্ঘটনায় এমিলিয়া মারা গেছে। বিচিত্র তার মৃত্যু। বুকের ওপর চিবুক রেখে মাথা নীচু করে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাস্তিসতা যথারীতি গাড়ী চালাছিলেন। হঠাৎ একটা গরুর গাড়ী সামনে পড়লো, বাস্তিসতা খুব জোরে ব্রেক চাপলেন, ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে একবার ঝুঁকে পড়লো এমিলিয়া। গাড়োয়ানের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরে গাড়ী চালিয়ে দিলেন বাস্তিসতা। কিন্তু এমিলিয়া কোন কথা বললো না, বাস্তিসতার কথার কোন উত্তর দিল না।

গাড়ীটি বাঁক নিতেই এমিলিয়া বাস্তিসতার গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। গাড়ী থামিয়ে বাস্তিসতা দেখলেন দেহ নিষ্প্রাণ। হঠাৎ ব্রেক-এর চাপে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লেগে এমিলিয়ার মেরুদণ্ডের শিরা ছিঁড়ে যায়। ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এমিলিয়া।

অসহ্য গরম—শোক অত্যন্ত পীড়াদায়ক কারণ শোক চায়—মনে একাধিপত্য করতে, অন্য কোন ভাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চায় না।

দিনটা ছিল গুমোট। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে স্যাঁতসেঁতে থমথমে আবহাওয়া শেষ হলো এমিলিয়ায় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করলাম। আজ মনে হলো এ ঘরটি চিরকালের জন্যে অপ্রয়োজনীয়।

সত্যিই এমিলিয়া নেই, ও পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে গেছে সে, তাকে এ জীবনে আর খুঁজে পাবো না কোথাও। এতটুকু হাওয়া নেই বাইরে। তবু জানালাগুলি খুলে দিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগলাম।

নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি। দম বন্ধ হয়ে যাবে যেন।

পাশের বাড়ীর খোলা জানলা দিয়ে উজ্জ্বল আলো চোখে পড়লো। ঘরে ঘরে লোকজন ব্যস্ত ভাবে আনাগোনা করছে। আনন্দে মেতে রয়েছে। চঞ্চল

উম্মাদ হয়ে উঠলো আমার মন। কল্পনার চোখে ভেসে উঠলো একটি জগৎ। সেখানে লোকে ভুল না বুঝে শুধু ভালোবাসে, বিনিময়ে পায় ভালোবাসা, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও সুখময় জীবন যাপন করে, আর যে জগৎ থেকে আমি হয়েছি চির নির্বাসিত। আবার সে জগতে প্রবেশ করতে হলে চাই এমিলিয়ার জবাব, আমার নির্দোষিতা সম্বন্ধে অবিচল বিশ্বাস। আর চাই অলৌকিক প্রেম! সে প্রেম শুধু আমাদের প্রাণে জাগিয়ে তুললে চলবে না, জাগাতে হবে অপরের প্রাণেও—কিন্তু আর তা সম্ভব নয়।

ভাবলাম এমিলিয়ার মৃত্যু আমার প্রতি তার চরম শত্রুতারই নিদর্শন। আমি যেন উন্মাদ হয়ে যাবো—যে আর বাঁচতে পারবো না—

কিন্তু বেঁচে রইলাম। পরদিন আবার সুটকেশটি হাতে নিয়ে বাইরে এসে ঘরের দরজায় তালা লাগালাম। দারোয়ানের হাতে চাবিটি দিয়ে বললাম— কদিন পরে ঘুরে এসেই ঘরটি ছেড়ে দেবো।

আবার ক্যাপ্রিতে ফিরে এলাম। সেখানে এমিলিয়া আমার শেষ দেখা দিয়েছিল হয়তো সেখানে, কিংবা আরও কোথাও, আবার সে দেখা দেবে আমায়। তখন তাকে বলবো—কেন ঘটেছিল এত সব ঘটনা, আবার তাকে জানাবো আমার প্রেম, সে দেবে প্রেমের প্রতিশ্রুতি, ভালবাসবে আমায়।

জানতাম, আমার এ আকাঙ্খাও একটা উন্মাদনা ছাড়া আর কিছু নয়।

তবে হ্যাঁ, বাস্তব মায়ার প্রতি সমান আকর্ষণে এমন যুক্তিপূর্ণ উন্মাদনা আর জাগেনি কখনও।

নিদ্রায় বা জাগরণে এমিলিয়ার আর আমায় দেখা দেয়নি আর। কিন্তু সে যখন আমায় শেষবার দেখা যায়—সেই সময়ের সঙ্গে তার মৃত্যু-সময়ের কোন মিল ছিল না। যখন এমিলিয়াকে নৌকার উপর দেখেছিলাম তখনও সে বেঁচেছিল। যখন আমি মুর্ছিত হয়ে সৈকতের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম তখনই হয়তো সে মারা যায়। সুতরাং তার মৃত্যু ও জীবনে সত্যিকারের কোন সঙ্গতি ছিল না।

কখনও জানতে পারবো না, এমিলিয়া—আলেয়া, মায়া, স্বপ্ন, না আর কিছু। যে অনিশ্চয়তা জীবনে আমাদের সম্পর্ক বিষময় করে ছিল, এমিলিয়ার মৃত্যুর পরেও তা রয়ে গেছে

এমিলিয়াকে দেখবার আশঙ্কায় ও যেখানে তাকে শেষবার দেখেছি সে জায়গাগুলি দর্শনের আকুলতায় একদিন এলাম বাগানবাড়ীর নীচে সৈকত-

ভূমিতে—যেখানে তাকে নগ্ন অবস্থায় শায়িত দেখেছিলাম, চুম্বনের স্বপ্ন দেখেছিলাম।

নির্জন সমুদ্র তট। পাথরের স্তূপের ভেতর দিয়ে এসে চোখ তুলে চাইলাম হাস্যময় অনন্ত বিস্তার নীল সিন্ধুর দিকে।

মনে পড়ে গেল ওডিসির কথা, ইউলিসিস ও পেনিলোপের কথা। ইউলিসিস ও পেনিলোপের মত আমার এমিলিয়াও হয়তো চিরবিশ্রাম সুখ ভোগ করছে।

বিশাল জলধির বুকে লীন হয়ে গেছে, অনন্তকালের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে।

এমিলিয়াকে আবার খুঁজে নেওয়া ও নিশ্চিন্তে বসে তার সঙ্গে পার্থিব আলাপ-আলোচনা করা নির্ভর করছে আমারই ওপর, স্বপ্ন বা আলোর ওপর নয়।

আবার তার দেখা পেলেই তো সে মুক্তি পাবে আমার কাছ থেকে, চলে যেতে পারবে আমার উত্তেজনার সীমানা ছাড়িয়ে, সান্ত্বনা ও সৌন্দর্যের মূর্তির মত পলকহীন নেত্রে আমার মুখের দিকে চিরদিন চেয়ে থাকবে।

এক

সামনে টেলিভিসন সেট। মুখে একটা তৃপ্তির আমেজ ফুটিয়ে আরাম-কেদারায় ভারি দেহটা এলিয়ে দিতে দিতে শেরীফ রোজ তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে, আজ রাতের খাওয়াটা চমৎকার হয়েছে। সত্যি মেরী, তোমার হাতে রান্নাটা বেশ ভালই আসে দেখছি।

তোমার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি, ডাইনিং টেবিলের উপর থেকে পরিত্যক্ত ডিসগুলো সরাতে গিয়ে লজ্জানত সুরে মেরী বলে, আমি আর কি এমন ভাল রাঁধতে জানি, মা আমার থেকে অনেক ভাল রাঁধতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, খুব একটা খারাপ আমি রাঁধি না। এখানে একটু সময়ের জন্য থামল মেরী। বৃষ্টি ঝরা রাত, বাংলোর ছাদে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার রিমঝিম শব্দ শোনে সে কান পেতে।

আঃ কি মধুময় রাত, তাই না রোজ ?

তিপান্নটা বসন্ত পার করে আসা রোজের মাথায় বিরাট টাক পড়েছে, রোদে পোড়া গালের চামড়া ঈষৎ কুঁচকে গেছে। তবু সে তার প্রিয়তম স্ত্রীর কথায় সায় না দিয়ে থাকতে পারল না ·

কয়েকটা মাস নাগাড়। সময়টা খারাপ যাচ্ছে অফিসের ঝামেলায়, তোমার দিকে ভাল করে তাকাতেও পারিনি এক'দিন আমার যে কি দুঃখ— কথাটা অসমাপ্ত রেখে মুখে পাইপ সংযোগ করে সে তার স্ত্রীর পানে গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকাল। বছর ত্রিশ হল তাদের বিয়ে হয়েছে। তবু তার কাছে মেরী যেন আজও যুবতী সুন্দরী। কাঁধ ছুঁয়ে ঘন মেঘ-রঙা চুল অনেকটা নিচে নেমে গেছে, চোখের চাহনি আজও উজ্জ্বল, ভাস্বর। এই বয়সেও মেরীর আকর্ষণ তার কাছে বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং যতদিন যায় মনে হয় স্ত্রী যেন তার কাছে আরও মিষ্টি, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে দিনকে দিন। মেরীর মধ্যে কি যাদু আছে কে জানে। নিজের মনে প্রায়ই সে বলে থাকে, কি সৌভাগ্য তার যে দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে মেরীকে সে তার জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে পেয়ে যাচ্ছে। কথাটা ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চ জাগে তার মনে।

অতি সাধারণ জীবন ছিল রোজের শুরুতে। সামরিক পুলিশ ম্যান হওয়ার বাসনা নিয়ে স্কুল ছেড়ে আসে সে। আর তখনি যুদ্ধ থেমে যায়। অগত্যা তখন তাকে হাইওয়ে প্যাট্রেল অফিসারের চাকরীটা বেছে নিতে হয়। রিপোর্টিং মিয়ামি হেডকোয়াটার্স। সে ছিল সবার প্রিয় এবং বিশ্বাসী, তাই একদিন রক ভিলের শেরীফ পদে সবাই তাকে বরণ করে নেয়। উচ্চাভিলাষী তাকে বলা যায় না। রকভিলের শেরীফের পদটা পেয়ে তাকে গর্বিত বলে আদৌ মনে হয় না, তবে তারপক্ষে সেটা বেশ মানান সই। সব থেকে বড় কথা হল মেরীর খুব পছন্দ। ভাল দক্ষিণা, বিলাসবহুল জীবন, শেরীফের অফিস সংলগ্ন আরামদায়ক বাংলো।

ফ্লোরিডার উত্তরে রকভিল জায়গাটার বৈশিষ্ট্য হল কমলালেবুর চাষ। অবসরপ্রাপ্ত কৃষকদের বাস সেখানে, সংখ্যায় তারা খুব বেশী হলে শ' আষ্টেক হবে হয়ত। বাজার-হাট, ব্যাংক, গ্যারেজ, একটা ছোট চার্চ, একটা স্কুল কয়েকটা কাঠের বাংলো, সব মিলিয়ে একটা শান্ত পরিবেশের আমেজ সেখানে অনুভব করা যাও' অপরাধ একরকম নেই বললেই চলে। তবে ইদানীং হাইওয়ের উপর দক্ষিণগামী হিপীদের দাপটটা চোখে লাগার মতন। এ ছাড়া অন্য আর কোনো ঝামেলা তাকে পোহাতে হয় না। এই তার কাজ সর্ব-সাকুল্যে। একাই সে অনায়াসে মানিয়ে নিতে পারে। তাকে একজন সহকারী দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। তাই সহকারী হল টম ম্যাসন। ম্যাসন, বছর আঠাশ বছরের যুবক। সুন্দর পুরুসালি চেহারা। প্রতি সপ্তাহে একবার তারা মিলিত হয়, মেতে ওঠে দাবা খেলায়। অবশ্য তারা কেউই তেমন ভাল দাবাড়ু নয়।

আরাম করে পা দুটো ছড়িয়ে পাইপ টানতে টানতে কান পেতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা রোজ তন্ময় হয়ে। এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সে তখন আগামী কালের কথা ভাবতে বসে। জুড লসের বাগানে যেতে হবে তাকে। রকভিল থেকে মাইল পনের দূরে সেই বাগানটা। লসের ষোড়শী যুবতী মেয়ে নাকি ক্রমশঃ উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে আজকাল। এ অভিযোগ তার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মিস হ্যামরের। মেধাবী মেয়ে লিলি আজকাল অবাঞ্ছিত ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করছে। সে নাকি শহরের ক্যাসানোভাটেরী লেপের হোণ্ডা মোটর সাইকেলে চেপে রাস্তায় রাস্তায় আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। অন্য মেয়েরাও নাকি ছেলেটির একটু সঙ্গ পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।

মনে মনে হাসে রোজ। এ হোল যৌবনের ধর্ম, কেউ তাদের রুখতে পারবে না। যাই হোক, জুড লস তার প্রিয় বন্ধু তাকে সে অবশ্যই বোঝাবার চেষ্টা করবে।

ঠোঁট থেকে সবে সে পাইপটা নামিয়েছে, টেবিলফোনটা বেজে উঠল।

দূরভাষে এক পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, শোন জেফ, আমরা খুব অসুবিধায় পড়েছি।

হাই কার্ল, তা অসুবিধাটা কি শুনি ? হাইওয়ে প্যাট্রোলের প্রধান কার্ল জেনারকে জিজ্ঞেস করল রোজ।

খুব জরুরী তলব জেফ, প্রত্যুত্তরে কার্ল বলে, ফোনে বিস্তারিত ভাবে বলার সময় নেই। স্থানীয় সমস্ত শেরিফদের ডেকে পাঠাচ্ছি। আমাদের মাথায় এখন বাজ পড়ার মত অবস্থা। খুনি আসামী চেট লোগানকে এর্বোভলের লকি আপে আনা হচ্ছিল। সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তার সাথী দুজন পুলিশ অফিসার খুন হয়েছে। লোগান নিরুদ্দেশ। দারুণ বিপজ্জনক এই লোকটা। আমাদের অনুমান, সে হয়ত তোমাদের দিকেই যাচ্ছে, তাকে বাগে আনা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাই বলছি, তুমি তোমার ডিস্ট্রিক্টের প্রতিটি কৃষককে সতর্ক করে দাও এখুনি।

ঠিক আছে কার্ল, আমি এখুনি তাদের খবরটা দিয়ে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি। আর শোন, লোকটার চেহারার বিবরণ হল এই রকমঃ লম্বায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, বলিষ্ঠ গড়ন দেহের, সোনালী চুল কাঁধ ছুঁই ছুঁই বয়সের তেইশের কাছাকাছি। বাঁ হাতে কনুই-এর নিচে গোখরো সাপের উল্কি আঁকা। রেডিও এবং টেলিভিসনে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তার চেহারার বিবরণ দিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, পরনে নীল জিনস এবং বাদামী শার্ট, তবে তাকে অন্য পোষাকেও দেখা যেতে পারে। লোকটা দারুণ অসৎ। একটা গ্যাস স্টেশন লুট করার সময় তাকে গ্রেপ্তার করা. হয়। তাকে গ্রেপ্তার করার সময় একজন প্যাট্রল অফিসার কে ছুরির আঘাতে খুন করে সে। শুধু তাই নয়, গ্যাস স্টেশনের এক কর্মচারীকে ছুরিবিদ্ধ করেছে সে। লোকটা এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। প্যাট্রল অফিসারের মোটর সাইকেল নিয়ে ভেগেছে সে। তাহলে বুঝতেই পারছ, আমার এখন কি দুশ্চিন্তা। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর এই সময়—এদিকে মেরীও রান্নাঘরে তার সাহায্য চেয়ে বসে আছে। তা সত্ত্বেও রোজ তাকে আশ্বস্ত

করে বলে, ঠিক আছে কার্ল, আমি তোমার সাথে আছি।

তাহলে ভাল করে শোন রোজ, দুর্ঘটনাটা ঘটেছে লর্মাভলের মোড়ের মাথায়, তোমার বাংলো থেকে মাইল কুড়ি দূরে, দুঘণ্টা আগে লোগান পালিয়েছে। কৃষকদের সঙ্গে এখুনি যোগাযোগ কর জেফ—তারপরেই ফোনটা নামিয়ে রাখে কার্ল।

ফোনটা নামিয়ে রাখতেই মেরী তার কাছে এসে বলল, মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। তার আয়ত চোখে চিন্তার ছায়া পড়ে।

হ্যাঁ মেরী একজন খুনী আসামী আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। উত্তরে রোজ বলে, এখন একটু সময় আমি খুব ব্যস্ত থাকব। আমার অফিস-ঘরে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দিও, এই বলে সে তার বাংলো সংলগ্ন অফিস ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। প্রথমেই সে স্থানীয় কৃষকদের বাড়ির ঠিকানা এবং ফোন নম্বরের একটা তালিকা তৈরী করল। তারপর সে তার সহকারী টম ম্যাসনকে ফোন করলো। সেই সময় মেরী কফি নিয়ে অফিস ঘরে প্রবেশ করল।

তখন সবে সাড়ে ন'টা হলেও টম ম্যাসন তখন বিছানায়, তার শয্যা সঙ্গিনী ক্যারি স্মিথ, স্থানীয় ডাকঘর পরিচালনার ভার তার উপরে।

টম আর ক্যারির নিবিড় আলিঙ্গনে বাধ সাধল টেলিফোনের যান্ত্রিক আওয়াজটা। সেই মুহূর্তে ক্যারির নগ্ন দেহের উপরে টমের হাতের আঙুলগুলো পরিক্রমা স্তব্ধ হল। ফুটে উঠল বিরক্তির রেখা তার মুখের উপরে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে হাতটা সে বাড়িয়ে দিল টেলিফোনের দিকে। ফোনের আওয়াজটা তার কানে শেল্ হয়ে বিঁধতে থাকে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দেহটা ঈষৎ তুলে বিছানা সংলগ্ন টেবিলের উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিতেই তারের অপর প্রান্ত থেকে রোজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে কানে, শোন টম, আমাদের ভীষণ বিপদ, তাড়াতাড়ি চলে এস।

ততক্ষণ ক্যারি উঠে বসেছে। অন্য সময় হলে ক্যারির নগ্নদেহের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত টম, কিন্তু এখন তার অবসর কোথায়? বাইরের বেরোবার পোষাকে সে তার নগ্নদেহটা ঢাকতে ব্যস্ত তখন।

কি করছ তুমি? ককিয়ে ওঠার মত করে জিজ্ঞেস করল ক্যারি। জরুরী তলব! টম তার খাকী প্যাণ্টের জীপার টানতে গিয়ে উত্তর দেয়। আমাকে যেতেই হবে।

তুমি একটা আস্ত বোকা, ক্যারি তাকে বিদ্রুপ করে বলল, একটু আগে আমরা

কি করতে যাচ্ছিলাম, সে তোমার খেয়াল আছে ?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই মনে আছে, কিন্তু প্রিয়তমা, ওদিকে শেরীফের জরুরী তলব। আমাকে যেতেই হবে।

তাহলে আমি এখন কি করব ? চিন্তিত সুরে ক্যারি বলে, এই বৃষ্টি বাদলার রাতে বাড়ি যাই কি করে তা তো বলবে ?

সারারাত এখানে আয়নায় নিজের মুখ দেখে কাটিয়ে দিও, টম কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিমায় বলে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এছাড়া অন্য কোন পরামর্শ তোমাকে আমি দিতে পারছি না আপাততঃ, তারপর সে আর দাঁড়ায় না, নিচে নেমে গ্যারাজ থেকে গাড়ী বার করে।

মাত্র তিন মিনিটের পথ শেরীফের অফিসে আসতে। বাইরে তখনও বৃষ্টি। বর্ষাতিটা গা থেকে খুলে শেরীফ রোজের অফিস ঘরে ঢুকে টম দেখল, ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সে। তাকে দেখা মাত্র রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রোজ।

এমন সুন্দর একটা বর্ষণ মুখর রাত্রে বেরসিকের মত জরুরী তলব কিসের রোজ ? কথাটা শেরীফের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকে টম। সাবেকী ফ্যাশানের অফিস-ঘর শেরীফের। জাঁকজমকের কোন বালাই নেই।

একটু আগে জেনার খবর দিল, একজন খুনী আসামী না কি পলাতক। প্রত্যুত্তরে রোজ বলে, রকভিলের কাছে সেই আসামী গ্রেপ্তার এড়িয়ে কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে, সে কথা ভাবতে গিয়ে সেই হারিয়ে ফেলল রোজ, ভয়ংকর বিপজ্জনক সেই লোকটা। তার কালো হাতে দু'জন পুলিশ অফিসার খুন হয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে, শুধু তাই নয়, গ্যাস স্টেশনের একজন কর্মচারীকেও রেহাই দেয়নি সে। তাকেও সে খুন করেছে। তাহলে বুঝতেই পারছ, কি ভয়ঙ্কর লোক সে। যাই হোক, তোমাকে যে কাজের জন্য ডেকে পাঠিয়েছি সেটা আগে বলে নিই।

এখানকার প্রতিটি কৃষকের নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বরের একটা তালিকা আমি তৈরী করে রেখেছি। তাদের ফোন করে সতর্ক করে দাও। এই বলে টমের হাতে একটা কাগজ তুলে দেয় শেরীফ রোজ।

ডেপুটি শেরীফ হওয়ার পর এই প্রথম এমন একটা আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা শুনল টম। ক্যারি স্মিথের কথা ভুলে গিয়ে ফোন করতে বসল

কৃষকদের এক এক করে। খবরটা শুনে তারা তো বেশ কৌতুক বোধ করল। তারা ঘটনার আরো বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইল। শেষ পর্যন্ত টমের দাবড়ানীতে তারা ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করল।

তার মানে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকব? একজন কৃষক হো-হো করে হেসে উঠে বলে, এই বৃষ্টি বাদলের দিনে কে-ই বা এখন বাড়ির বাইরে যেতে চায়?

যাই হোক, তোমাদের পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তোমাদেরই করতে হবে, টম ধমকে উঠে বলে, তোমাদের যে যার বন্দুক রেডী রাখ, যে কোন মুহূর্তে খুনী হানা দিতে পারে তোমাদের বাড়িতে। খুনীর চেহারার বিবরণ একটু পরে টি-ভি এবং রেডিওর প্রচার করা হবে। এই লোকটা পেশাদার খুনী, বুঝলে?

সব বুঝলাম, কিন্তু আমাদের পুলিশ কি করছে? সেই কৃষক এবার একটু রুক্ষস্বরেই বলে, তারা কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে?

পুলিশ তার কর্তব্য ঠিক করে যাচ্ছে, কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে টম বলে, নাগরিক হিসেবে তোমাদের দায়িত্বও কম নয়। নিজেদের ভাল—মন্দ বোঝার মত বুদ্ধি-নিশ্চয়ই তোমাদের আছে বলে আমার বিশ্বাস। এরপর আমার আর কিছু বলার নেই, এই বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল টম।

ঘণ্টা খানেক পরে জুডলসের নম্বর ডায়াল করল রোজ। রকভিলের কাছেই লসের খামার।

টম তার তালিকা অনুযায়ী প্রতিটি খামারে ফোন করল। তবে তাকে কেমন যেন নিরুৎসাহ দেখাচ্ছিল। আশ্চর্য কোন কৃষকই ব্যাপারটা য় তেমন গুরুত্ব দিতে চাইল না বলেই তাকে অমন হতাশ দেখাচ্ছিল। এত বড় একটা খুনের কেস, অথচ তারা কেমন যেন উদাসীন এ ব্যাপারে। শুধু তাই নয়, হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে সমস্ত ব্যাপারটাকে তারা যেন হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, হাল্কাভাবে নিতে চায়। তারা যেন তাকে কোন গুরুত্বই দিতে চায় না।

জুডলসের কোন উত্তর নেই, টমের উদ্দেশ্যে রোজ বলে। টমের মুখটা কঠিন দেখায়, দেখ গিয়ে বোধ হয় বিছানায় গড়া গড়ি খাচ্ছে।

হতে পারে, খালি রিং হয়ে যাচ্ছে, হয়ত বিছানা থেকে উঠতে চাইছে না সে। রোজ ফিরে এসে আবার ডায়াল করল, এবারেও কোন সাড়া শব্দ নেই।

দুটি মানুষ পরস্পরের দিকে তাকায়।

জেরিস কিংবা লিলি কেউ একজন অন্তত রিসিভারটা তুলবে তো? রোজ বিরক্ত হয়ে শেষে রিসিভারটা ক্রেডেলের উপর নামিয়ে রাখল।

ওদিকে শেরীফের সেই ছোট্ট অফিস-ঘরে উত্তেজনা জমাট বাঁধতে থাকে।

ঠিক আছে, আমার তো এখন কোন কাজ নেই, টম তার বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে বাইরে বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বলে, বরং তার বাড়িতে গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সে?

আমাদের আশংকা যদি সত্যি হয় তাহলে হয়ত তারা কোন বিপদে পড়ে থাকবে, রোজ তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, সাবধানে পথ চল টম, বৃষ্টি বাদলার রাতে পথ বড় পিচ্ছিল।

পথের ভাবনায় কাবু হওয়ার বান্দা নয় টম। সে তখন ভাবছিল খুনি হয়ত জুডলসের খামার বাড়ির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে সুযোগের জন্য, পয়েণ্ট থার্টি এইট পুলিশ স্পেশ্যালটা ঠিক জায়গায় আছে কিনা দেখে নিতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল রোজ তাকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে।

জেনারকে আমি সতর্ক করে দেব, রোজ বলে, তার লোক বলও প্রচণ্ড। আমার যতদূর মনে হয়, জুড একা নয়, তা ছাড়া তার সঙ্গীয় সংখ্যা যেন অনেক বেশী হয়ে গেছে।

জোর করে হাসার চেষ্টা করল টম। মনে হয় জোরে টিভি চলছে সেখানে, তাই ফোনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না। দেখি গিয়ে ব্যাপারটা কি। চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় টম, রেডিও মারফত যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।

প্রায় ষাট একর চাষের জমির উপর হাল ফ্যাশনের খামারবাড়ি জুড লসের। বাড়িটা বাংলো প্যাটার্নের। তিনজন নিগ্র তার স্থায়ী কর্মচারী। জুড লসের বাংলোর কাছাকাছি তাদের ডেরা। কমলালেবুর মরশুমের সময় প্রায় কুড়িজন নিগ্রোকে কাজে লাগিয়ে থাকে সে। তিনজন স্থায়ী নিগ্রো কর্মচারী জুডের সঙ্গে প্রায় দশ বছর হল কাজ করছে। তার বাংলোয় কোন জরুরী অবস্থা দেখা দিলে তাদের সাহায্যের আশ্বাস করতে পারে সে।

টম তার ফোর্ড গাড়ীর স্টিয়ারিং—এ হাত রেখে ভাবছিল এইসব কথা। খুব একটা বেশিদূর তখনো যায়নি। রেডিওর সুইচটা খুলে দিল সে।

শেরীফ ? আমি ম্যাসন কথা বলছি। আমি এখন জুড-এর খামারের দিকে এগিয়ে চলেছি, কাদায় চাকা বসে যাচ্ছে জায়গায় জায়গায়।

লসের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, রোজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, এখনো কোন উত্তর নেই। সাবধানে এগিও।

হ্যাঁ, গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে এগোচ্ছি, টম বলে, দূরে জুড-র বাংলো দেখতে পাচ্ছি, ঘরের আলো বাইরে চুইয়ে পড়েছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ভাবছি গাড়িটা রেখে দিয়ে পায়ে হেঁটেই জুডের বাংলোয় যাব।

তাই কর টম। হ্যাঁ ভাল কথা, জেনার বলছিল, আধ-ঘণ্টার মধ্যে একটা প্যাট্রল করে ওখান দিয়ে যাবে, সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তবে খুব সাবধানে পা ফেলবে, বুঝেছ ?

হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ীর মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকে টম। তার দৃষ্টি তখন জুডের বাংলোয়। এখানকার প্রতিটি বাংলো তার নখদর্পণে। একমাত্র বসার ঘরে আলো জ্বলছে। শয়নকক্ষের পাশেই লিলির ঘর, সেই দুটি ঘরই অন্ধকারে ডুবে আছে।

এক সময় বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল সে। ধীরে ধীরে মেঠো পথ ধরে সেই বাংলোর দিকে এগিয়ে যায় টম। জোরে নিশ্বাস নিতে গিয়ে তার বুক কাঁপে। বাংলোর দিকে যেতে গিয়ে টেলিফোনের মৃদু আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে বাংলোর বসার ঘর থেকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে সে বড় নিঃসঙ্গ বলে মনে করল। ডেপুটি শেরীফের পদে বছর তিনেক হল বহাল হয়েছে সে। এতদিন কোন ঝামেলা ছিল না। এমন কি হাইওয়ের হিপীরাও তার কাছে তেমন কোন একটা সমস্যা বলেই মনে হয় নি। কিন্তু আজ, এই রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জুড লসের বাংলোর বসার ঘর থেকে টেলিফোনের ক্রমাগত আওয়াজ শুনতে শুনতে হঠাৎ কেমন যেন সে দুর্বল হয়ে পড়ে, ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার সারা দেহ-মন। এরকম ভয় সে আগে কখনো পায়নি। একটু একটু করে সে যেন তার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে, মনে হচ্ছে সে যেন তার চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, তার হাটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। দ্রুত হৃদস্পন্দনে তার পাল্সের গতি ক্রমশঃই বাড়ছে।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে টম বৃষ্টির শব্দ শোনে, সেই সঙ্গে তার কানে ভেসে আসে টেলিফোনের যান্ত্রিক শব্দ। শব্দটা তার বুকে ভয়ে তুফান তোলে। আচ্ছা,

সেই ভয়ংকর খুনী লোকটা কি এখনও বাংলোয় ওঁৎ পেতে আছে তার জন্য ? রোজ বলেছে জেনারের দু'জন লোক এদিকেই আসছে। তাদের আসা পর্যন্ত গিয়ে গাড়ীর মধ্যে চুপচাপ বসে থাকাটাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবল টম।

গাড়ীতে ফিরে চলেছে টম, ঠিক সেই সময় জুড-এর বাংলো থেকে টেলিফোনের সেই বুক কাঁপান শব্দটা আর একবার তার বুকে শেল বেঁধার মত বিঁধল যেন। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল সে। ভয় কিসের ? সেনা ডেপুটি শেরীফ ? সে যাবে বাংলোয়। এমনও তো হতে পারে, সেই খুনীকে সে গ্রেপ্তার করতে পারে। তাছাড়া কাপুরুষের মত ভয়ে পিছিয়ে আসার পাত্র সে নয়। হাতে বন্দুক, নূতন উদ্যমে সব ভয়, জড়তা কাটিয়ে উঠে সেই বাংলোর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে টম।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে সেই বাংলোর কাছাকাছি এসে থামল সে। বসার ঘরে জানলায় আলোর ছটাটা এখন অনেক স্পষ্ট এবং টেলিফোনের আওয়াজটা এবার তার কানে আরও বেশি করে বাজতে থাকল। অন্ধকারে একটা গাছের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে সে জানতে পারল না সেই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন লোক তার উপর নজর রাখছে।

এখানে আমার পর থেকে ভয়ে কিনা কে জানে তার পেটের ভিতর থেকে থেকে যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল, বাংলোর কাছে এসে পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল। তবু সেই অবস্থায় বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল সে। প্যান্টের বেল্টে ঝোলান শক্তিশালী টর্চটা টেনে নিয়ে বাংলোর প্রবেশ পথ লক্ষ্য করে সুইচ টিপল টম। সেই আলোয় সে দেখে দরজাটা আধভেজান। তার মানে দরজাটা খোলা ? ভয়ে আতঙ্কে উঠে দু'বার পিছিয়ে আসে। অন্ধকারে চারিদিক লক্ষ্য করে সে। ওদিকে তখনও বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেলিফোনটা ক্রমাগত বেজেই যাচ্ছিল। এখন তার ঈশ্বরের কাছে কেবল একটাই প্রার্থনা 'হে ঈশ্বর, ফোনের আওয়াজটা এখুনি বন্ধ করে দাও।'

চোরা দৃষ্টি নিয়ে তাকায় সে লবির দিকে, বসার ঘরের আলোয় আলোকিত জায়গাটা। সামনেই খাড়াই সিঁড়ি—লিলির শয়নকক্ষে যাওয়ার সেতু বন্ধন।

নিচু গলায় তাড়াতাড়ি চিৎকার করে উঠল সে, শুনছ, কেউ বাড়িতে আছ ? হাতের টর্চটা জেবলে অপেক্ষা করে উত্তরের আশায়। কোন সাড়া শব্দ নেই।

অবশেষে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে চলল সে। এ বাড়ির প্রতিটি ঘর তার চেনা। কাছে গিয়ে দরজায় উঁকি মারতেই টমের বুকটা কেঁপে ওঠে, রিভলবারটা আর একটু হলে পড়ে যেত।

খোলা জানলায় ডোরিসের বড় মাপের দেহটা ঝুলে থাকতে দেখা যায়, মাথায় চাপ চাপ রক্ত। পিছনে বড় শোফর নিচে একজোড়া বুট চোখে পড়ল। চমকে উঠল সে। কি আশ্চর্য। এ বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাকে। ডোরিসের মৃতদেহ দেখার পরই জুড লসের মৃতদেহ দেখে শিউরে ওঠে সে। জুডের ক্ষতস্থানে রক্ত জমে কালচে হয়ে গেছে। সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে গা গুলিয়ে ওঠার উপক্রম হল টমের। কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয় সে।

এরকম ভয়াবহ দৃশ্য সে এর আগে কখনও দেখেনি। তার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। প্রথমে জুডলসের মৃত দেহের দিকে ভাল করে তাকাল সে, তারপর ডোরিসের দিকে দৃষ্টি ফেরাল। তাদের মাথায় কঠিন আঘাত দেখে টম নিশ্চিত জেনে গেছে, তাদের দেহে প্রাণের কোন চিহ্ন থাকার কথা নয়। সেই মুহূর্তে সে তার কর্তব্য স্থির করে নেয়

লবিতে ফিরে এল এস্ত পায়ে।

লিলি

কে জানে সে ভাগ্যবতী কিনা? এমন বীভৎস ঘটনা ঘটার সময় সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া এমন বৃষ্টিবাদলার রাতে রকভিলের দিকে যাবে কিনা? তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একরকম ছুটেই সেই খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসে টম।

সিঁড়ি সংলগ্ন শয়ন কক্ষ, দরজা খোলাই ছিল।

লিলি! টমের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে ভয়ে, কে জানে আবার কি দৃশ্যের মুখোমুখি তাকে হতে হয়!

বৃষ্টির শব্দে তার কণ্ঠ স্বর চাপা পড়ে যায়

লিলি লসের মুখটা তার মনে পড়ে যায়। রকভিলের সব থেকে সুন্দরী মেয়ে সে। এক এক সময় ওর কথা সে গভীর ভাবে চিন্তা করতে গিয়ে কেমন তন্ময় হয়ে যায়, এ তার দুর্বলতা কিনা বুঝতে পারে না সে। তার এই মনোভাবের কথা লিলির অজানা নয়। বয়স ওর কতই বা হবে? চৌদ্দ কি

পনের, তবে ষোলর বেশি নয়। কিন্তু বয়সের তুলনায় ওকে খুব বাচ্চা মেয়ে বলেই মনে হয়। সে যাই হোক টেরি লেপ-এর সঙ্গে মেলামেশায় ওর সেই বয়সটা কোন বাধা হয়ে ওঠে না। টম আবার এও জানে, তার অঙ্গুলি হেলনে কিংবা চোখের ঈশারায় অনায়াসে লিলি তার শয্যা-সঙ্গিনী হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। ক্যারি স্মিথ তো তার শয্যায় সব সময় ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। কিন্তু তার লক্ষ্য লিলি, আরও কয়েক বছর যাক, পুরোপুরি যুবতী হয়ে উঠলেই হেলাবে ওর দিকে, মনে মনে এমনি একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিল টম। কিন্তু এই মুহূর্তে লিলির শয়ন কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, তার সারা দেহের উপর দিয়ে বুঝি একটা শীতল হাওয়া বয়ে গেল, টান টান শিরদাঁড়া, ঝাপসা চোখ, অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট নয় তখনও।

লিলি! এবার সে গলার স্বর চড়াল। এবারেও কোন উত্তর নেই। শেষে সে মরিয়া হয়ে ঘরে ঢুকে অন্ধকারে দেওয়াল হাতড়ে আলোর সুইচটা টিপল। আর ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠল সে সামনে হিংস্র জানোয়ার দেখার মত। বিছানার উপরে লিলির রক্তাক্ত দেহটা পড়ে আছে। মাথার চুলে চাপচাপ রক্ত মাখা। ওর রাতের হ্রস্ব পোষাক উপরে উঠে গেছে অনেকখানি। সুন্দর সুডৌল পা দুটো উন্মুক্ত। দুই উরুর সন্ধি স্থলে রক্তের দাগ, মনে হয় খুন করার আগে খুনী ওর ওপরে দৈহিক অত্যাচার চালিয়ে থাকবে। বীভৎস খুন। লিলি ওর মা—বাবার মতই নিষ্ঠুর ভাবে খুন হয়েছে।

ওদিকে বসার ঘরে টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থাকে সে অনেকক্ষণ। এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ছুটে যায় সে বসার ঘরে এবং রিসিভারটা দ্রুত তুলে নেয় ক্রেডেলের উপর থেকে।

টম, তুমি কথা বলছ তো? রোজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে।

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। অনেক চেষ্টা করল সে কথা বলার জন্য। ভিতর ভিতর বমির ভাব। কোন রকমে সামলে নিয়ে ক্ষীণ গলায় সে বলে, আমি টম কথা বলছি। কোন রকমে বলার চেষ্টা করে মাথা ঘুরে মেঝের উপরে পড়ে যায় সে টাল সামলাতে না পেরে।

ও দিকে রোজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরাভাষে হ্যালো টম, তুমি কি কোন বিপদে পড়েছ?

বাঁকা দেহে কিছু বলার চেষ্টা করে টম, কিন্তু পারে না। তার চোখ বুজে আসে। বাইরে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ, দূরে ভাবে রোজের ঘন ঘন চিৎকার হঠাৎ পিছনে শব্দ হতেই ভয়ার্ত চোখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে গিয়ে সে তার মাথার স্টেটসন টুপির উপর থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেল। তার অচেতন দেহটা মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়তেই হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ল।

বড় সাইজের একটা প্যাট্রলকার তার আরোহী সার্জেণ্ট হ্যাংক হোলিস এবং প্যাট্রল অফিসার জেরী ডেভিস। গাড়ী চালাচ্ছিল হোলিস। ফ্লোরিডা হাইওয়ে প্যাট্রেলের প্রতিটি গাড়ীর সাহায্যে পলাতক খুনী চেট লোগানকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

পঁচিশ বছরের যুবক জেরী খুব আয়েস করে তার স্ত্রী তৈরী মুরগীর রোস্ট দিয়ে নৈশভোজ সারছিল, তখনি সার্জেণ্ট হোলিসকে তার বাংলার বাইরে হাজির হতে দেখা যায়। মিনিট পাঁচেক পরে ডেভিসকে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় বাইরে বৃষ্টির অবিরাম ধারা বয়ে চলেছে।

জুডলসের খামারে কুইক গাড়ী স্টার্ট দিতে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, জুডলসের বাড়িটা কোথায় তুমি জান? মনে হয় খুনী সেখানে আশ্রয় নিতে গেছে। টম ম্যাসন তদন্ত করতে গেছে সেখানে। সে আমাদের সাহায্য চায়।

এই সহকারী শেরীফ আমাদের সাহায্য ছাড়া কি এক পাও নড়তে চায় না? ডেভিস বিরক্ত হয়ে বলল, ধর, সেখানে দেখি খুনীর কোন চিহ্ন নেই। গড্ডাম্যান শেরীফের জন্য এই বৃষ্টির দিনে জেরি, তুমি থামবে? এটা একটা কর্তব্য, হোলিস তাকে ধমক দিয়ে বলে, জরুরী প্রয়োজন হলে সে যত বর্ষাই হোক, পুলিশের লোকদের বেরোতেই হবে। যে ভাবেই হোক এই ভয়ংকর খুনী লোগানকে আমাদের ধরতেই হবে।

পথ এমনিতে ভয়ংকর তার ওপর বৃষ্টি হওয়ার দরুণ গাড়ীর চাকাগুলো প্রায়ই পিছলে যাচ্ছিল স্পীড তোলার সময় তাই খুব সাবধানে আস্তে আস্তে গাড়ী চালাতে হচ্ছিল হোলিসকে। একটু অসাবধান হলেই যে কোন দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে তাকে।

জুডলসের বাংলো কাছাকাছি এসে তাদের গাড়ীর পুলিশ রেডিও জরুরী বার্তা ভেসে আসে হেডকোয়ার্টার থেকে খবরটা প্রচার করা হচ্ছিল, দশ নম্বর গাড়ী, শোন দশ নম্বর গাড়ী হোলিস এবং ডেভিস দুজনেই সতর্ক হল।

হ্যাঁ, দশ নম্বর গাড়ী থেকে কথা বলছি, ডেভিস সাড়া দিয়ে বলে,- কি ব্যাপার?

রকভিলের শেরীফ রোজের রিপোর্ট হল, মনে হয় লসের খামারে কোন অঘটন কিছু ঘটেছে। ম্যাসন এখন সেখানেই আছে। তার কাছ থেকে পাওয়া শেষ খবরে জানা যায়, লসের খামার-বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সে। তারপর তার রেডিওর আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। টেলিফোনে জানা যায়, কোন এক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে থাকবে সে। দুটো প্যাট্রল কার তোমাদের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। খুব সাবধানে এগোবে। দারুণ বিপজ্জনক এই লোগান।

ডেভিস হোলস্টার থেকে তার পিস্তলটা বার করে হোলিসের দিকে তাকিয়ে বলে, হয়তো শয়তানটা সেখানেই আছে।

সুযোগ পেয়ে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দেয় হোলিস। কিছু ক্ষণের মধ্যেই তাদের গাড়ীটা পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। এক সময় ম্যাসনের ফোড গাড়ীর পাশে তাদের গাড়ীটা গিয়ে দাঁড়াল।

ডেভিস ট্রান্সমিটারের সুইচ টিপে খবর দেয়, দশ নম্বর কার পেঁছে গেছে নির্দিষ্ট জায়গায়। জুডলসের খামার—বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। ঘরে আলো জ্বলছে। আমাদের পাশেই ম্যাসনের গাড়ী। কিন্তু ম্যাসনকে গাড়ীতে দেখা যাচ্ছে না। আমরা খুঁজে দেখছি। আপাততঃ খবর এখানেই শেষ।

বৃষ্টি মাথায় করে তারা দুজন গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ায়। আমিই প্রথমে যাব, হোলিস তার পিস্তল সামনের দিকে উঁচিয়ে বলে, আমাকে দু'মিনিট সময় দিও, তারপর আমাকে অনুসরণ করো। তুমি বরং বাড়ির পিছন দিকে ঘুরে দেখ ততক্ষণ। লোগান যদি এখানে থাকে এবং তাড়া খেয়ে যদি পিছন দিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, খুব সাবধানে তাকে ধরার চেষ্টা করবে, মনে রেখ, লোকটা ভীষণ বিপজ্জনক। কোন সুযোগ তাকে দিও না—

কিন্তু সে সেখানে আছে বলে তো আমার মনে হয় না, ডেভিস মন্তব্য করে, যাইহোক সার্জেন্ট, তুমি লক্ষ্য রেখ। বাংলোর প্রবেশ পথে পেঁছে বৃষ্টি পড়ার শব্দ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ কানে এল না হোলিসের। সার্জেন্টের পদে উন্নীত হওয়ার সময় তাকে বহুবার বিপজ্জনক পরিস্থিতি মুখোমুখি হতে হয়েছে। দৃঢ় প্রত্যয়ের লোক সে। কিন্তু সেই লোক আজ জেনে গেছে, এই বাংলায় লোগান যদি একান্তই থেকে থাকে, তাহলে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, এখানেই তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি রচিত হবে।

হাতে উদ্যত পিস্তল, গতি শ্লথ, আলোকিত লবিতে এক সময় প্রবেশ করে হোলিস। তারপর সেখান থেকে বসবার ঘরে। পিটপিট করে তাকাতে গিয়ে প্রথমেই তার নজরে পড়ল টম ম্যাসনের মৃতদেহ। সেই মুহূর্তে হোলিসের পা দুটোকে যেন পেরেক দিয়ে মেঝের সঙ্গে এঁটে দিল। ম্যাসনের মৃতদেহের উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে সেই মুহূর্তে অনেক সম্ভাবনার কথাই তার মনে পড়ছে। স্টেটসন টুপি ব্যবহার করা উচিত ছিল টমের। কিন্তু তার চিহ্ন চোখে পড়ে না, এমন কি বর্ষাতি কিংবা গান-বেল্ট ও চোখে পড়ল না। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল হোলিস, লোগান যদি এখানে এসে থাকে, কিংবা এখনো এখানে থেকে থাকে, তাহলে সে নিশ্চয়ই টমের স্টেটসন টুপি, বর্ষাতি এবং রিভলবারটা ছিনিয়ে নিয়ে থাকবে। আচ্ছা সীতা কি সে এখনও এই বাংলোয় আছে ? লোগানের হাতে এখন পয়েন্ট থার্টি-এইট রিভলবার এবং কার্টিজ-বেল্ট।

কথাটা মনে হতেই সে দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। চারিদিকে ভাল করে তাকাতে গিয়ে জুড এবং ডোরিসলসের মৃত দেহ দুটির তার চোখে পড়ল। তারপর সেখান থেকে শয়ন কক্ষ ও রান্নাঘর পরিক্রমা করে অবশেষে লিলির কক্ষে গিয়ে ঢুকল। হয়ত লোগান সেখানে থাকতে পারে। কালো শ্লেটের মত অন্ধকার ঘর। অন্ধকারে হাতড়ে স্যুইচ টিপতেই ঘরটা আলোয় আলোকিত হবে ওঠে, আর সেই আলোয় লিলির মৃতদেহ মেঝের উপরে পড়ে থাকতে দেখে শিউরে উঠল। সেই সঙ্গে সে আবার এ কথাও ভাবল, এখানে লোগানকে আর খোঁজার কোন অর্থ হয় না। তার এখানকার কাজ শেষ। এ বাড়ির কাউকে সে জীবিত অবস্থায় রেখে যায়নি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল সে। এই মুহূর্তে ডেভিসকে তার খুব প্রয়োজন। তা বাংলোর পিছনেই ডেভিসের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

শোন ডেভিস, বাংলোর ভিতরে একটার পর একটা অঘটন ঘটে গেছে, হোলিস বলে, আমি ঠিক বলছি কিনা তা তুমি নিজের চোখেই দেখবে চল।

তারা দুজন একসঙ্গে এবার বসার ঘরে প্রবেশ করল। জুড এবং ডোরিসের মৃতদেহ দুটি ডেভিস যখন পরীক্ষা করে দেখছিল তখন হোলিসটমের ভাল করে দেখতে গিয়ে তার চোখ দুটো চিক্ চিক্ করে উঠল, তার মুখের উপর থেকে একটু আগের সেই চিন্তার ছাপটা বুঝি মিলিয়ে গেল শূন্যে।

টম এখনও বেঁচে আছে, উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল হোলিস।

কিন্তু এরা দুজন মৃত্যুর সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে বসে আছে, ডেভিস তার অনুসন্ধানের ফলাফল ঘোষণা করে সামনে গিয়ে দাঁড়াল, অন্য দুজনের মত টমের মাথায়ও কোন ভারি জিনিস দিয়ে আঘাত করে থাকবে সেই খুনী।

বেচারী লিলিকেও রেহাই দেয়নি সে। হোলিস সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে: চল, লিলির শয়ন কক্ষে সেই চিরকালের ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখে আসবে চল। একটু থেমে সে আবার বলে, কিন্তু সবার আগে আমাদের সাহায্য চাই। ফোন কর।

মেঝের উপর থেকে রিসিভারটা টেনে নিয়ে ডেভিস, পরক্ষনেই তার মুখে বিরক্তির ছায়া ফুটে উঠতে দেখা যায়। টেলিফোনের তারটা কাটা।

শয়তানটা দারুণ স্মার্ট দেখছি।

তা তো হবেই, তেমনি বিরক্ত হয়ে হোলিস বলে: তা না হলে ম্যাসনের স্টেটসনটুপি, বর্ষাতি এবং পিস্তলটা নিয়ে যায়? ঐ শোন সেই মুহূর্তে তারা দুজন কান পাতল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে তারা গাড়ীর ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ শুনতে পেল।

ঐ পালাচ্ছে সে। চিৎকার করে ওঠে হোলিস।

অতঃপর তারা দুজন জল-কাদায় ছুটতে শুরু করল গাড়ীর যান্ত্রিক আওয়াজটা অনুসরন করে। কিন্তু একটু পরেই সেই শব্দটা মিলিয়ে গেল, তাদের ছোটাই শুধু সার হল। ফিরে এসে তারা দেখে টম ম্যাসনের গাড়ীটা সেখানেই নেই।

হোলিস তার কর্তব্য ঠিক করে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। ডেভিসকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গাড়ীতে উঠে বসে বলে? রেডিও মারফত জেনারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে সতর্ক করে দাও। তারপর আমরা তাকে অনুসরণ করব। খুব বেশীদূর যেতে পারে নি সে এখনও। আশা করি আমরা তাকে আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে যাব।

এদিকে ইগনিসন সুইচ অন করতে গিয়ে হোলিস দেখে সেটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ডেভিস তখন রেডিওর বোতাম টিপে দেখে আলোর কোন চিহ্ন নেই।

রেডিওটা নষ্ট করে রেখে গেছে সে, ডেভিস মাথায় হাত দিয়ে বসে। এখন উপায়?

হোলিস তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে তার হাতের ফ্ল্যাশ-লাইটের সাহায্যে

গাড়ীর ইঞ্জিন পরীক্ষা করে বলে ওঠে, ডিস্ট্রিবিউটার হেডটাও খুলে নিয়ে গেছে সে।

যেভাবেই হোক, কাছাকাছি কোন টেলিফোন বুথ থেকে হেড কোয়ার্টারে ফোন আমাদের করতেই হবে, ডেভিস উত্তেজিত হয়ে বলে, লসের নিশ্চয়ই গাড়ী আছে ?

হ্যাঁ জেরী, তুমি যাও, আমি এদিকে ম্যাসনকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছি। ফ্র্যাংকলিন বলেছে ? দুটো প্যাট্রল কার নাকি এদিকে এগিয়ে আসছে, জানি না কতক্ষণে এসে পেঁছিবে।

লসের গাড়ীর সন্ধানে ডেভিস চলে যাওয়ার পর বাংলোয় ফিরে এল হোলিস। হাঁটু মুড়ে ম্যাসনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হোলিস দেখে, সে তখন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

পালিয়েছে সে। কোন রকমে প্রশ্নটা করেই সে আবার জ্ঞান হারায়।

হোলিস তাড়াতাড়ি সোফা থেকে একটা বালিস টেনে নিয়ে ম্যাসনের মাথার নিচে গুঁজে দেয়। তারপর সে লরিতে এসে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় স্যাঁতসেতে অন্ধকারে। কয়েকমিনিট অপেক্ষা করার পর সে দেখতে পায় ডেভিস তার দিকেই ছুটে আসছে।

লসের গাড়ী এবং ট্রাক দু'টোই অকেজো হয়ে পড়ে আছে গ্র্যারাজে। লরির ভিতরে ঢুকতে গিয়ে ডেভিস মন্তব্য করে, এ সবই ঐ শয়তানটার কাজ সার্জেন্ট—

হোলিস তাকে সমর্থন করল, ফ্র্যাংকলিন বলেছে দুটো প্যাট্রল কার এদিকে এগিয়ে আসছে। অতএব আমাদের এখন একটু অপেক্ষা করতেই হবে।

আর সেই ফাঁকে শুয়োরের বাচ্চা আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে, তার মানে এই তো ?

না, খুব বেশিদূরে সে যেতে পারবে না, বসার ঘরে গিয়ে হোলিস তার বর্ষাতিটা হাতে তুলে নেয়, আমরা তার সন্ধান ঠিক পাবই। তারপর সে ম্যাসনের দিকে তাকিয়ে বলে, বেচারীর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার। অবস্থা খারাপ।

ধর, ওদের মত সে-ও খতম হতে যাচ্ছে।

না, আমার তা মনে হয় না, হোলিস যুক্তি দিয়ে বোঝার আহত হওয়ার আগে ম্যাসন তার স্টেটসন টুপি ব্যবহার করে থাকবে। তাই মনে হয় ওর

আঘাত তেমন গুরুতর নয়। জুড এবং ডোরিসের দিকে ফিরে সে এবার বলে, লোকটা দেখছি সত্যিই ভয়ঙ্কর। খুনীর সব গুণই তার মধ্যে আছে।

ধর, আমাদের লোকেরা এখানে এল না. ডেভিস বলে, সময় থাকতে থাকতে এই রাস্তার শেষ প্রান্তের টেলিফোনে বুথে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখলে হোত না? কতই বা দূর হবে?

তা মাইল পাঁচেক তো হবেই। না ডেভিস, আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন পথ তো দেখতে পাচ্ছি না। ভাগ্যদেবী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হলে যে কোন মুহূর্তে তারা এখানে এসে হাজির হতে পারে।

ঠিক আছে, তাহলে অপেক্ষাই করা যাক।

কিন্তু তারা তখনো জানে না, সেই প্যাট্রল কার দুটে লসের বাংলোর দিকে আসতে গিয়ে পথের মাঝে একটা দুর্ঘটনায় ফেঁসে গেছে। দুটো গাড়ীর চালক দ্রুত চালাতে গিয়ে তাড়াহুড়োর মাথায় তারা দুজনেই একটু বেসামাল হয়ে পড়ে। প্রথম গাড়ীটা রাস্তার ধারে একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। দ্বিতীয় গাড়ীটা কোন করমে গতি আয়ত্তে এনে দুর্ঘটনা এড়াতে সমর্থ হয়। বৃষ্টির রাস্তা। দ্বিতীয় গাড়ীর চালক কোন রকমে সেই গর্ত থেকে প্রথম গাড়ীটা তুলে আনতে সমর্থ হয়। তারপর সেখানে প্রথম গাড়ীটা রেখে দিয়ে সে তার গাড়ী নিয়ে লসের খামার-বাড়ির দিকে এগোতে থাকে।

এইভাবে এক ঘন্টারও বেশি সময় অযথা নষ্ট হয়ে যায়। ওদিকে ম্যাসনের টুপি এবং বর্ষাতি চাপিয়ে তারই গাড়ীতে চেপে লোগান দ্রুত গতিতে হাইওয়ের উপর দিয়ে ছুটে যেতে থাকে। মনে মনে সে খুব খুশি কিছু সময় পুলিশের লোকগুলো বলতে গেলে তার পিছনে ধাওয়া করতে পারবে না। সে পথও সে বন্ধ করে এসেছে।

দুই

হাইওয়ের রাস্তা মরুভূমির মত দেখাচ্ছিল, একমাত্র পেরী ওয়াটসনের গাড়ী ছুটে চলেছে। বৃষ্টির জল পড়ে হেড লাইটের আলো অস্পষ্ট উইন্ডস্ক্রীণে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল সরাতে তাকে ওয়াইপার ব্লেডটা ক্রমাগত চালু রাখতে হয়েছে। হঠাৎ তার রেডিওয় একটা মহিলার আর্তচীৎকার ভেসে আসতেই নড়ে-চড়ে বসল সে। পেরী তখন পুরোপুরি মাতাল। তার পেটে লিকার পড়লে কারোর চিৎকার কিংবা বৃষ্টির তোয়াক্কা করে না সে। জ্যাকভেল এয়ার পোর্ট খারাপ আবহাওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল তাঁকে, প্রচণ্ড বৃষ্টি হতে পারে সাবধান।

তার সঙ্গিনী, হার্জ মেয়েটির দিকে তাকায় সে, তার ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি। বৃষ্টিকে কেই বা তোয়াক্কা করে? হাসতে হাসতে সে বলে, এই মুহূর্তে কিছুই তোয়াক্কা করে না সে।

ড্যাশকেডের আলোয় ঘড়ির দিকে তাকায় সে, ন'টা পাঁচ। পেরী জানে না, সেই সময় শেরীফ রোজ এবং তার সহকারী টম ম্যাসন টেলিফোনে জ্যাকসন-ভিলের প্রতিটি খামার বাড়িতে ফোন করে সেই ভয়ংকর খুনী চেক লোগান সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছিল।

বৃষ্টির প্রচণ্ড দাপট দেখে সে অবশ্য মনে মনে ভাবছিল, শেষ পর্যন্ত হয়ত তাকে জ্যাকসনভিলেই আশ্রয় নিতে হবে স্কচের নেশা ফুরিয়ে আসছিল। হাই ওয়ের ধারে গাড়ীটা থামিয়ে ব্যালানটাইনের বোতল খুঁজতে থাকে সে। হাতের কাছে বোতলটা পেয়ে ছিপি খুলে ঢকঢক করে গলায় চালল কিছু তরল পদার্থ।

এখন তার শরীরটা চাঙ্গা বলে মনে হচ্ছে কায়দা করে একটা সিগারেট ধরাল সে। রেডিওর সেই মহিলার কণ্ঠস্বর তখনও ভেসে আসছে তার আর্ত কণ্ঠস্বর শুনে কি ভেবে রেডিওর ষ্টেশন বদলাল সে। কিং ক্রসবির কণ্ঠস্বর কে যেন নকল করার চেষ্টা করছিল মরীয়া হয়ে। 'যত সব',—বিরক্ত হয়ে রেডিওর সুইচটা বন্ধ করে দিল সে। তারপর আর একবার বোতলে মুখ

রাখল। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, মনে মনে ভাবল সে। রাতের যে কোন সময়ে তার ফিশিং-লজে পৌঁছলে ক্ষতি কি?

নিউ ইয়র্ক থেকে জ্যাকসনভিলে আসছে সে, গতকালের ঘটনার কথা মনে পড়ল তার। তিন বছর আগে সে তার ফিশিংলজে এসেছিল। পরিত্যক্ত একটা কাঠের কাটামো ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে। সামনেই নদী চারিদিকে বড় গাছ এবং ফুলের বাগান রকভিলের গ্রাম থেকে মাইল দু'য়েকের পথ। বাড়িটা কেনার কোন মানেই হয় না, তবু সে অনেক টাকা খরচ করেছিল তার পিছনে। ইচ্ছে ছিল ব্যস্ত শহর নিউ ইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসে সেখানে নির্জন পরিবেশে নিজের হাতে রান্না করে নীরবে নিভৃতে থাকবে একাএকা। তার এই পরিকল্পনা চাকরীতে ঢোকার আগে। অবসর সময়ে মাছ ধরবে, স্ফূর্তি করবে। কিন্তু এখন সে ভাবছে তার থেকে পনের বছরের ছোট একটী মেয়েকে বিয়ে করে মস্ত বড় ভুল সে করেছে। পেরীর ইচ্ছে থাকলেও তার স্ত্রী নিউ ইয়র্কের হৈ-হট্ট-গোল ছেড়ে এমন নির্জন মরুভূমিতে মাসখানেক কেন, একদিন থাকলেই হাঁফিয়ে ওঠে সে। তবে পেরীর কাছে। ফশিং-লজের পরিবেশ অতি মনোরম, অতি আনন্দদায়ক। নির্জনতা মানুষকে বাড়তি আনন্দ দেয় এক এক সময়। কিন্তু শীলার মত মেয়েদের কোন কিছুতে সন্তুষ্ট করা যায় না যেন। শীলার চাহিদার সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে না সে। এক এক এক সময় ভীষণ বিরক্ত লাগে তাকে। কে জানে তার রূপ যৌবন একদিন যখন ফুরিয়ে যাবে, হয়ত তখন তাকে, আরও বেশি বিরক্তিকর মনে হবে। কিন্তু শীলা তো আর খেলার পুতুল নয় যে, পুরনো হলেই তাকে ফেলে দেওয়া হবে। অতএব তার মত অবুঝ মেয়েকে বিয়ে করাটাই মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে তার জীবনে।

তারপর গতকালের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার প্রসঙ্গে ফিরে এল পেরী। আজকাল প্রায়ই যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে যায়। এ যেন রোজকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তাদের দাম্পত্য জীবনে এবং বলা বাহুল্য সেটা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। গত কালও তার পুনরাবৃত্তি ঘটার সময় হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ এক সময় একটা চীনা ফুলদানি তুলে নিয়ে সে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারে। ঠিক সময়ে দেহটা ঈষৎ বাকাতেই ফুলদানিরা দেওয়ালের উপরে আছড়ে পড়ে।

পেরী তখন দারুণ উত্তেজিত স্ত্রীর অমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার দেখে

রাগে উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে সে, এখুনি আমার সামনে থেকে গন্ড্যাম্যান, তুমি একজন মাতাল, অভদ্র ইতর তোমার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করি, রাগে ফোঁস ফোঁস করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় শীলা। তার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেয়।

তখনও টেলিফোন বেজে যাচ্ছিল একটানা ক্রিং, ক্রিং, ক্রিং, স্তব্ধ হতবাকের মত অনেকক্ষণ ভাঙ্গা চীনা ফুলদানির টুকরাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে মাউথপীসে মুখ রাখে সে।

মিঃ ওয়াটসন ? মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূর ভাসে।

হ্যাঁ।

মিঃ ওয়াটসন, আমি মিঃ হার্টের সেক্রেটারি বলছি।

ওহো, তা কি মনে করে ? আমতা আমতা করে পেরী বলে, হ্যালো গ্রেস তোমার কি খবর বল ?

আমাদের আবার কি খবর হতে পারে ! গ্রেস শুকনো গলায় বলে। হ্যা যে কথা বলছিলাম, আজ সকলে এগারোটায় মিঃ হার্টের সঙ্গে দেখা করলে তিনি খুব খুশি হবেন। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই লস এঞ্জেলসের পথে রওনা হবেন মিঃ হার্ট।

র‍্যাড-হার্ট মুভি কর্পোরেশনের প্রেসিডেণ্ট, যখন যখন যা হুকুম করবে সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেওয়াটাই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

হ্যাঁ, যথাসময়ে আমি যাব। আর শোন—পেরী এবার তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে লাইনটা কেটে যাওয়ায় ক্ষুন্ন হল সে। গ্রেস এ্যাডামস প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলার ধার ধারে না।

টয়োটা গাড়ীর ভিতরে বসে বিদ্রুপের হাসি হাসছে এখন পেরী। মিলজা এস, হার্ট বড় নাছোড় বান্দা। তার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়তেই সে আবার ব্যালানটাইনের বোতল মুখে লাগিয়ে চক চক করে কিছু তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করল। হার্টের সঙ্গে তার হৃদ্যতার কারণ হল, গত চার বছর ধরে সে তার ছায়াছবির চিত্রনাট্য রচয়িতা এবং প্রতিটি ছবি তার হিট, যা তাকে টাকার পাহাড়ের উপর বসার সুযোগ করে দিয়েছে আজ। হার্টকে সবাই বদমেজাজী এবং নিষ্ঠুর বলেই জানে। সিনেমা জগতে তার খুব দুর্নাম।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার সঙ্গে হার্টের সম্পর্কটা বেশ মধুরই বলা যেতে

পারে। শুধু তাই নয়, সে তাকে তার নিজের ছেলের মত স্নেহ করে। কিন্তু অন্য চিত্রনাট্য রচয়িতাদের সঙ্গে তার খারাপ সম্পর্কের কথা ভেবে বিস্মিত হয় না পেরী। সে জানে হার্ট কেন তাকে এত ভালবাসে। তার কারণ একটাই, তার চিত্রনাট্যের চিত্ররূপ দিয়ে কোটি কোটি টাকা কামাতে পারছে বলেই হার্টের কাছে তার আজ এত কদর। কিন্তু হার্টের হাতে জমা দেওয়া তার পক্ষে চিত্রনাট্যের ছবি যদি ফ্লপ করে?

কয়েক মাস আগে তার আগামী চিত্রনাট্য নিয়ে হার্টের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল।

দেখ পেরী, এরার আমি একটা রক্ত গরম করা রগরগে ছবি করতে চাই, হার্ট বলেছিল, এই সব জড় বুদ্ধি সম্পন্ন দর্শকদের যাদের দৌলতে আমার প্রতিটি ছবি হিট, তাদের ঠিক কি ধরনের ছবি উপহার দিতে হয়, আমি তা জানি।

এমন একটা ছবি এবার আমি ওদের দেখাতে চাই, যা দেখে সিনেমা হল থেকে বেরোবার সময় তাদের প্যান্ট ভিজে ওঠে!—এ ব্যাপারে তোমার কি ধারণা বল, এবার আমি এমন একটা ছবি বানাতে চাই, যার মধ্যে থাকবে প্রচুর উত্তেজনা, রক্তারক্তি এবং সেক্স। বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা খুব মন দিয়ে ভেবে চিত্রনাট্য লিখতে বস। তারপর তোমার সেই চিত্রনাট্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাকে জানিও বুঝলে।

তারমানে হরর ছবি আপনি আর করতে চান না, সেটা হবে তোমার জীবনের শেষ ছবি। এখন আমি শুধু সাধারণ মানুষের ছবি করতে চাই, যাদের চাহিদা হল, উত্তেজনা, খুন যখম এবং সেক্সে ভরপুর ছবি। যে সব ঘটনা যে কোন মানুষের জীবনে যা প্রত্যহ ঘটে থাকে যেমন ধরা যাক একজন মাতাল গাড়ীর চালক তার ছেলেকে খুন করে খুনের চিহ্ন লোপাট করার ঘটনা।

বুঝলে আমি চাই ঠিক এ ধরনের ঘটনা নিয়ে। এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে দেখ; তোমার প্রতিভা আছে সেই প্রতিভার কসল তুলে পরে যে কোন সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পার। তাহলে ঐ কথা রইল, কেমন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই পেরী তাড়াতাড়ি তার কথায় সায় দেয়। সে জানে হার্টের সামনে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখান সম্ভব নয়, সম্ভব নয় এই কারণে যে, তুমি যদি তার সঙ্গে আঠার মত লেগে থাকতে চাও তো, তোমার জীবনের

সব আদর্শ ভুলে গিয়ে তার কথায় রাজী হয়ে যাও।

কথাটা মনে করেই সে আরো বলে, এ ব্যাপারে আমি চিন্তা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার মতামত জানাব আপনাকে। এই তো ভাল ছেলের মত কথা বলছ, হাসে হার্ট, জান পেরী আমার এই নতুন বই-এর দাম হবে পঞ্চাশ হাজার এবং তার সঙ্গে আরো শতকরা পাঁচ ভাগ প্রযোজকের মুনাফা এ হবে আমার কাছে তোমার বড় দাঁও।

তারপর দুমাস ধরে হার্টের ফরমাস মত একটা চিত্রনাট্য রচনা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে, যা তার মনিবকে সন্তুষ্ট করতে পারে। সেই দুমাসে শীলা আরো ভয়ংকরী হয়ে উঠেছিল পেরী তাকে কতই না বুঝিয়েছে। নির্জনে সে এমন একটা চিত্রনাট্য রচনা করতে চায়, যা থেকে সে এবং তার প্রযোজক মোটা টাকা মুনাফা করতে পারে। কিন্তু সে কথায় ভোলার মেয়ে নয় শীলা। দিনে জোকের মত সর্বক্ষণ সে তার সঙ্গে লেগে থাকে। এমন কি দু'সপ্তাহ ধরে গালা ফিল্ম শো'র সময়েও শীলা তার সঙ্গ ছাড়তে ভোলে না।

আমি একজন সব থেকে ভাল চিত্রনাট্য রচয়িতার স্ত্রী, শীলা নিজের যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝায়, আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে না পেলে ঐ সব মূর্খ দর্শকরা আমাদের দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কি রকম বিরূপ ধারণা করে নেবে, সে কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ ?

আজ এই মুহূর্তে মাথা মোটা শীলার সঙ্গ এড়িয়ে সীটে হেলান দিয়ে এই বৃষ্টি ঝরা রাতের মায়াময় পরিবেশে একান্ত নিজের মত করে সময়টাকে ধরে রাখতে গিয়ে পেরী তার সেই স্ত্রীর কথা ভাবছিল। সত্যি কি বোকাই না সে, তা না হলে শীলার মত একটা নীরেট-মাথা মেয়েকে বিয়ে করে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া বুঝি আর কিছু সে ভাবতে পারে না। অথচ এই শীলাকে জয় করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। তার রূপ আর যৌবনের এমনি দেমাক ছিল যে, যে কোন পুরুষ তাকে পাওয়ার জন্য মনে মনে একান্ত ভাবে তাকে কামনা করত। পেরীর বন্ধুরাও শীলার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে বিয়ে করার জন্য। কিন্তু শীলা তাদের ইচ্ছায় ভয়ংকর আঘাত হেনে শেষে পেরীর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেয় একদিন।

সে সব কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে তাদেয় বিয়ের প্রথম তিন-চার মাসের কথা। সত্যি বলতে কি শীলাকে শয্যা সঙ্গিনী হিসাবে পেলে যে কোন পুরুষই নিজেকে ধন্য বলে মনে করবে। বিয়ের পর প্রথম

দিকে পেরীরও তাই মনে হয়েছিল বৈকী। সেই দিনগুলো ছিল বড় উত্তেজনাময়, বড় মধুময়। তার বন্ধুদের কাছে সে তখন হিংসার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু তার পর তার সীমাহীন চাহিদা তাকে বড় চিন্তায় ফেলে দেয়। তাকে যথেষ্ট করে অর্থ উপার্জ্জন করতে হয়। আর শীলা? তার কাজের মধ্যে কেবল সাঁতার কাটা, টেনিস খেলা এবং অনর্গল বক বক করে যাওয়া। সে হয়তো সবে দু লাইন তার নতুন ছবির চিত্রনাট্য লিখতে শুরু করেছে, অমনি কোত্থেকে ছুটে এসে শীলা গল্প ফেঁদে বসবে—কোন এক বান্ধবী তার বান্ধবী তার বন্ধুর সঙ্গে শয্যা সঙ্গিনী হয়েছে, সেদিন রাত্রে তার বান্ধবী নাইট ক্লাবে রাত কাটিয়েছে, ইত্যাদি।

শেষে বিরক্ত হয়ে পেরী তাকে বলল, তার জরুরী কাজ আছে সে যদি একটু চুপ করে—

শীলা তখন মৃদু হেসে চায় না ব্লু চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে বলত, তোমার কাজ করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আর আমার এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—

সত্যি কি অবুঝ মেয়ের মত কথা বলা। সেই সময়ে স্কচ কিংবা ব্যালন-টাইনের বোতলই একমাত্র সাথী এবং আপনজন বলে মনে হত এইটুকু তার সান্ত্বনা।

মিলজ এস, হার্ট তাকে ডেকে পাঠিয়েছে, বুকটা তার কেঁপে ওঠে। তার কাছে পেরীর জমা দেওয়া শেষ চিত্রনাট্যটা তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রনাট্য-কারের লেখার মত যে হয়েছে সেটা সে বেশ ভাল করেই জানত। আর সেই কারণেই হার্টের জরুরী তলব পেয়ে তার বুকটা কেঁপে ওঠে।

র‍্যাড হার্ট মুভি কর্পোরেশনের অফিসে যাওয়ার জন্য এলিভেটারে উঠতে গিয়ে নিজেকে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল পেরীর।

কেন সে অমন সস্তা ধরনের চিত্রনাট্য লিখতে গেল? সঙ্গে সঙ্গে তার আবার একথাও মনে হলে, তার কি দোষ? তখন সব অভিযোগ গিয়ে পড়ল শীলার উপরে। চিত্রনাট্য লেখার সময় শীলা তাকে বার বার বিরক্ত করেছে,। আর সেই বিরক্তি করেছে, আর সেই বরক্তির জ্বালা ভুলতে তাকে শরণাপন্ন হতে হয়েছে স্কচের। এ্যালকোহলের নেশা তাকে অমানুষ করে তুলেছিল তখন সাময়িক ভাবে। তারই ফল প্রসূ হল তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রনাট্যের রূপদান। আর একটা সিগারেট ধরাল পেরী বাইরে তখন বৃষ্টি থামার নাম নেই,

উইণ্ডস্ক্রীন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় শব্দ মুখরিত এবং ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

যথারীতি আগের মতই হার্ট তাকে আদর আপ্যায়ন করল। কোন তফাৎ অনুভূত হল না পেরীর কাছে।

আমার হাতে এখন খুব বেশী সময় নেই বৎস, এখুনি আমাকে লস এঞ্জলসে চলে যেতে হচ্ছে। সেখানে নানান ঝামেলা। সে যাইহোক, তোমার সঙ্গে জরুরী কয়েকটা কথা ছিল—

সেই সময়ে গ্রেস এ্যাডামসকে তাদের আলোচনার মধ্যে এসে হাজির হতে দেখা যায়। দীর্ঘাঙ্গী রোগাটে চেহারা চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। সব সময় তার পোশাকে একটা না একটা চমক লেগেই থাকে। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হতে দেখা গেল না ভাল কথা 'বৎস বৎস' হার্টের মুখ থেকে শুনলে কেমন যেন একটা আত্মীয়তার সুর অনুভব করে থাকে পেরী, তুমি যে লেখাটা দিয়েছ সে নিয়ে আজ আর আলোচনা করতে চাই না। আজ আমরা তোমার সম্বন্ধে আলোচনা করব কি ঠিক আছে তো ?

বেশ তো আপনি যা ভাল বোঝেন—স্কচের গ্লাসটা হাতে তুলে নেয় পেরী তৃষ্ণা তাকে অনেকক্ষণ থেকে পীড়া দিচ্ছিল।

আমার কি সৌভাগ্য যে তোমার মত একজন ভাল চিত্রনাট্যকার কে পেয়েছি, হার্ট তার স্কচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে, তোমার দৌলতে আজ আমার এত ধন সম্পত্তি। আমি যখনি তোমার কাছ থেকে নতুন চিত্রনাট্য চেয়েছি, তুমি না করনি, ঠিক সময়ে আমার ছবির কাহিনী জমা দিয়েছ, আর আমি তোমার সেই সব কাহিনী ভাঙ্গিয়ে আজ টাকার কুমীর হয়েছি। সবাই জানে আমি ভালোবাসি কেবল ধনসম্পত্তি। কিন্তু সে ছাড়াও আমি তোমাকেও ভাল বাসি। আমার হয়ে যারা কাজ করে, আমি তাদের কাউকেই তেমন পাত্তা দিই না, তার কারণ আমি জানি তারা কেউই আমাকে পছন্দ করে না। তবে তুমি তাদের ব্যতিক্রম, কারণ তোমার সঙ্গে আমার একটা আলাদা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমরা পরস্পরের বন্ধু পরস্পরের সুখের সাথী এবং দুঃখের ব্যথী, তারপর সে তার স্কচে শেষ চুমুক দিয়ে হাসল, হ্যাঁ বৎস, এতটুকু বাড়িয়ে আমি বলছি না। প্রথম থেকেই তোমার উপরে আমার নজর আছে। আমার মূল্যবান সম্পত্তির মত তুমি যখন আমার সাথে আছ, স্বভাবতই তোমার উপরে একটু বাড়তি নজর তো আমি দেবই। আমার অবস্থাটা সেই সব মহিলাদের মত

যাদের কাছে দুই মিলিয়ন ডলার দামের হীরা থাকলে সব সময় তার উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে রাখে হারাবার ভয়ে। ঠিক সেই মনোভাব নিয়ে আমিও নজর রেখে আসছি অনেকদিন থেকে।

খালি গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে পেরী বলে, সে আপনার বদান্যতা।

হ্যাঁ এখন আমার কি মনে হয় জান বৎস, তুমি এখন দুটি সমস্যায় ভুগছ। বড় সমস্যা হল তোমার স্ত্রী, আর ছোট সমস্যাটা তোমার মদ্যপান। বল ঠিক বলেছি কিনা?

আমার স্ত্রীর ব্যাপারে কারোর সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চাই না পেরীর কথায় বিরক্তি প্রকাশ পায়।

তোমার মনের প্রতিক্রিয়াটা খুবই স্বাভাবিক, চেয়ারে আরাম করে বসে হার্ট বলে, কিন্তু সে কথা আমাকে তুমি অনায়াসে বলতে পার। ভুলে যেতে না, আমি তোমার পাটনার। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আটত্রিশ বছরের পুরুষ যদি তেইশ বছরের যুবতীকে বিয়ে করে, তার ওপর সে যদি সত্যিই ব্যস্ত কর্মী হয় স্বভাবতঃই তার স্ত্রীর ব্যাপারে তাকে অসুবিধায় পড়তেই তো হবে। আর তেইশ বছরের যুবতীর মনে তখন রঙ্গীন স্বপ্ন উড়ু উড়ু ভাব, তার ওপর তোমার মত অর্থবান স্বামী পেলে তো কথাই নেই, দুহাতে পয়সা ওড়াবে।

এ সব কথা শোনার মত মন আমার নেই, পেরী আর একবার বিরক্তি প্রকাশ করল, যে চিত্রনাট্যর খসড়া আপনাকে পাঠিয়ে ছিলাম সেটা আপনার ভাল লেগেছে নাকি লাগেনি আগে সেই কথা বলুন।

ভাল লিখেছ বলে কি তোমার বিশ্বাস?

ঠিক আছে পেরী সরাসরি জানিয়ে দেয় আমি আমার সাধ্য মত চেষ্টা করেছি, কিন্তু আপনার মন যখন জয় করতে পারিনি। আপনি তখন অন্য কোন চিত্রনাট্য কারের সন্ধান করতে পারেন।

সেটা কোন পথ নয় বৎস। সে পথ পিছু হটার আমি তোমাকে ও ভাবে তোমার উজ্জ্বল জীবনের পথ থেকে পিছিয়ে যেতে দেব না। হার্ট তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলে, আমার মতে কোন মানুষের জীবনে কোন স্থায়ী সমস্যা বলে কিছু থাকতে পারে না। আমি তোমার সঙ্গে সহযোগিতাকরতে চাই। আমি জানি, তুমি খুব ভাল চিত্রনাট্য লিখতে পার, কিন্তু সে পথে একমাত্র বাধা হল তোমার স্ত্রী।

পেরী এবার প্রতিবাদ করার জন্য উঠে দাঁড়াল। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল কিন্তু কি ভেবে হার্টের ডেস্কের সামনে ফিরে এল। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, শীলার সঙ্গে মোকাবিলা আমাকেই করতে দিন।

না বৎস তার সঙ্গে মোকাবিলা করা তোমার কাজ নয়। হার্ট এবার কোন ভূমিকা না করেই বলে আমার কাছে খবর আছে, মেয়েটা মোটেই ভাল নয়। বহু পুরুষের কণ্ঠ লগ্না হয়ে থাকতে চায় সে। যতদিন তোমার টাকা আছে সে তোমারা তোমার টাকা ফুরুলেই সে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আর এক পুরুষকে ধরবে। তোমার থেকে আমি তাকে বেশি জানি। বুঝলে পেরী? আমি নিজে জেনেছি তোমার অসাক্ষাতে অন্য পুরুষের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক আছে। দুটি বয়ফ্রেণ্ড তো তার বরাদ্দ। আমি তাদের সমস্ত জানি, কিন্তু তাতে কি যায় আসে? এক কথায় শীলা হচ্ছে বয়-কীলার। তুমি জান যে, রোজ অপরাহ্নে টেনিস খেলতে যায় শীলা। কিন্তু আদৌ সে টেনিস কোর্টে যায় না। মিথ্যে, সব মিথ্যে। আসলে কি জান পেরী, এ ধরনের মেয়েদের ঠিক এক পুরুষে আসা মেটে না। তোমার অসাক্ষাতে অন্য পুরুষের কাছে গা ভাসিয়ে দেয়। বিভিন্ন হোটেলে তার অবাধ যাতায়াত আছে আমার লোকেরা তোমার স্ত্রী এবং তার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে কথাবার্তা টেপ করে রেখেছে। কিন্তু এসব কথা আদৌ শুনতে চেওনা। তবে এখনও আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ সহযোগিতা তুমি অবশ্যই পাবে। তোমার অসময়ে আমি তোমাকে দেখব আর আমি আমার অসময়ে তুমি আমাকে দেখবে, ঠিক আছে?

না, আমি এসব বিশ্বাস করি না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল পেরী।

বিশ্বাস তুমি ঠিকই কর বৎস শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর হার্টের তবে স্বাভাবিক ভাবেই তুমি বিশ্বাস করতে চাও না।

বিশ্বাস আমিও করতে চাই না, কিন্তু আমি ভুল করতে চাই না।

শোন পেরী, শীলাকে ছাড়তেই হবে। এটাই তোমার একমাত্র সমাধানের পথ, এই ভাবে মনটাকে তোমার তৈরী করতে হবে। তোমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদের সব রকম প্রমাণ আমার লোকেরা তোমাকে সংগ্রহ করে দেবে। দেখবে, একবার তুমি তার হাত থেকে মুক্তি পেলে অনায়াসে তোমার লেখা খুলে

যাবে।

পেরীর মুখটা কেমন কঠিন হয়ে ওঠে।

শীলার ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই না এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

হার্ট মাথা নাড়ল। তোমাকে আসতে বলার আগে আমি ও ঠিক এই এই কথাটাই ভেবেছিলাম, এমনি উত্তরই আমি তোমার মুখ থেকে শুনব এ ছাড়া অন্য কিছু শুনলে আমি অখুশি হতাম। যাই হোক, এখন তুমি আমার একটা উপকার করবে?

পেরী কেমন সন্দেহের চোখে তাকাল তার দিকে, উপকার?

হ্যাঁ, আমাদের দুজনেরই সুবিধার্থে। তুমি মাছ ধরতে ভালবাস?

নিশ্চয়ই কিন্তু এর সঙ্গে মাছ ধরার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

ফ্লোরিডায় তোমার একটা ফিসিং লজ আছে, তাই না?

পেরী বিস্মিত, আপনি কি করে সে খবরটা জানলেন?

কিছু মনে করো না, হার্ট তার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলে, আছে কিনা বল?

হুঁ।

ঠিক আছে আজই তোমাকে সেখানে যেতে হবে। আমি চাই সেখানে তুমি মাছ ধর আর চিন্তা কর। আর আমি চাই, তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল যে, আমি তোমায় শেষতম চিত্রনাট্যের শুটিং-এর জায়গা পছন্দ করতে বাইরে পাঠিয়েছি। আমাদের দুইজনের স্বার্থে শীলার কথা তুমি ভুলে যাও, মদের বোতলের কথা। মাছ ধর আর চিন্তা কর। আমি তো তোমাকে বলেছি, এমন একটা চিত্রনাট্য তুমি রচনা কর যার মধ্যে থাকবে অ্যাকশন, থ্রিল -সেক্স—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছিপ হাতে নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে বসলে যে চিন্তায় তুমি মশগুল হবে তার ফলে আমার পছন্দ মত চিত্রনাট্য লিখে ফেলতে পারবে।

হার্টের কথা শুনতে শুনতে পেরীর মনে হয়েছিল, সে তাকে নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে কায়দা করে, দিতে চাইছে শীলার কাছ থেকে, যাতে করে সে একাকিত্বের আমেজ অনুভব করতে পারে। সেখানে থাকবে কেবল একটা মাছ ধরার ছিপ এবং হার্টের মনে মত চিত্রনাট্য রচনা করার পরিকল্পনা।

তারপর বাড়ি ফিরে এসে হার্টের পরিকল্পনা মত শীলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিউইয়ক সিটি থেকে বেরিয়ে পড়ে সে।
একবার তুমি যদি তার হাত থেকে মুক্তি পাও। দেখবে তুমি আবার তোমার লেখায় ফিরে আসতে পেরেছ।

বৃষ্টি-ঝরা রাতে টয়োটা গাড়ীর ছাদে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে শুনতে আপন খেয়ালে মাথা নাড়ল পেরী। মাস দুয়েকের জন্য শীলার কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। দেখা যাক এই সময়ের মধ্যে সে তার স্বাভাবিক লেখা ফিরে পায় কিনা।

টেলিফোনে কার্ল জেনারের সঙ্গে কথা বলছিল শেরীফ রোজ। দেখ কার্ল এ সব কি হচ্ছে? কৈফিয়ত চায় সে, টম কিম্বা তোমার লোকেদের কোন খবর পাচ্ছি না কি ব্যাপার বল তো?

জানি না হোলিস এবং ডেভিসের কোন পাত্তা নেই। লসের খামার বাড়ীতে টেলিফোন অকেজো হয়ে আছে।

জানি। গত এক ঘণ্টা ধরে আমি সেখানকার লাইন পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তা তুমি এখন কি করছ?

দুটো প্যাট্রলকার তো সেখানে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দুভাগ্যবশতঃ একটা গাড়ী পড়ে গিয়ে বিকল হয়ে যায়। তবে দ্বিতীয় গাড়ীটা এখন চলতি পথে। লুইস এবং জনসন দ্বিতীয় গাড়ীর যাত্রী কিন্তু সেই খামার বাড়ীর পথ চেনে না তারা।
ঠিক আছে, আমি নিজে সেখানে যাচ্ছি, রোজ একটু উত্তেজিত হয়ে বলে ওখানকার পথ ঘ ট আমার সব চেনা। রেডিও মারফত যোগা যোগ করব।

মেরী তার স্বামীকে বিদায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। বর্ষার রাত। বর্ষাতি এবং টুপি রোজের হাতে তুলে দিতে গিয়ে সে বলে জেফ সাবধানে পথ চলো আমি সব তোমায় খবরের অপেক্ষায় টেলিফোনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকব।

তার দিকে চেয়ে হাসল রোজ।

শেরীফের মতই কথা বলছ তুমি, রোজ তার রিভালবারটা পরীক্ষা করে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে বলে, চিন্তা করো না। রেডিও চালু উপযুক্ত স্ত্রীর রোখ, আমি তোমার সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ করে চলব। দেখার সময় তারপর বৃষ্টি মাথায় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল সে।

পাহাড়ী পথ, দুর্গম তার ওপর জলে-কাদায় পথের অবস্থা আরও খারাপের পথে। খানা-খন্দ বাঁচিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল রোজলসের খামার বাড়ী যাওয়ার পথে। শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের বুকে এসে হোলিসের গাড়ীটা চোখে পড়ল, তার তীব্র হেডলাইট জ্বালিয়ে এক সময় লসের বাংলোর সামনে এসে গাড়ী থামল রোজ। পর মুহূর্তেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল দু'টি ছায়ামূর্তি বাংলোর প্রবেশ পথের সামনে। রোজের দিকে এগিয়ে এল তারা।

গাড়ী থেকে নামতেই হোলিস মৃদু চিৎকার করে বলে উঠল হাই শরীফ, আপনি এসে ভালই করেছেন। আমি তো জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

সোজা লবিতে গিয়ে ঢুকল রোজ। এখানে এসব কি হচ্ছে? এই প্রথম সে মুখ খুলল, জেনারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে না কেন? আর টমম্যাসনই বা কোথায়?

আপনার গাড়ীর রেডিও কি কাজ করছে শরীফ?

হ্যাঁ, কিন্তু—

জেনারের কাছে রিপোর্ট করতে হবে, ডেভিস ততক্ষণে এখানকার দুর্ঘটনাস্থলগুলো আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে।

হোলিস বেরিয়ে যায় লবি থেকে। ওদিকে বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টি এড়াতে এক রকম ছুটে গিয়ে রোজ-এর গাড়ীতে গিয়ে উঠল সে। মিনিট খানেক পরে জেনারের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখা যায়। লসের খামার বাড়ীর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিল সে তখন।

নিঃশব্দে তার কথা শুনতে থাকে জেনার।

এই খুনী লোকটা ম্যাসনের গাড়ি নিয়ে পালিয়েছে, তার মাথায় টমের টুপি।' টম ম্যাসনের রিভালবারটাও সঙ্গে নিয়ে গেছে সে, হোলিস তার কথা শেষ করে।

এ এক অদ্ভুত খুনী। বিচিত্র তার নেশা, জেনার মন্তব্য করে, এই নিয়ে এক রাত্রে পাঁচ পাঁচটা খুন সে করল। একটু থেমে সে আবার বলে, এখুনি একটা এ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে একজন মেডিক্যাল অফিসারকে পাঠাচ্ছি।

বাংলোয় ফিরে এসে রোজকে হাঁটু মুড়ে টম ম্যাসনের পাশে বসে থাকতে দেখল হোলিস।

ওকে স্পর্শ না করাই ভাল, হোলিস বলে এখুনি এ্যাম্বুলেন্স এসে পড়বে।

সত্যি ওর অবস্থা খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

সে মৃত, নিরুত্তাপ ভরাট গলায় রোজ বলে, আমাকে চিনতে পারার সময়টুকু পেয়েছিল সে কেবল, তার পরেই তার প্রাণটা বেরিয়ে যায়।

ঠোঁট থেকে মদ্য পান করা ড্রাই মার্টিনি মুছতে মুছতে টেনিস কোর্টের বিপরীত দিকে বসে থাকা সুপুরুষ যুবকের দিকে তাকাতে গিয়ে পলক ফেলতে ভুলে গেল শীলা ওয়েস্টন।

তুমি খুব ভাল টেনিস খেলতে পার মিসেস ওয়েস্টন। যুবকটি মৃদু হেসে বলে, তোমার যদি এক ঘেয়ে না লাগে তো খুব শীগগীর আমরা দুজনে এই টেনিসকোর্টে মিলিত হতে পারি।

শীলাকে প্রায় পেশাদারী টেনিস খেলোয়াড় বলা যেতে পারে। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির আহ্বানে সাড়া দিল। বিজয়িনীর সম্মান পেতে চায় সে বিশেষ করে পুরুষদের বিরুদ্ধে।

লম্বাটে চেহারা যুবকটির, কোঁকড়ানো কালো চুল। রোদে পোড়া মুখ। নিজেকে সে জুলিয়ান লুকান বলে পরিচয় দিল। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিল শীলা। মনে মনে ঠিক করে নিল সে, তার শয্যার সঙ্গী হিসেবে যুবকটি যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক যোগাতে পারে কিনা। পেরী উপর তলায় তার জিনিসপত্র গোছগাছ করতে চলে যাওয়ার পরেই সে টেনিস ক্লাবে চলে আসে। তারপর যুবকটিকে সেখানে দেখে ঠিক করে ফেলে সে, এবার তার শয্যা-সঙ্গী বদলাতে হবে। জো এবং জর্জ তার কাছে তারা এক ঘেয়ে হয়ে গেছে, আগের মত তারা আর তাকে তেমন সুখ দিতে পারে না। তা এই সুদর্শন যুবকটি পেরীর অনুপস্থিতিতে তাকে যথেষ্ট যৌন সুখ দিতে পারবে বলেই মনে হয়। যেভাবে সে তার দিকে তাকাচ্ছে, শীলা জানে যুবকটিকে দিয়ে যৌন সুখ পাওয়াটা কোন সমস্যাই নয়।

যাই হোক সে একজন আগন্তুক। এর আগে তাকে ক্লাবে কখনও দেখেনি শীলা। তাই তাকে একটু বাজিয়ে দেখে নিতে চাইল সে। তোমাকে তো এর আগে কোনদিন দেখিনি।

এই প্রথম আসছি, প্রত্যুত্তরে লুকান বলে জায়গাটা ভারী চমৎকার তাই না? শহরে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠতে হয়।

তাই বুঝি? শীলা আর এক ধাপ এগিয়ে যায়, তা শহরে কি কর তুমি?

একজন ফটোগ্রাফারের মডেল হয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয়। শীলা মাথা নাড়ে। তার কথায় সন্তুষ্ট সে। এবার এগোনো যায় আচ্ছা, সামনের উইক-এণ্ডের ছুটিতে তোমার কোন কাজ আছে নাকি ?

তোমার কাছ থেকে কোন লোভনীয় প্রস্তাব পেলে সব কাজ ফেলে আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারি মিসেস ওয়েস্টন।

সরাসরি প্রস্তাবে বিশ্বাসী সে। এর আগে সুফলও সে পেয়েছে যা—বীচে বলিষ্ট চেহারার পুরুষ, ক্লাবে, বারে সুন্দর চেহারার লোক। তারা তার চোখের ইশারায় তাকে কোন মোটেলে নিয়ে গিয়ে তুলেছে। কিন্তু এবার সে ঠিক করেছে, নিজেই এ ব্যাপারে অগ্রণী হবে এবং সব ব্যবস্থা নিজেই করবে।

এই উইক-এণ্ডে আমি একা, শীলা তাকে বলে, আমার স্বামী তাঁর ব্যবসার প্রয়োজনে বাইরে গেছেন। আজ এবং কাল রাতটা তুমি আমার সঙ্গে কাটাবে ? শীলার চোখে কামনা থিকথিক করতে থাকে।

এর থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না, যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আমি তোমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলাম। প্রিয় বান্ধবী।

হাতব্যাগ থেকে শীলা একটা কার্ড বার করে টেবিলের উপরে রাখল যুবকটির উদ্দেশ্যে। এতে আমার বাড়ির ঠিকানা লেখা আছে। রাত আট-টার সময় এস। তখন আমার বাড়ীর কাজের লোকটাও ফিরে যাবে। তখন কেবল তুমি আর আমি, উঃ কি মজা যে হবে—বাচ্চা মেয়ের মত আনন্দে লাফিয়ে উঠল, যেন এইমাত্র টেনিস কোর্টে একটা ভাল বলকে তার বিপক্ষের কোর্টে ছুঁড়ে দিল বুঝি।

কার্ডটা পকেটে চালান করতে গিয়ে যুবকটি বলে, তোমার কাছে যথা সময়ে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে আমি প্রতীক্ষা করব মিসেস ওয়েস্টন।

উহুঁ মিসেস ওয়েস্টন নয়, এখন থেকে তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে, স্রেফ শীলা, বুছলে বন্ধু জুলিয়ান, আদর করে জুলিয়ানের থুতনিতে একটা ছোট্ট টোকা মেরে ক্লাব হাউসের দিকে এগিয়ে যায় শীলা।

লুকান তার ড্রিঙ্ক শেষ করে ফরমাস দিল। সে তখন খুশিতে ডগমগ। একজন বিখ্যাত চিত্রনাট্যকারের স্ত্রীকে আজ রাতে উপভোগ করতে চলেছে সে। এটা কম ভাগ্যের কথা নয়। তার বন্ধুরা সাধে কি তাকে লাকী লুকান বলে সম্বোধন করে ?

ওদিকে শীলা কিংবা লুকান কেউই টের পেল না, অদূরে একটা বিরাট

ছাতার নিচে বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে এ্যাকমে ইনভেস্টিগেশনের সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ টেড ফ্লিচম্যান তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল। গত এক সপ্তাহ ধরে শীলা ওয়েস্টনের উপরে নজর রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল তার উপরে। শীলার প্রতিদিনের গতিবিধির রিপোর্ট পাঠাতে হয় র‍্যাড—হার্ট মুভি কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মিস গ্রেস এ্যাডামসের কাছে।

শীলা চলে যাওয়ার পর মুহূর্তে ফ্লিচম্যান সেখান থেকে উঠে গিয়ে টেলিফোনের খোঁজ করে। লুকানের হাতে শীলাকে তার কার্ড তুলে দিতে দেখেছে সে। খবরটা এখুনি এ্যাকমে ইনভেস্টিগেশনের অফিসে পৌঁছে দিতে হবে। ডোরি রোজার ফোনটা ধরনেই ফ্লিচম্যান বলে, ফ্রেড স্মলকে চাই, খুব জরুরী প্রয়োজন। ওয়েস্টনের কেসটা ফ্রেড স্মল দেখছে।

কিন্তু ফ্রেড তখন অফিসে ছিল না।

শোন ডোরি, ফ্লিচম্যান তাকে বলে, ফ্রেড ফিরে আসামাত্র তাকে লং আইল্যান্ড টেনিস ক্লাবে পাঠিয়ে দেবে। আমি তার সঙ্গে টেরাসে দেখা করব, কেমন?

ফ্লিচম্যান তার সেই ছাতার নিচের আসনে ফিরে এসে শীলা ওয়েস্টন এবং জুলিয়ান লুকানের উপরে নজর রাখতে থাকে। শীলা আর তিন মেয়ে বন্ধুর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ সারতে ব্যস্ত। আর লুকান একা একা স্যান্ডউইচ খেয়ে যাচ্ছিল আরাম করে।

আধঘণ্টা পরে ফ্রেড স্মল, এ্যাকমের আর একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা পঞ্চাশোর্ধ বয়স, পরণে হাল্কা নীল রংঙের পোষাক, ভীড়ের মধ্যে দিয়ে ফ্লিচম্যানের সঙ্গে যোগ দিল, কেউ তার দিকে নজরও করল না।

আড়চোখে লুকানের দিকে তাকিয়ে নীচু গলায় ফ্লিচম্যান বলে, ভাগ্যবান যুবক। একবার ম্যানহাটানে ওর সঙ্গে একটু গোলমাল বেঁধে যায়। বিগগাই বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমায় প্রথমে। তারপর তাদের দেহ উপভোগ করে ব্ল্যাকমেল কিংবা মোটা টাকা উপহার দাবী করে থাকে। মনে হয় মিসেস ওয়েস্টনকে গেঁথে ফেলেছে ও। হয় সে মিসেস ওয়েস্টনের কাছে যাবে, কিংবা মিসেস ওয়েস্টন তার কাছে আসবে। ফ্রেড তুমি লক্ষ্য রাখবে লুকানের উপরে আর আমি নজর মিসেস ওয়েস্টনের উপরে। ও-কে?

ইতিমধ্যে লুকান তার মদের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বিল মেটানর জন্যে উঠে দাঁড়ায়। ফ্রেডও প্রস্তুত। লুকানকে অনুসরণ করার জন্য সে-ও উঠে

দাঁড়ায়।

নৈশভোজ সেরে শীলা তার তিন বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। তারপর সে লিজাকে উদ্দেশ্য করে বলে, মিসেস বেনসিঙ্গারকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করতে চাই। তার জন্য নতুন ধরনের খাবার চাই। তুমি তো বাম্পায় ওস্তাদ, তোমার উপরই সব ভার ছেড়ে দিলাম। তারপর চলে যেতে গিয়ে পিছন ফিরে তাকাল সে, আশা করি উইক-এন্ড তোমার বেশ ভালই কাটবে।

একটু পরে পোশাক পাল্টানর ঘর থেকে বেরিয়ে এল শীলা। আগের পোশাকের জায়গায় এখন তার পরণে বিকিনি সুইমিং পুলের ধারে গিয়ে সে বসল। ওদিকে ফিচম্যান তার দিকে নজর রাখার জন্য সামনা সামনি একটা বাহারী ছাতার নিচে বসল। এখন শুধু অপেক্ষা। সে ধৈর্য তার আছে। অবশ্য তার জন্য মোটা টাকার পারিশ্রমিক সে পাবে।

শীলার চোখে সান-গ্লাস। চোখ বন্ধ করে সে তখন জুলিয়ান লুকানের কথাই ভাবছিল। তার মুখটা মনে পড়তেই তার সারা দেহে একটা যৌন ক্ষুধার তাগিদ অনুভব করল সে। জো কিংবা জর্জ তার কাছে তুচ্ছ। সব প্রেমিকদের প্রেমিক সে। তার ধূসর রঙের সেক্সি চোখ, তার বলিষ্ট দেহ, তার মনের জোর ভীষণভাবে আকর্ষণ করতে থাকে শীলাকে।

সত্যি, চমৎকার আর্ষনীয় ঐ যুবকটির সঙ্গে কথা বলেছিলে তুমি? তারিফ করার মতই বটে! এখন আমাদের আসল কাজের বেলায় কি রকম হয় সেটাই দেখার বিষয়।

মেভিস বেনসিঙ্গারের কণ্ঠস্বর কানে আসতেই তার দিকে ভ্রু-কুঁচকে তাকাল শীলা সে এবং মেভিস ঘনিষ্ট বন্ধু মেভিস তার থেকে কুড়ি বছরেব বেশী বয়সের একজন লোককে বিয়ে করেছে। লোকটা মোটা এবং টেকো। যত লম্ফ ঝম্ফ তার বাইরে, কিন্তু বিছানায় শুলেই একে বারে নেতিয়ে পড়ে, মেভিসের সেক্সি দেহটা উপভোগ করতে গিয়ে মাঝ পথে ঘেমে যায়। মেভিস তখন ব্যর্থ হয়ে একা একা বিছানায় ছটফট করে মরে। স্বভাবতই মেভিস তার দেহের ক্ষুধা মেটানর জন্য অন্য পুরুষের সঙ্গ কামনা করে এবং সফলও হয়। তার ভাগ্য ভাল, বেনসিঙ্গার তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটায় ওয়াশিংটনে। মাসে মাত্র তিন চার দিন মেভিসকে একটু বিরক্ত করে সে। তা করুক, গোছা গোছা টাকা তো সে তার হাতে তুলে দেয়। তবে একদিন তাকে ছাড়তেই হবে।

হ্যাঁ, তা যা বলেছ বটে, শীলার ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়, রাতে আমি সেটা পরখ করে জানতে পারব। আমি ওকে আমার বাড়ীতে আহ্বান করেছি। পেরী এখন লসএঞ্জেলসে।

তোমার বাড়ীতে? বিস্ময়ভরা চোখে মেভিস তাকায়? সেটা কি ঠিক হবে শীলা? আমি ভেবেছিলাম, আমার মত তুমিও এসব কাজ বাইরে কোন হোটেলেই সারবে। তাতে লোক জানাজানির কোন আশংকা থাকে না।

থাকলেই বা কি? শীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, লোক জানাজানির ভয় আমি করি না এখন আর। এমন কি পেরীকেও না। আমি ওর কাছ থেকে মুক্তি চাই। তারপর আমার পছন্দ মত অনেক পুরুষ আছে, যাদের মধ্যে থেকে আমি আমার সঙ্গী বেছে নিতে পারব।

কিন্তু পেরীর মত অত টাকা কার আছে বল? মনের মত পুরুষ হয়তো পাবে, তবে টাকার সুখ পাবে না তার কাছে। অর্থছাড়া কোন সুখ নেই। অর্থই জীবনের একমাত্র গ্যারাণ্টি।

চুপ কর। শীলা উঠে দাঁড়ল, আমি এখন সাঁতার কাটব। ভাল কথা বন্ধু। যাইহোক, এ তোমার আমার কবরের পরোয়ানা। তবে স্যামের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ আমি করবই না। মাসে তিন কি চার দিন তার শয্যাসঙ্গীনী হতে হয় আমাকে, আর মাসের বেশীরভাগ সময় আমি আমার পছন্দ মত যে কোন পুরুষের কাছে দেহভাসিয়ে দিতে পারি।

সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ী ফিরল শীলা। লিজা তখন ডাইনিং টেবিলে নৈশ-ভোজ সাজানর ব্যবস্থা করছিল।

তোমার কাজ শেষ হলে তোমার ছুটি, তুমি চলে যেতে পার, শীলা বলে আমি এখন বাথরুমে চললাম।

আধঘণ্টা ধরে প্রসাধনে ব্যস্ত রইল শীলা। চোখে নকল ভ্রু প্লাক করতে গিয়ে লিজার গাড়ী চালিয়ে চলে যাওয়ার যান্ত্রিক আওয়াজ তার কানে ভেসে এল। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শীলা। সে তখন বাড়ীতে একা, ঠিক এই রকমটিই চাইছিলাম।

রাত ঠিক ন'টায় লুকান তার ভাড়া করা মার্সিডিজ ২০০ এম-এল গাড়ী চালিয়ে এল। শীলা তার অপেক্ষা করছিল। তারই নির্দেশে লুকান গ্যারেজ

তার ভলভো গাড়ীর পাশে গ্যারাজ করে রাখল তার গাড়ীটা।

বাড়ীর চারপাশ গাছ-গাছালিতে ঘেরা। লুকানের আগমন প্রতিবেশীদের দেখার ভয় নেই।

শনিবারের রাত লুকানোর সঙ্গে শীলার জীবনে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। জীবনে এই প্রথম একজন পুরুষ তাকে বিছানায় সুখের চূড়ান্ত সীমানায় নিয়ে গিয়ে তুলে ছিল। শীলার কাছে তার যৌন কলা-কৌশল এল-এস-ডির থেকে আরো বেশী উত্তেজনাপূর্ণ, আরো বেশী সুখবর বলে মনে হয়েছে।

শীলা তার নগ্ন দেহটা সম্পূর্ণ রূপে সঁপে দিয়েছিল। নিপুন কারিগরের মত সে তার দেহের প্রতিটি গোপন অঙ্গে সুখের মিনার গেঁথে দিয়েছিল এক এক করে। অবশেষে শীলা তার সব অত্যাচার সহ্য করেছিল। এ রকম দৈহিক অত্যাচারই সে চায় প্রতি রাতে, প্রতি শয্যায়। এক বার নয় বার বার।

পরদিন সকাল সাড়ে এগারটায় গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে লুকানকে পোষাক পরতে দেখে শীলার হুঁস হল সেদিন রবিবার।

শনিবার রাতের সুখস্বপ্নের রেশ তখনো লেগেছিল তার সারা দেহমনে। তখনো চাদরের নিচে শুধু তার নগ্নদেহ। তখনো সে পূর্ণ উত্তেজনা নিয়ে লুকানের সঙ্গ কামনায় উদগ্রীব হয়েছিল। সেই লুকানকে চলে যেতে দেখে আহত হল শীলা।

এখুনি তোমার তো চলে যাওয়ার কথা ছিল না প্রিয়তম?

হ্যাঁ প্রিয়তমা, শহরে আমার একটা ডেট আছে।

কিন্তু আজ তো রবিবার।

তা বটে। এসব মানুষের রবিবার বলে কিছু নেই। লুকান গলায় টাই আঁটতে আঁটতে বলে, তার ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি।

শীলা তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বলল, একটু বস, আমি তোমার জন্য কফি তৈরী করে আনছি, গায়ের উপর থেকে চাদরটা সরাতেই তার নগ্নদেহটা লুকানের চোখের সামনে ভেসে উঠল। শীলার চোখে কামনা ধিক্ ধিক্ করে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে লুকান নিজেকে সংযত করে রাখল, কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ করল না তখন। অথচ কে বলবে, গতকাল সারারাত ধরে শীলার নগ্ন দেহটা নিয়ে দামাল ছেলের মত দস্যুবৃত্তি করতে তার এতটুকু ক্লান্তিবোধ হয়নি, কিংবা অনীহা দেখায়নি। বলতে গেলে সারা

রাত ধরেই শীলার দেহটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তার কাছ থেকে কোন বাধা না পেয়ে। সব মেয়ের মতই ধর্ষিতা হতে চেয়েছিল শীলা। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে অবাক চোখে তাকিয়েছিল শীলা তার দিকে।

লুকানের দৃষ্টি এড়ায় না। বুদ্ধিমান যুবক সে। সে জানে তার কাছে শীলার প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি। তাই সে তার মন রাখতে তার সেই নগ্নদেহের দিকে তাকিয়ে বলে, কি সুন্দর তোমার ঐ দেহ। সুখ পেয়েছ তো?

তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না……তুমি পাওনি?

নিশ্চয়ই। পেয়েছি বৈকি।

লিজার সঙ্গে কফি তৈরী করতে গিয়ে লুকানের কথাভাবছিল শীলা। লুকানই তার জীবনে সত্যিকারের পুরুষ। কাল যে সুখ সে দিয়েছে, তাতে মনে হয়, সে ই তার প্রকৃত প্রেমিক। এমন প্রেমিক কে সে কিছুতেই হারাতে চায় না। সোমবার সকাল পর্যন্ত সে তার কাছে থাকতে পারছে না শুনে একটু আহত হয়েছিল শীলা। যাইহোক, আসছে শনিবার তারা কোন এক হোটেলে গিয়ে সারারাত ধরে স্ফূর্তি করবে। তার পরের শনিবার লিজার ছুটি, সেই শনিবার আবার সে তার বাড়িতে লুকানকে আহ্বান করবে।

ওদিকে বসার ঘরে পায়চারি করতে করতে পেরীর সংগৃহীত মূল্যবান জিনিসগুলো লুকান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। একসময় তার নজরে পড়ল ষষ্ঠ জর্জের প্রতিকৃতি আঁকা একটা সোনার নস্যিরকৌটো। বিয়ের প্রথম মাসে পেরী সেটা কিনে নিয়ে এসে শীলাকে বলেছিল, দেখ, কয়েক বছর পরে এর দাম আজকের থেকে বহুগুণ বেড়ে যাবে। শীলা তখন তার কথায় কান দেয়নি। বিয়ের প্রথম মাস থেকেই পেরীকে এবং পেরীর পছন্দকে সে অবজ্ঞা করে এসেছে।

আহ, খুব সুন্দর কফি তৈরী করেছে তো। লুকান বলে প্রিয়তমা আমার কি মনে হয় জান? পৃথিবীর এক অন্যতমা সুন্দরী তুমি।

শীলার মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, দেহমিলনে লিপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার কেঁপে ওঠে। কামার্ত গলায় সে বলে, আরও কিছু সময় থেকে যাও জুলিয়ানা আমার একান্ত অনুরোধ, এখুনি যেও না তুমি।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে হাসে জুলিয়ান লুকান, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমাকে যেতেই হবে।

তাহলে কখন আবার ফিরে আসছ ?

আপাততঃ নয় ; এ সপ্তাহটা আমি খুবই ব্যস্ত থাকব। পরে ভেবে দেখব। তবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের ফিরে আবার যোগাযোগ হওয়ার কোন সম্ভাবনা তো দেখতে পাচ্ছি না। সময় পেলে যদি আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করি—

কিন্তু জুলিয়ান, মনের দিক থেকে আমার জন্য তুমি কি কোন তাগিদ অনুভব কর না ?

নিশ্চয়ই, করি বৈকি ! তেমনি হাসতে হাসতে হঠাৎ জুলিয়ানের মুখটা কেমন কঠিন হয়ে ওঠে। চলে যাওয়ার আগে আমার পারিশ্রমিকটা নিয়ে যেতে চাই।

অবাক চোখে জুলিয়ানের দিকে তাকায় শীলা, তার মানে কি বলতে চাও তুমি ?

জুলিয়ানের ঠোঁটে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়। শোন সুন্দরী, বাইরের পুরুষকে রাতে তোমার বিছানায় শোবারজন্য আহ্বান জানাতে পার, আর এটুকু জাননা, বিনা পয়সায় কোন কিছু আশা না করে তোমার সঙ্গে আমি রাত কাটাব, এ তুমি কি করে ভাবলে ? আমার পৌরুষ তোমার নারী-ত্বকে দারুণ ভাবে নাড়া দিয়েছে, বল দেয়নি ? বল, আমার সঙ্গ তুমি উপভোগ করনি ?

তার মানে, তুমি টাকা চাইছ ? শীলা খিঁচিয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, এবার পাঁচশো ডলারের চুক্তি করা যাক, আগের মত হাসে লুকান, কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা তার দৃষ্টি। একটা সম্পূর্ণ রাতের জন্য আমি সাধারণতঃ এক হাজার ডলার চার্জ করে থাকি, কিন্তু তোমার বেলায়—

বেরিয়ে যাও। শীলা এবার চিৎকার করে ওঠে, বেরিয়ে যাও। তা না হলে আমি এখুনি পুলিশ ডাকব। শয়তান, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ ?

সে তো খুব ভাল কথা সুন্দরী, প্রত্যুত্তরে বলল সে ডাক পুলিশকে, আগামী কাল খবরের কাগজে সেটা হেডলাইন হয়ে যাবে। তোমার স্বামী এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবরটা খুব মুখরোচক হবে বলেই মনে হয়, সেই সঙ্গে তোমার মেয়ে বন্ধুরাও বেশ উপভোগ করবে। ডাক, পুলিশকে ডাক।

শীলা এবার ভয়ে কুঁকড়ে গেল। হায় ঈশ্বর, সে কি বোকামোই না করেছে

পেত্নীকে সে তোয়াক্কা করে না ঠিকই। কিন্তু সে তার মেয়ে বন্ধুদের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাবে কি করে? মুখ বদলানোর জন্য তারা পরস্পর পরস্পরের স্বামী বদল করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এইনিয়ে কেউ কোনদিন ঝামেলায় পড়েনি। তার আজকের এই ব্যাপার নিয়ে আসন্ন খোস গল্পের কথা আন্দাজ করতে পারছে এখুনি সে। এরপর সে লজ্জায় ক্লাবে মুখ দেখাতে পারবে না।

শীলাকে চুপ করে থাকতে দেখে লুকান তাড়া দেয়, তাড়াতাড়ি কর সুন্দরী, তোমার মত আর একজন সুন্দরী আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

তারা পরস্পরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে, লুকান হাসে।

তবে তোমার আতিথেয়তা আমার মনে থাকবে। রাতের নৈশভোজটা ভালই হয়েছে। ঠিক আছে, এবারের মত তোমাকে রেহাই দিয় গেলাম। তুমি যখন আবার গরম হবে, আমাকে ডেকো, বিদায় সুন্দরী, বিদায়। তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ওদেস্টন হাউসের বিপরীত দিকে টেড ফ্লিচম্যান তার গাড়ীর ভিতরে বসেছিল। এফ ২০০ মিমিমিটার লেন্স সহ নিকন ক্যামেরা হাতে তারা সূর্যের আলোয় বেরিয়ে আসা মাত্র দ্রুত পর পর তিনটি শট নেয় সে। তারপয় ক্যামেরাটা পিছনের সীটে রেখে দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে এল সে এবং দ্রুত লুকানের দিকে এগিয়ে গেল। সে তখন শীলার গ্যারাজ থেকে তার গাড়ী বার করছিল।

হাই লাকী, ফ্লিচম্যান তার পরিচয় পত্রটা ওয়ালেট থেকে বার করে তার সামনে মেলে ধরে, ঝামেলা করবেন না, জায়গাটা ভাল নয়। ভালয় ভালয় সুবোধ বালকের মত জিনিসটা আমার হাতে তুলে দিন।

আপনি কি বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না, জানার ভান করে লুকান।

মিথ্যে আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। আপনার আর একজন মক্কেল অপেক্ষা করছে। আপনার অমন সুন্দর মুখের ভুগোল যদি না পাল্টাতে চান তো তাড়াতাড়ি ওটা আমার হাতে তুলে দিন।

আপনার হাতে কি তুলে দেব? লুকাস কৈফিয়ত চাইল, কি ব্যাপারে আপনি কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওভাবে আমাকে ধোঁকা দেবেন না। কেম মিসেস ওয়েস্টন আপনাকে

টাকা দেননি তার শয্যাসঙ্গী হওয়ার জন্য ? আমি আপনার বিজনেস বেশ ভাল করেই জানি। ভালয় ভালয় টাকাটা আমার হাতে তুলে দিন, তা না হলে আমি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব।

এর আগে সিকিউরিটি গার্ড'রা তাকে দু' একবার বেকায়দায় ফেলেছিল। সে জানে এদের বেশি ঘাঁটালে অসুবিধায় পড়তে হয়। তাই সে ঝামেলা না বাড়িয়ে পকেট থেকে পেরীর সোনার ষষ্ট জর্জের প্রতিকৃতি আঁকা নস্যির কৌটো বার করে ফ্লিচম্যানের হাতে তুলে দিতে যায়।

ফ্লিচম্যান প্রস্তুত হয়েই ছিল। তাড়াতাড়ি একটা ছোট প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ তার দিকে এগিয়ে দেয় সে।

এর মধ্যে ওটা ফেলে দিন, সে বলে, তাহলে ওটা থেকে আপনার হাতের ছাপ পেতে কোন অসুবিধা হবে না। কোন রকম চালাকি করবেন না। আমার কথার অবাধ্য হলে আপনার পরিবারের সুখ-শান্তি নষ্ট করে দেব বুঝলেন।

লুকান তখন বুঝে গেছে ফ্লিচম্যানের মত লোকের সঙ্গে চালাকি করে লাভ হবে না। তাই সে বাধ্য ছেলের মত তার প্ল্যাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ফেলে দেয় নিঃশব্দে।

ঠিক আছে লাকী, এখন আপনি যেতে পারেন। তবে ফের যদি এই জায়গায় আপনাকে দেখি, তখন আপনাকে পুলিশ হাজতে পাঠান ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না।

লুকান তার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। মুহূর্তে সেখান থেকে উধাও হয়ে যায় অতঃপর।

ওদিকে পেরীর তখন হুঁস ফিরে আসে, বুঝি বা একটু তন্দ্রা এসেছিল। প্রথমে তার খেয়াল হল না কোথায় সে; তারপর সে উপলব্ধি করল, তার ভাড়া করা টয়োটা গাড়ীর মধ্যে বসে আছে এবং গাড়ীর ছাদে তখনো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

স্কচের নেশাটা আজ একটু বেশী হয়ে গেছে, ভাবল সে। ড্যাশবোর্ডের ঘড়িতে চোখ পড়তেই সে দেখল, দশটা পাঁচ।

বৃষ্টির মধ্যে আবার গাড়ী চালাতে শুরু করল সে হেড লাইট জ্বালিয়ে। হাইওয়ের রাস্তা। ফিশিং লজ এখনো দশ মাইল বাকী। ওদিককার রাস্তাটা

ভাল নয়, আজকের রাতটা জ্যাকসনভিলেয় কাটালে ভাল হয়। গ্লোব কম্পার্টমেণ্ট থেকে ব্যালানটাইনের বোতলটা বার করে গলায় ঢালল। সে ঢকঢক করে। বোতলটা রেখে এবার সিগারেট ধরাল সে। উইণ্ডশীল্ডের দিকে তাকিয়ে ঝরা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সে তখন ভাবছিল, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, মাথার ঠিক থাকছে না, পরে তার ব্রেনটা একবার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।

বছর তিন হল সে তার ফিশিং লজে যায়নি। তবে শেরীফ পত্নী মেরী রোজের সঙ্গে তার বন্দোবস্ত ছিল, ফিশিং লজের উপরে নজর রাখার জন্য। ফ্রীজে অনেক খাবার রান্না আছে। ক্ষুধার্ত সে। ফ্রীজের খাবার সদ্ব্যবহার করা যাবে। শেরীফ রোজ তার প্রিয় বন্ধু। মেরী নিশ্চয়ই ফিশিং লজ পরিষ্কার করে রেখেছে।

এক সময় শীলার কথা মনে পড়ল তার। তাহলে তার অনুপস্থিতিতে শীলা তার থেকে বয়সে ছোট যুবকদের সঙ্গে দৈহিক সুখে লিপ্ত হয়ে থাকে। মিলাজ এস, হার্ট কখনো অবান্তর মন্তব্য করে না। কিন্তু তাতেই বা কি। শীলার বয়স হলে সে নিশ্চয়ই তার প্রতি মনোযোগ দেবে। সুখ নামে পাখীটা তখন নেমে আসবে তাদের সংসারে।

সাধারণতঃ এ সময় হাইওয়ের রাস্তা ট্রাক এবং গাড়ীতে ভর্তি থাকে। কিন্তু আজ ঠিক মরুভূমির মত। আর মাত্র দশমাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। স্কচের নেশাটা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। পেরী একটু ধীরে নিজের মনে বলল সে। বৃষ্টির ঝাপসা সরাতে ওয়াইপার ব্লেড চালু রেখেছিল সে। হঠাৎ সামনে লাল আলোর সংকেত দেখে গাড়ীর গতি তাকে কমাতে হল।

তবে কি কোন দুর্ঘটনা ঘটল? গাড়ী থামাতে হল। হেড লাইটের আলোয় একটা ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। তার মাথায় জলসিক্ত স্টেটসন টুপি, গায়ে হাইওয়ে প্যাট্রল অফিসারের হলুদ রঙা বর্ষাতি। হে যীশু। পুলিশের লোক তাকে মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালাতে দেখলে আর রেহাই নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকল সে।

লোকটা কাছে এসে লাল আলো ফেলল তার মুখের উপরে সেই লাল আলো পিছনের আসনে চকিতে ঘুরে গেল, যেন সে সন্ধান করতে চাইছে গাড়ীর মধ্যে অন্য আর কোন আরোহী আছে কিনা।

লোকটার দিকে মুখ না তুলেই অপরাধীর মত পেরী জিজ্ঞেসা করল, কি অসুবিধা আপনার ?

আমার গাড়িটা রাস্তায় বিকল হয়ে পড়েছে, আগন্তুক তার দিকে ঝুঁকে বলে স্টেটসন হাটের তলায় তার মুখটা অনেকটা ঢেকে গেছে. ভাল করে চেনা যায় না, এখুনি আমাকে টেলিফোন করতে হবে। তা আপনি কোন দিকে ?

বর্কভিলে। সেখান থেকে মাইল দশ হবে আমার একটা ফিশিং-লজ আছে। পেরী বলে, আপনি আমার ফোন ব্যবহার করতে পারেন।

ধন্যবাদ, আগন্তুক পিছনের দরজা খুলে যাত্রী-আসনে বসে পড়ল।

কি দুর্যোগের রাত্রি, গাড়ীতে স্টার্ট দিতে গিয়ে পেরী অস্ফুটে বলে।

তা যা বলেছেন, যত সই ভাবে বসে আগন্তুক বলে, এবার যাওয়া থাক তাহলে।

তিন

শেরীফ রোজের গাড়ীতে বসে বেতার মারফত কার্ল জেনারের সঙ্গে কথা বলছিল হোলিস।

তার মানে তুমি বলছ, এই বাস্টার্ড যুবকটা ম্যাসনকে খুন করেছে ?

হ্যাঁ স্যার; সে মৃত। তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। ঘটনাস্থলে একটা অস্ত্র পাওয়া যায়। কুঠার। বাকী সবাই একই ভাবে খুন হয়েছে। ডিমের খোলার মত তাদের মুখের চোয়ালগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। মাথায় স্টেটসন টুপি থাকার দরুন ম্যাসন কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল। খুনের ধরন দেখে মনে হয়, খুনী ষাঁড়ের মত শক্তিশালী।

কি আশ্চর্য, একরাতে ছ' ছ'টা খুন ? চমকে উঠে জেনার বলে, এই জানোয়ারটা যত দিন থাকবে কারোর পক্ষেই নিরাপদ নয়। যাইহোক, হোলিস, তুমি যেন কোন কিছুতে হাত দিও না। হোমিসাইড স্কোয়াড তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্ট করছে। লুইস এবং জ্যাকসন তোমার কাছে এলে হাইওয়েতে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তাদের বল, তারা যেন মিয়ামির দিকে এগোয়। স্টেট পুলিশ সারা রাস্তা ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে, কিন্তু বড় বাধা হল বৃষ্টি।

ও-কে স্যার, হোলিস বলে, আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাব। তারপর সে বেতারের সুইচটা বন্ধ করে দিল।

মিনিট খানেক পরেই একটা গাড়ী তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল সে, হেডলাইটের আলোগুলো জ্বলজ্বল করছে। গাড়ীর চালক লুইস জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে হোলিসের গাড়ী অতিক্রম করার সময়।

বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ ছাপিয়ে হোলিসের কণ্ঠস্বর রাত্রির অন্ধকারে গমগম করে উঠল তখুনি, হাইওয়ের পথে মিয়ামির দিকে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম হয়েছে তোমাদের। খুনীর গাড়ী তোমাদের ধরতেই হবে। মনে হয়, ঐ পথেই পালাচ্ছে সে। তার মাথায় স্টেটম্যান টুপি, গায়ে হলুদ রঙের বর্ষাতি, ম্যাসনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই সঙ্গে ম্যাসনের ফোর্ড গাড়ী ব্যবহার করেছে

সে, গাড়ীর নম্বর এক্স, ওয়াই, জেড ৩০০২ লক্ষ। লক্ষ্য রাখ সাবধান, ম্যাসনের রিভলবারটারও হস্তগত করেছে সে।

এই জল—কাদায় কি যে করি। প্রত্যুত্তরে লুইস বলে, যাইহোক, আমরা আমাদের সাধ্যমত করে যাব।

শেরীফ রোজের বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে! লবিতে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হোলিসের।

এখানে আমার আর করার কিছু নেই, বিষন্ন গলার সে বলে, আমার মনে হয়, এখন আমার অফিসে ফিরে যাওয়াই ঠিক হবে।

কিন্তু আপনার বেতার যন্ত্রটা যে আমার দরকার, সে বলে, এ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, তারপর না হয় ওদের সঙ্গে যাবেন।

রোজ আবার চেয়ারে বসে পড়ে বলে, অন্য কিছু ভাবছি না, শুধু ম্যাসনের কথা ভাবছিলাম আমি। নিজের ছেলের মত স্নেহ করতাম তাকে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না, সে মৃত।

হোলিস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে পাশে বসার ঘরে চলে গেল।

দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল ডেভিস, তার দৃষ্টি পড়েছিল তিনটি মৃতদেহের উপরে।

এখানকার কোন কিছু আমদের স্পর্শ করা ঠিক হবে না, হোলিস তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, হোমিসাইডের লোকে আসছে। খুনী হয়ত তার আঙুলের ছাপ রেখে গেছে, পেলেও পাওয়া যেতে পারে। জেনারের অন্তত সেই রকমই অনুমান।

সত্যিই সে একজন স্মার্ট—গর্দভ ডেভিস বিরক্ত হয়ে বলল৷ এখন আমাদের প্রধান কাজ হল, খুনীকে ধরা। ম্যাসনের রিভলবারটা নাকি তার কাছে. চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়া যাক!

লবিতে তারা দুজনে শেরীফের সঙ্গে যোগ ছিল।

খুনীকে তোমাদের ধরতেই হবে, রোজ মুখ না তুলেই বলে৷ লস পরিবার এবং টম আমার সত্যিকারের বন্ধু। এসব কি ঘটছে? আর জানাইবার কি করছে বুঝতে পারছি না।

যারা স্টেট সতর্কিত, হোলিস বলে, ইতিমধ্যে স্টেট পুলিশ অনুসন্ধানের কাজে নেমে গেছে! আগামীকাল ন্যাশনাল গার্ডও যোগ দিচ্ছে। বেতারে প্রতিটি মোটর চালককে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক, তোমাদের

কাজে আমার আস্থা আছে, রোজের সাদা মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়, তবু তোমরা যদি একান্তই তার সন্ধান না করতে পার, শেষ চেষ্টা আমাকেই করতে হবে।

নিশ্চয়ই শেরীফ, বৃদ্ধের মনের অবস্থার কথা ভেবে হোলিস বলে আপনি কোন চিন্তা করবেন না, যত শীগগীর সম্ভব আমরা তাকে ধরবই। যদিও সে জানে, খুনী এতক্ষণ মিয়ামি ছাড়িয়ে শেরীফের এলাকা পেরিয়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে।

টমের মাকে দুঃসংবাদটা দিতে হবে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে রোজ কোন রকমে কথাটা বলে দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকে।

বাইরে তখন বৃষ্টির ধারা বয়ে চলেছে এক নাগাড়ে।

পেরী ওয়েস্টন গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বলে, মাইল খানেক পরে বাঁ দিকের রাস্তাটাই ফিশিং-লজে যাওয়ার পথ। একেই শুকনো অবস্থায় ওখানকার রাস্তা অত্যন্ত খারাপ, জানিনা এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে কি অবস্থা হয়েছে।

গায়ে হলুদ রঙের বর্ষাতি, মাথায় স্টেটসন টুপি পরিহিত আগন্তুক তার পাশে বসে নীরবে তার কথা কেবল শুনে যায়, কোন মন্তব্য করে না।

আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না, পেরী আবার নিজের থেকেই বলে, মাঝ পথে কোন প্যাট্রল অফিসারের গাড়ী থামিয়ে বেতার মারফত আপনি আপনার খবরটা পাঠিয়ে দিতে তো পারেন।

না, আমি সরাসরি ফোন করতে চাই। আগন্তুক বলে।

তাহলে কাছেই শেরীফের অফিস, সেখানে ফোন আছে।

পেরী বলে, আপনি সেখান থেকেও ফোন করতে পারে।

আপনার ফোনই যথেষ্ট লোকটার শুষ্ক কঠিন আওয়াজ তার কানে কেমন বেসুরো শোনাল।

ঠিক আছে তাই হবে, বাঁদিকে গাড়ী ঘোরাতে গিয়ে পেরী বলে, রাস্তা খুবই খারাপ সাবধান।

লোকটা এবার কিছু বলল না। পেরীর মনে কেমন যেন খটকা লাগল। লোকটা পাগল নাকি? স্রাগ করল সে।

ফিশিং-লজ পর্যন্ত পাঁচ মাইল বালি আর কাদার পথ। কি মনে করে পেরী তাকে বলে, এই দুর্যোগের রাতটা আপনি ইচ্ছে করলে আমার ফিশিং-লজে থেকে যেতে পারেন। জায়গাটা বেশ সাজান-গোছান। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। অবশ্য আপনি আপনার গাড়ীতে ফিরেও যেতে পারেন।

আমার গাড়ীর কথা ছেড়ে দিন। অচল গাড়ী তার জন্য এত চিন্তা কিসের? ব্রেক-ডাউন ভ্যান পাঠানর জন্য ফোনে খবরটা দিয়ে আপনার লজেই আজকের রাতটা কাটিয়ে দেব ভাবছি। সাবধানে গাড়ী চালান, সত্যি রাস্তা খুব খারাপ দেখতে পাচ্ছি।

আর বেশী সময় লাগবে না, পেরী তাকে ভরসা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, তা আপনার নামটা এখনও পর্যন্ত জানা হল না তো।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করে লোকটা বলে, আমাকে জিম বলে ডাকতে পারেন।

শুধু জিম, আর?

আবার খানিক নীরবতা, ব্রাউন।

ও, কে, জিম ব্রাউন। আমি পেরী ওয়েস্টন।

গাড়ী চালানর দিকে লক্ষ্য রাখুন, জিম ব্রাউন নামে লোকটা তাড়াতাড়ি সতর্ক করে দেয়।

হায় ভগবান! একি বৃষ্টি, যেন আকাশ ফুটো করে ঝরে পড়ছে। হেড-লাইটের তীব্র আলোয় জিম ব্রাউন জানালার উপরে ঝুঁকে পড়ে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখে একটা ছোটখাটো ব্রীজ, ব্রীজের নিচে জল থৈ-থৈ। হঠাৎ সে চিৎকার করে ওঠে, সাবধান। আপনার ডানদিকে—

তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। সেই মুহূর্তে পেরী দেখে বৃষ্টির জলে এবং কাদায় সামনে একটা বিরাট পুকুর সৃষ্টি হয়ে গেছে। তার গাড়ীর সামনের চাকা দুটো অতিক্রম করলেও পিছনের চাকা দুটো আটকে গেল। গাড়ীর ইঞ্জিন সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।

হায়! পেরী মাথায় হাত দিয়ে বসে, আমরা এখন জলবন্দী।

আমি তো তখনি বললাম—আপনার ডান দিক ঘেঁষে গাড়ী চালান— বিরক্ত হয়ে সে বলে।

এই বৃষ্টিতে চোখের দৃষ্টি কারই বা ঠিক থাকতে পারে বলুন। পেরী উত্তরে বলে, এখন আর কোন উপায় নেই ক্রেনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া।

আমার ধারণা, এখান থেকে গাড়ীটা আমি বোধ হয় সরাতে পারব। দেখাই যাক না কেন ?

লোকটা মনে মনে গজ গজ করতে করতে বৃষ্টি মাথায় করে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াল। তার সঙ্গে পেরীও চালকের আসন ছেড়ে গাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বর্শার ফলার মত তার গায়ে বিঁধতে থাকে।

গাড়ীর পিছন দিকে জল-কাদায় দাঁড়িয়ে পেরীকে উদ্দেশ্য করে ব্রাউন বলে, গাড়ীটা অনায়াসে আমি এই জল-কাদা থেকে সরাতে পারব।

বেশ তো, আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করব বলুন ? পেরী অসহায়-ভাবে বলে, আপনার সঙ্গে আমিও কি হাত লাগাব ? না, আমি একাই পারব। আপনি বরং গাড়ীতে উঠে ইঞ্জিন চালু করে দিন। আমি যখন গাড়ীটা পিছন দিক থেকে তুলে ধরব, আপনি তখন গিয়ার চালু করে সামনের দিকে এগোতে থাকবেন, বুঝলেন ?

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ীর পিছন দিকের বাম্পার তুলে ধরে। অবাক হয়ে সেই অভাবনীয় দৃশ্যটা দেখে পেরী।

আপনি একা কখনোই গাড়ীটা এক চুলও নড়াতে পারবেন না, পেরী মৃদু চিৎকার করে বলে উঠে, আমাকে সাহায্য করতে দিন।

আপনাকে ভাবতে হবে না। গাড়ীতে উঠে যা বললাম তাই করুন, লোকটা এবার চিৎকার করে ওঠে, শুয়োরের বাচ্চাকে আমি একাই নড়াতে পারব।

লোকটা স্বেদী বটে! ভাবল পেরী। এই জল-কাদায় গাড়ীটা সে একাই নড়াতে চায়, অসম্ভব।

হ্যাঁ, সেই অসম্ভব জিনিসটাই সম্ভবপর করে তুলল লোকটা। তার আগে ব্রাউনের হুকুম মত গাড়ীতে উঠে বসে ইঞ্জিন চালু করে রেখেছিল সে। পিছন দিক থেকে গাড়ীটা তুলে ধরতেই পেরী গিয়ার বদলাল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

নিজের চোখে দেখেও পেরী বিশ্বাস করতে পারে না। এ কি করে সম্ভব ? ব্রেক ডাউন ট্রাকের মতই লোকটা তার গাড়ীটা তুলে ধরে। এত ভারী গাড়ীটা কোন মানুষ যে তার হাত দিয়ে তুলে ধরতে পারে, এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার! মনে হয়, ষাঁড়ের শক্তি আছে তার দেহে ভাবল পেরী। সে জানত না, বেতার মারফত জেনারেল কাছে খুনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে হোলিসও ঠিক এই ধরনের বিশেষণ ব্যবহার করেছিল।

ব্রাউন গাড়ীতে ফিরে এসে বলে, আমাদের পথ এখন পরিষ্কার, এবার আমি গাড়ী চালাব, সরে বসুন।

আপনি রাস্তা চেনেন না, পেরী বাধা দিয়ে বলে, কি করেই বা গাড়ী চালাবেন বলুন ?

সরে তো বসুন। চালকের আসনের দরজা খুলে এক রকম জোর করে পেরীকে যাত্রী আসনে সরিয়ে দিয়ে সে চালকের আসনে বসে পড়ল।

লোকটা গাড়ী চালাতে শুরু করলে পেরী ভাবল, এ ভালই হল, বর্ষার রাত্রে এমন বাজে রাস্তায় সে গাড়ী না চালিয়ে ভালই করেছে। এবার সে ড্রিঙ্ক করার জন্য মনোনিবেশ করল। গ্লোব কম্পার্টমেণ্ট থেকে স্কচের বোতল বার করল।

ড্রিঙ্ক করবেন জিম ?

আমি ড্রিঙ্ক করি না।

ঠিক আছে, সিগারেট অন্তত খাবেন তো ?

না, আমি ধূমপানও করি না।

অগত্যা স্কচের বোতল খুলে একাই ড্রিঙ্ক করতে শুরু করল পেরী। বর্ষার রাত্রে স্কচের নেশাটা বেশ ভালই জমবে। ব্রাউন নিপুণ হাতে গাড়ী চালাচ্ছিল। এই প্রথম পেরী তাকে ভাল করে দেখল। যদিও ড্যাশবোর্ডের সামান্য আলোয় তার স্টেটসন টুপির আড়াল থেকে মুখের খুব সামান্য অংশই চোখে পড়ছিল। হাত দুটো খুব লম্বা এবং বেশ শক্ত সমর্থ।

লোকটার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে সে তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি অনেক দিন ধরে হাইওয়ে প্যাট্রলে আছেন ?

অনেকক্ষণ পরে ব্রাউন বলে হ্যাঁ, দীর্ঘদিন মনে করতে পারেন। এই তো খুব ভাল উত্তর হয়েছে। আমি সব সময় নিজের পেশার কথা খোলাখুলিভাবে বলে থাকি। এই ধরুন না, আমি একজন চিত্রনাট্যকার। পেরী সহজভাবে পিছনে হেলান দিয়ে বসল, তা আপনি কি বিবাহিত ?

না।

যেভাবে এমন একটা ভারী গাড়ী আপনি তুললেন, তা আপনি কি ভারোত্তোলনকারী ? অবসর সময়ে অভ্যাস করেন ?

ব্রাউন কোন কথা বলল না।

রাস্তার অবস্থা উন্নতির দিকে, তাই সে গাড়ীর গতি দিল বাড়িয়ে।

আপনি আমার ছবি দেখেছেন ? পেরী জিজ্ঞেস করে, দ্য গান জুয়েল। এ ছবির চিত্রনাট্য আমারই লেখা।

না, আমি সিনেমা দেখি না।

লোকটা, পেরী ভাবে, সত্যিকারের চোখস। মদ খায় না, ধূমপান করে না, এমনকি সিনেমাও দেখে না। তাহলে করে কি লোকটা ? তাহলে পুলিশের ডিউটির ফাঁকে আপনি কি করে থাকেন, তা তো বলবেন ?

বক বক করা বন্ধ করুন তো ! ধমকের সুরে সে বলে, দেখছেন না আমি গাড়ী চালাচ্ছি।

ও. কে., আমি দুঃখিত, লজ্জিত হয়ে পেরী আর একটা সিগারেট ধরাল।

পরের কুড়ি মিনিট তারা গাড়ী চালিয়ে এল। তারপর এক সময় পেরী বলে, এবার ডানদিকে ঘুরলেই আমার ফিশিং লজ।

অবশেষে তারা ফিশিং লজে এসে উপস্থিত হল। পেরী তখন ভাবছিল সে গাড়ী চালালে এই অবশিষ্ট পথটুকু আসতে গিয়ে তাকে কতবার যে থামতে হত কে জানে। গাড়ী থেকে ব্রাউনকে জানাতে গিয়ে সে বলে, আপনি অবশ্যই চমৎকার কাজ করেছেন।

তারপর তারা যে যার ভিজে বর্ষাতি এবং পোষাক গা থেকে খুলে নামিয়ে রাখতে থাকে। ব্রাউনের মাথায় তখন স্টেটসন টুপি নেই, নেই গায়ে হলুদ রঙের বর্ষাতি। পেরী অবাক হয়ে তার বলিষ্ঠ চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার সমানেই ব্রাউনের দেহের উচ্চতা। তবে ব্রাউনের কাঁধ অনেক চওড়া তার থেকে। প্রথম দর্শনে মনে হয়, লোকটা যেন একটা আস্ত পাথরের চাঁই, ধনুকের মত দীর্ঘ বাঁকান দেহ, লম্বাটে পা, শক্ত মোটা হাতের কব্জি। এক কথায় দৈত্যের মত চেহারা যাকে বলে।

তার কোমর-বন্ধনীতে একটা রিভলবার ঝুলে থাকতে দেখল পেরী। হ্যাঁ পুলিশের মতই চেহারা বটে। কিন্তু—

পেরী আবার তার পোষাকের দিকে লক্ষ্য করে একথাও ভাবল, পুলিশের লোক হয়ে কেনই বা সে নোংরা সাদা সার্ট এবং কালো রঙের জিনস পরতে যাবে ? দরজা খুলে বসার ঘরে প্রবেশ করতে গিয়ে সে তার চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। আসুন জিম, ঘরের আলো জেলে পেরী তাকে আহ্বান করে বলে, আপনি হয়ত পোষাক বদলাতে চাইবেন। তার ব্যবস্থাও আমি করে দিতে পারি।

ওদিকে ব্রাউন তখন ছিমছাম সাজান-গোছান ঘর দেখে অবাক হয়ে যায়। অনেকক্ষণ কথা বলে না। তারপর পেরীর দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি দেখছি খুব আরামে থাকেন।

এ আর এমন কি, মৃদু হেসে পেরী বলে, এবার বাথরুমে ঢুকে হাত মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করুন। তারপর আমি আপনার পোষাক এবং খাবারের ব্যবস্থা করছি, বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়, ভাল কথা, আপনি যে তখন কাকে যেন ফোন করতে চাইছিলেন, সে কথাটা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। ফোন করবেন তো ? আসুন আমার সাথে।

পরে ফোন করব, ব্রাউন বলে, আগে এই ভিজে পোষাকগুলো বদল করে নিই।

পেরী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে। বাঁ দিকের দ্বিতীয় ঘরটা আপনার, পেরী বলে, এবার আপনার পোষাকের ব্যবস্থা করতে হবে, এই বলে সে তাকে ছেড়ে শয়নকক্ষে গিয়ে ঢুকল।

অন্ধকার ঘর। আলো জ্বালাতেই ঘরটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল। ডবল-বেডেড খাট। অনেক আশা নিয়ে সে ঘর সাজিয়ে ছিল, শীলা এসে থাকবে এখানে তার সঙ্গে। কিন্তু ফিশিং-লজে আসতে চায় না শীলা ! খালি শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ভাবল সে। তারপর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আলমারি থেকে পোষাক বার করল। সেখান থেকে দ্বিতীয় শয়নকক্ষে প্রবেশ করল সে অতঃপর।

ব্রাউন দাঁড়িয়েছিল বিছানার সামনে।

পেরী তার হাতে পোষাকগুলো তুলে দিয়ে বলে, পাশেই বাথরুম। দেখুন পোষাকগুলো আপনার মানানসই হয় কিনা !

মানানসই হবে বৈকি ! বাথরুমের দিকে যেতে গিয়ে ব্রাউন বলে, চমৎকার পোষাক।

ফ্রীজে প্রচুর খাবার মজুত আছে, ভাবছিল পেরী বাথরুমে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে। মিলাজ এস, হার্ট নতুন লেখা চায়, সেক্স। প্যাশেন সব যেন থাকে সেই লেখায়। এখানে মাছ ধরতে ধরতে হার্টের ফরমাস মত গল্পের প্লট ভাবা যাবে'খন।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে তোয়ালে নিতে গিয়ে রেডিওর ঘোষকের কণ্ঠস্বর পেরীর কানে ভেসে আসল ········একটা জরুরী পুলিশী বার্তার জন্য নির্দিষ্ট

অনুষ্ঠান-সূচীতে বাধা সৃষ্টি করতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। জ্যাকসন ভিল থেকে মিয়ামি পর্যন্ত সমস্ত মোটর চালকদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে……

রেডিও ট্রানজিস্টারের স্যুইচটা বন্ধ করে দিল পেরী। এখন সে তো আর মোটরচালক নয়। সে এখন বাড়িতে ক্ষুধার্ত। সে জানতেও পারল না, হাইওয়ের প্যাট্রল অফিসারদের কাছে সেই খুনীকে ধরার জন্য কত না মাথা ব্যথা। এই মুহূর্তে পেরীর চিন্তা একটাই, কত তাড়াতাড়ি ক্ষুধা নিবারণ করা যায়। তাড়াতাড়ি গা মুছে শার্ট জিনস এবং লোফারস গায়ে চাপিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে বসার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমে যায় সে।

সেখানে ব্রাউনকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে পায়চারি করতে দেখল সে। দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায় সে। গরম জলে স্নান করে এসে তাকে এখন বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। তবে ব্রাউনের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার দরুণ তার পোশাক মোটেই মানায়নি, বিশেষ করে শার্টটা, খাটো দেখাচ্ছে অনেকটা। লোকটার বাঁ হাতের কনুইয়ের নিচে গোখরো সাপের উল্কিটা চোখে পড়ল পেরীর। তার চওড়া কাঁধের নিচে কার্টিজ বেল্ট এবং রিভলবারটা ঝুলে থাকতে দেখা গেল।

কেন জানিনা পেরীর হঠাৎ মনে হল, লোকটার একটা আলাদা চরিত্র আছে।

আপনি কি ক্ষুধার্ত? ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে পেরী তাকে জিজ্ঞেস করে, আমার তো খুব খিদে পেয়েছে। স্টিক আপনার কেমন লাগবে?

আমি ওসব ভালবাসি না, ব্রাউন এবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, যে কোন খাবার পেলেই আমার চলে যাবে। তবে তুমি খেতে পার বাস্টার্ড—

হঠাৎ পেরী উপলব্ধি করল, লোকটাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে সে। এখন তাকে রাতে আশ্রয় দিতে মন চাইছে না। কিন্তু কিই বা সে করতে পারত? হয়ত তাকে শেরীফের অফিসে নিয়ে যেতে পারত। তাহলে অন্তত তার হাত থেকে রেহাই পেত সে।

আমাকে 'বাস্টার্ড" বলে সম্বোধন করার অভ্যাসটা তোমাকে ছাড়তে হবে, পেরী রুদ্ধস্বরে বলে, আমার নাম পেরী ওয়েস্টন আগেই তোমাকে বলেছি, বুঝলে?

ব্রাউন তার দিকে দীর্ঘ সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। তার বরফঠাণ্ডা নীল চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায়। তারপর সে স্রাগ করে বলে, নিশ্চয়ই, আমার এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

তুমি না আমার টেলিফোন ব্যবহার করতে চাইছিলে? সময় কাটানর জন্য পেরী বলল—ইতিমধ্যে হয়ত হাইওয়ে প্যাট্রল গাড়ী এসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তখন সে তাদের হাতে লোকটাকে তুলে দিয়ে তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে।

ফোন? লোকটা বিকট হেসে বলে, ফোন তোমার বিকল, তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ বাস্টার্ড?

লোকটা আবার খিস্তি করল। তার সেই স্পর্ধা দেখে সত্যি সত্যি ভয় পেল পেরী। তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেল যেন। মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দোতলায় ছুটে গেল। এই প্রথম সে নিজেই ফোন করার তাগিদ অনুভব করল। কিন্তু একি! টেলিফোনের তারটা কাটা, ছিন্ন অবস্থায় ঝুলছে। টেলিফোনের সকেটটাও উধাও। আশ্চর্য!

দরজা বন্ধ করার তীব্র আওয়াজ তার কানে ভেসে আসে। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে সে তখন ভাবছে, মনে হয় কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। এই লোকটা কিছুতেই হাইওয়ে প্যাট্রল অফিসার হতে পারে না। তাহলে কে সে? পেরী এখন ভাবছে, বেতারের সেই সতর্ক বার্তাটা সম্পূর্ণ না শুনে কি ভুলই না করেছে সে। এমনও তো হতে পারে, এই লোকটার ব্যাপারে এই সেই সতর্ক বার্তা। আর তাই যদি হয়, তাহলে বেতারে ঘন ঘন সতর্ক-বার্তা পাঠানর সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার খিদে তখন মাথায় চড়েছে। সে তখন সমস্ত সম্ভাবনার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিন্তা করছিল। হয়ত টেলিভিসনেও অনুরূপ সতর্কতার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু টেলিভিসন সেটের কাছে গিয়ে সে দেখে যে, টি-ভি'র তার কাটা, সকেটটা ভাঙ্গা এবং প্লাগ উধাও। একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে উঠল। তখন তার সেই ট্রানজিস্টারের কথা মনে পড়ল, সেটা সে বাথরুমে ফেলে এসেছে।

দোতলায় শয়নকক্ষের ভিতর দিয়ে এ্যাটাচড্ বাথরুমে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে, কিন্তু কোথাও সে ট্রানজিস্টারের চিহ্ন দেখতে পেল না।

হে যীশু। সত্যি সত্যি একটা কিছু অঘটন ঘটতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। তার-পর টয়োটা গাড়ীর রেডিওর কথা মনে পড়ে গেল তার। আবার নিঃশব্দ পায়ে নিচে নেমে এসে গ্যারেজ করা টয়োটা গাড়ীর দরজা খুলতে যায় দ্রুত, কিন্তু সে দেখতে পায় দরজা বন্ধ এবং চাবি বেপাত্তা।

অতএব এখন এই আগন্তুকের হাতে বন্দী সে। বাইরের সাহায্য থেকে

সে বঞ্চিত। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বসার ঘরে এসে ঢুকল সে। স্কচের বোতল খুলে ঢক ঢক করে কয়েক পেগ গলাধঃকরণ করল।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি যেন। যে লোকটাকে সে তার বাড়তি শয়নকক্ষে আশ্রয় দিয়েছে, অবশ্যই ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক লোক সে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তার কাছে রিভলবার আছে। রিভলবার ছাড়া চেহারার দিক থেকেও দারুণ শক্তিশালী সে।

পেরী চেয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে এখন ভাবছে, শেষ হতে চলেছে সে। অভাবনীয় কিছু একটা না ঘটলে এ যাত্রায় আর রক্ষা নেই তার। স্কচের নেশায় চোখের পাতা দুটো তার এক হয়ে আসে।

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। আচ্ছা এই যে উত্তেজনা, এই যে জীবনের অনিশ্চয়তা, এ সব ঘটনা নিয়ে তার নাট্যরূপ দিলে মিলাজ এন, হার্টের মনপূতঃ হবে না? রক্ত, সেক্সপ্যাসন।

না, এতই বা ভয় কিসের? তার হাতে রিভলবার, সেটার ভয়ে এভাবে কুঁকড়ে গেলে চলে নাকি?

বাইরে থেকে বৃষ্টির শব্দ পেরী ওয়েস্টনের কানে এসে বাজছিল। শব্দটা অরণ্যে পাতা ঝরার শব্দের মত।

দূরভাষে কার্ল জেনারের সঙ্গে কথা বলছিল শেরীফ রোজ। তখন রাত তিনটে। তার মুখে হতাশার ভাব। পাশে বসেছিল ডঃ, ও লিয়ার, জ্যাকসন ভিলের মেডিক্যাল এগজামিনার। বেঁটে রোগাটে পঞ্চাশোর্ধ বয়স।

নৃশংসভাবে খুন হওয়া চারটি মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে উঃ, ও' লিয়ার বলেন, এমন বীভৎস খুন আগে কখনও দেখিনি।

রোজ কিছু বলল না। সে তখন টম ম্যাসনের কথা ভাবছিল। তার মা এবং বন্ধুদের খবর দিতে হবে।

এ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার রোজকে তার অফিসে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। মেরীকে সংক্ষেপে সেই বীভৎস ঘটনার কথা বলে রোজ ফোন করতে যায় ম্যানসনের মাকে।

বেচারীর রাতের ঘুম কেন কেড়ে নিচ্ছ? আজ রাতটা থাক, মেরী বলে, কাল সকালে আমি তাকে দুঃসংবাদটা দিয়ে দেব। তুমি বরং এখন একটু ঘুমোও। শরীরের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে।

জেনারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। রোজ বলে, ওদিকে কি ঘটছে না ঘটছে,

সেটা আমার জানার দরকার। স্টেট পুলিশ দায়িত্ব নিয়েছে বলেই আমাকে বিছানায় আশ্রয় নিতে হবে তার কি মানে আছে?

মেরী তখন কি যেন বলার চেষ্টা করল, কিন্তু রোজ তার কথায় কোন কান না দিয়ে জেনারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে শুরু করে দিল।

শোন জেফ, জেনার বলে, ম্যাসনের গাড়ীটা একটা খাদে বিকল অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে, লসের খামার বাড়ি থেকে মাইল পঁচিশ দূরে। তদন্তকারী অফিসার জ্যাকলিনের ধারণা, খুনী হয়ত মাঝ পথে কোন গাড়ী থামিয়ে নিজেকে একজন হাইওয়ের প্যাট্রল অফিসার বলে লিফট নিয়ে থাকবে। বেতারে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, কোন মোটর চালকের কাছে কেউ যদি প্যাট্রল অফিসারের পরিচয় দিয়ে লিফট চায়, তখনই যেন সে হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। জ্যাকলিনের ধারণা খুনী হয়ত এখন মিয়ামিতে। হোমি-সাইড স্কোয়াড এখনও পর্যন্ত কোন কিছু হদিশ করতে পারেনি। আর খুনীর হাতের ছাপও পাওয়া যায়নি। সে নিশ্চয়ই হাতে গ্লাভস্ ব্যবহার করে থাকবে। খুনীর চেহারার বিবরণ অস্পষ্ট। বিস্তারিতভাবে বলার সময় নেই এখন।

তারপর জেনার সংক্ষেপে ঘটনার কথা বলল শেরীফ রোজকে। এর আগে ভাসাভাসা শুনেছিল শেরীফ রোজ। সব শুনে গম্ভীর হয়ে সে বলে, খুনটা আমার এলাকায় হয়েছে। অথচ জ্যাকলিন কি করে অনুমান করল, মিয়ামির পথে পালাচ্ছে সে? নদীর ধারে অনেকগুলো ফিশিং-লজ আছে। বেশীর ভাগই বন্ধ থাকে। হয়ত সে সেখানে গা ঢাকা দিতে পারে। একটু থেমে রোজ বলে, ঠিক আছে, আমি নিজে খুঁজে দেখছি। শেষ পর্যন্ত আমাকেই খুঁজে বার করতে হবে। হাতের মুঠোয় তাকে পেলে টম এবং আমার বন্ধুদের খুন করার জন্য শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

আমি আপনাকে বাধা দিতে পারি না। জেনার বলে, খুনী নিশ্চয়ই মিয়া-মির পথে ছুটে যাচ্ছে। যাইহোক, একান্তই যদি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়, আমার বিশ্বাস, গুলির আঘাত আপনি তার কাছ থেকে পাবেনই। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক লোক সে এবং তার হাতে মারাত্মক ধরনের অস্ত্র আছে। তার থেকে আপনি বরং ঘরে বসে থাকুন। আগামীকাল যেখানে সে ম্যাসনের গাড়ীটা ফেলে রেখে গেছে, সেখান থেকে কুড়ি মাইল বরাবর কঠোর অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ন্যাশনাল গার্ডরাও কাল নেমে পড়ছে। তাই আবার বলছি, আপনি বরং—

এখানকার গোপন জায়গাগুলো আমার থেকে বেশী কি ন্যাশনাল গার্ডরা জানবে?

জ্যাকলিনকে বলব, আপনার সঙ্গে সে যেন আলোচনা করে। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি যেন এখন নায়কের মত অভিনয় করতে যাবেন না দয়া করে। আপনার এখন আর একজন ডেপুটি দরকার। সার্জেন্ট হ্যাঙ্ক হোলিসের পদোন্নতির সময় হয়ে গেছে। ভাল লোক সে। আশা করি সে আপনার উপযুক্তই হবে।

নিশ্চয়ই! হ্যাঙ্ককে আমি জানি। ভাল লোক সে।

ঠিক আছে, কাল সকালে সে আপনার কাজে যোগ দিতে যাবে। এখন বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

আর ইতিমধ্যে খুনী গা ঢাকা দিক, এই তো?

চিরদিনের জন্য নয় জেফ। শুভরাত্রি, ফোনটা নামিয়ে রাখে জেনার অতঃপর···

জুলিয়ান লুকানকে গাড়ী চালিয়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে দেখে টেড ফ্রিচম্যান তার গাড়ীতে ফিরে এল। ওয়েস্টন হাউস থেকে রেকর্ড করা ক্যাসেটটা সে তার পকেটে চালান করে দিল। প্রাইভেট গোয়েন্দা হিসাবে তার মাস মাহিনা ভালই। দশ হাজার ডলার। তার স্ত্রীর জন্য বাড়তি কোন খরচ নেই। তার থেকে বছর পাঁচেক বড় সে। স্ত্রীকে সে খুবই ভালবাসে। কিন্তু সংসারের অন্য সব খরচ মেটাতে তার মাথায় এখন ন'হাজার আটশো ডলার দেনা, সেই দেনাটা শোধ দেওয়ার জন্য কড়া চিঠি পেয়েছে সে ঋণদাতার কাছ থেকে।

অতএব বাড়তি টাকা সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা তাকে করতেই হবে। সেই মুহূর্তে পেরী ওয়েস্টনের কথা মনে হতেই সে তার চোয়ালে হাত বোলাল। নির্দিষ্ট আয়ের বাইরে অতিরিক্ত দশ হাজার ডলার তার মত লোকের কাছে হাতে স্বর্গ পাওয়ার সামিল।

খুব সাবধানে কাজে এগোতে হবে, নিজের মনে সে বলে। ওয়েস্টন এখন শহরের বাইরে। এই ফাঁকে হয়ত তার স্ত্রী দশ হাজার ডলার তার হাতে তুলে দিতে পারে একটু চাপ দিলেই। তা না হলে সে তার অবৈধ জীবন-যাপনের কথা তার স্বামীর কাছে ফাঁস করে দেবে। এ ভাবে ভয় দেখিয়ে কাজটা হাসিল করতে হবে। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?

শীলা ওয়েস্টন তখন তার সেই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিল।

অভিজ্ঞতা মানুষকে বিজ্ঞ করে তোলে। আর নয়। আর কখনও সে কোন আগন্তুকের কাছে তার দেহের নৈবেদ্য তুলে ধরবে না। যুবতী সে, দৈহিক সুখ উপভোগ করার একটা ভদ্র উপায় বার করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আজ রোববার এবং সে একা। সে ঠিক করল, আজ টেনিস ক্লাবে গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারবে। ইতিমধ্যে জুলিয়ান লুকান তার মন থেকে মুছে গেছে। তবে যৌন-সংসর্গে ওস্তাদ সে, একথা তাকে স্বীকার করতেই হবে। হঠাৎ তার ঠোঁটে কামনার হাসি ফুটে উঠতে দেখা গেল। তাকে সে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করেছে। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর যৌন উত্তেজনা। কিন্তু আর নয়। স্নান সেরে পোষাক বদলে টেনিস ক্লাবে চলে যাবে সে, সেখানেই সারাটা দিন কাটিয়ে দেবে।

এই সব কথা চিন্তা করে লবির দিকে এগোতে যাবে বাইরে দরজায় বেল বেজে উঠল। এ সময় কে আসতে পারে ? বিস্মিত শীলা ভ্রূ কোঁচকাল। সে জানে চাদরের নিচে তার নগ্ন দেহ শুধু, অন্য কোন আবরণ নেই। তারপর এক রকম অধৈর্য হয়েই দরজা খোলার জন্য এগিয়ে যায় সে।

দরজা খুলেই সে দেখে, তার সামনে একজন বলিষ্ঠ চেহারার পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

সুপ্রভাত মিসেস ওয়েস্টন, লোকটা এবার একগাল হেসে বলে, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এ্যাবমে ইনভেস্টিগেশান থেকে আসছি, আমার নাম টেডফ্লিচম্যান। তারপর একটা রুপোর ব্যাজ বার করে শীলার চোখের সামনে মেলে ধরে সে বলে, সিকিউরিটি ম্যাডাম।

তাতে আমার কোন আগ্রহ নেই, শীলা তার মুখের উপরে বলে, ধন্যবাদ। বলেই দরজা বন্ধ করতে যায় শীলা।

তেমনি রহস্যময় হাসি হেসে দরজার ভিতরে পা বাড়িয়ে দেয় ফ্লিচম্যান ফলে দরজা আর বন্ধ করা হয় না।

কথাটা আপনার আর আমার মধ্যে মিসেস ওয়েস্টন, ফ্লিচম্যান বলে, প্রসঙ্গ জুলিয়ান লুকান, যে লোকটা সারারাত ধরে আপনার সঙ্গে কাটিয়েছে।

কথাটা শোনামাত্র শীলার বুকের ধড়ফড়ানি দারুণভাবে বেড়ে গেল। সেই মুহূর্তে তার মুখ দেখলে মনে হবে, কে যেন ব্লটিং পেপার দিয়ে তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত চুষে নিয়েছে। তারপর যে ভাবে এক পা এক পা করে পিছু হটল, দেখে মনে হল ফ্লিচম্যানকে লবিতে যাওয়ার পথ করে দিতে চাইল সে। তারপর

নিজের থেকেই দরজাটা বন্ধ করে দেয় শীলা।

আপনি এখান থেকে চলে যান। সে যেন খাদের নিচ থেকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল—এখানে আসার অধিকার আপনার নেই। যান, চলে যান বলছি।

ফ্লিচম্যানের হাসিটা এবার অনেকটা প্রসারিত। ধূর্ত চোখের দৃষ্টি।

নিশ্চয়ই চলে যাব বৈকি। ওটা কোন সমস্যাই নয় মিসেস ওয়েস্টন আপনি চাইলে চলে যাব বৈকি। কিন্তু আমি যে আপনাকে সাহায্য করতে চাই। এটা আমার কর্তব্যও বলতে পারেন। জানেন মিসেস ওয়েস্টন, আপনার উপরে নজর রাখার জন্য আমাকে ভাড়া করা হয়েছে। আমাকে এখুনি তার রিপোর্ট পেশ করতে হবে। তবে আপনি যদি আমাকে চলে যেতে বলেন, তা হলে অবশ্যই আমাকে আমার কর্তব্য পালন করতে হবে।

আমার উপরে নজর রাখছেন ? তার মানে ? কে আপনাকে ভাড়া করেছেন ? আমার স্বামী ? একটু একটু করে শীলা এবার সামলে উঠছে। এই কঠোর প্রকৃতির লোকটা মনে হয় বন্ধুভাবাপন্ন। আচ্ছা পেরী কি এমন কাজ করতে পারে ? আমার উপরে নজর রাখার জন্য একজন ডাড়াটে ......

না ম্যাডাম, ফ্লিচম্যান জিভ কেটে বলে, এ ব্যাপারে আপনার স্বামীর কোন ভূমিকা নেই। তবে আমার মক্কেলের নামটা আমি বলতে পারব না, তার জন্য আমি দুঃখিত। আচ্ছা, আমরা কি দু'মিনিট এখানে বসে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারি না ?

না ! চলে যান, চলে যান এখান থেকে।

ঠিক আছে ম্যাডাম, আমার আর কিছু বলার নেই। আপনি আমাকে ভুল বুঝলেন। বন্ধুর মত আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি যদি আমাকে একান্তই তাড়িয়ে দেন, সেক্ষেত্রে রিপোর্ট আমাকে পেশ করতেই হবে। আর সেই রিপোর্ট হবে গতকাল রাত্রে জুলিয়ান লুকান নামে এক যুবকের সঙ্গে আপনি রাত কাটিয়েছেন।

আপনাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। মরিয়া হয়ে কাতরে ওঠার মত করে শীলা বলে, আপনি একজন গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার কাছে কোন প্রমাণ নেই। যান, চলে যান এখান থেকে।

প্রমাণ ? ফ্লিচম্যান মাথা নেড়ে বলে, যদি মনে করে থাকেন আমার হাতে কোন প্রমাণ নেই, তাহলে আপনার ভুল আমাকে শুধরে দিতে হবে। কাল রাতে এবং আজ সকালে এখানে কি কি ঘটেছে তার সব রেকর্ডিং আমার কাছে

আছে। এখান থেকে লুকানের চলে যাওয়ার দৃশ্য আমার ক্যামেরায় ধরা আছে। চিত্রায়িত হয়ে গেছে। সম্ভবত তার কাছ থেকে আশাতিরিক্ত কিছু পেয়ে যাওয়ার নেশায় এমনি বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে, আপনার অজান্তে ঘর থেকে জিনিস সে পকেটস্থ করল, সেটা আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। ফ্লিচম্যান তার পকেট থেকে সেই সোনার ষষ্ঠ জর্জের প্রতিকৃতি মার্কা নস্যির কৌটোটা বার করে শীলার চোখের সামনে মেলে ধরে বলে, আমার বিশ্বাস, এটা আপনাদের, অনেক চেষ্টা করে আমি এটা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই।

ফ্লিচম্যানের কথা বিশ্বাস করতে পারল না শীলা। ছুটে গেল সে পেরীর ঘরে, যেখানে সে দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহ করে রেখে থাকে। তার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি তাকে বলে দেয়, সত্যি পেরীর নস্যির কৌটোটা সেখানে নেই।

ফ্লিচম্যান ততক্ষণে বসার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তার নজর তখন শীলার গতিবিধির উপরে, উদ্দেশ্য তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা।

ওটা আমাকে ফেরত দিন, ওটা আমার স্বামীর।

ইচ্ছে তো ছিল ম্যাডাম আপনাদের পরিবারের জিনিস আপনাকে ফেরত দিই। কিন্তু এর মধ্যে লুকানের হাতের ছাপ থেকে গেছে, এর থেকে প্রমাণ হবে যে, এটা সে চুরি করে নিয়ে পালাবার ধান্দায় ছিল। লোকটা আপনার কাছে পাঁচশো ডলার দাবী করেছিল, যা আপনি দিতে অস্বীকার করেন, এ ব্যাপারে আপনাদের দু'জনের কথাবার্তা সব টেপ করা হয়ে গেছে। হাতের ছাপ, টেপ, ফটো, এইসব প্রমাণ দাখিল করলে নির্ঘাত তার পাঁচ বছর জেলে পচার পথ প্রশস্ত হয়ে যেতে বাধ্য। এগুলো পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া আমার একান্ত কর্তব্য বলে আমি মনে করি। তবে দেওয়া না-দেওয়া সব নির্ভর করছে আপনার সিদ্ধান্তের উপরে। খুব একটা স্মার্ট নয় সে।

শীলার তখন মাথা ঘুরছিল। ভারী জিনিস পতনের মত ধপাস করে একটা কোচের বসল সে, ফ্লিচম্যানের ঠিক বিপরীত দিকে।

দেখুন ম্যাডাম, সমস্যা কি জানেন, ফ্লিচম্যান চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করল।

চমকে ওঠে শীলা। তার মাথায় তখন নানা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। এ যেন পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদ। তাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়েছে। আর তার বন্ধুরা অদূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপ করছে। কানাঘুষা

কয়েছে চাপাকণ্ঠে। তার প্রিয় সামাজিক জীবন ধ্বংস হতে বসেছে। হে ঈশ্বর! পাগলের মত কি বোকামোই না করল সে।

এ আপনার কাছে একটা কঠিন আঘাত ম্যাডাম! ফ্রিচম্যান আবার বলতে থাকে, আপনাকে কি একটু ড্রিঙ্ক দেব? তারপর সে চারিদিকে দৃষ্টি ফেলে। ওয়াইন-ক্যাবিনেটটা তার চোখে পড়তেই সেদিকে এগিয়ে গেল সে। ক্যাবিনেট থেকে গ্লাসে কোগনাক ঢেলে শীলার কাছে এগিয়ে এসে তার হাতে তুলে দেয়, নিন, একটু পান করে নিন ম্যাডাম।

কাঁপা কাঁপা হাতে গ্লাসটা তুলে নেয় শীলা। এক চুমুকে পুরো গ্লাসটা নিঃশেষ করে ফেলে সে আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসে তার দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দেয়।

বেশ কয়েক মিনিট নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকে শীলা। এক সময় কোগনাকের প্রতিক্রিয়া তার দেহে শুরু হয়ে যায়। তার মন আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ ম্যাডাম, যে কথা আপনাকে বলছিলাম, ফ্রিচম্যান দেখল শীলা তার আঘাত সামলে উঠেছে, অতঃপর সে এবার মার্জিত ভাষায় কথা বলে, সমস্যাটা কি জানেন? আপনার এবং আমার!

মুখ তুলে শীলা এবার তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আপনার সমস্যা?

হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনার মত আমার সমস্যাটাও বিরাট।

কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, শীলা যেন আকাশ থেকে পড়ল, তা আপনার সমস্যা কি বলবেন তো?

তাহলে আমার সমস্যাটা বলেই ফেলি, কি বলেন ম্যাডাম? ঠিক এই মুহূর্তে আমি দারুণ অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছি। আপনাকে আমি হাতের কাছে পেয়ে গেছি ঠিক সময়ে। দু'মাস ধরে আপনার উপরে আমি লক্ষ্য রাখছি। আমি একথাও জেনেছি, নানা ধরনের নির্দিষ্ট কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ট মেলামেশা আছে। আর আমি এও জানি যে, কে তারা? আমি জানি যে, মিঃ ওয়েস্টন নিজের কাজে খুবই ব্যস্ত এবং সম্ভবতঃ অবহেলাপূর্ণ, যা আপনার মত সুন্দরী যুবতীর কাছে আদর্শ, অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সংগমে মেতে উঠতে কোন রকম বাধা-নিষেধ থাকে না। আমি জানি ইতিমধ্যে আপনি আপনার দু'জন পুরুষ বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন হোটেলে রাত কাটিয়েছেন আপনার স্বামীর অবহেলা এবং অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে।

কিন্তু এইবার আপনি এই লাইনে একজন পেশাদার পুরুষকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আর সেটাই আপনার জীবনে মস্ত বড় ভুল হয়ে যায়।

শীলার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে।

কে আপনাকে নিয়োগ করেছে?

দুঃখিত, আমার মক্কেলের নাম আমি বলতে পারব না, তাহলে বিশ্বাস ভঙ্গ করা হবে। কোন ভদ্র মহিলার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে আমি একেবারে গভীরে চলে যাই। আমি জেনেছি, মিঃ ওয়েস্টনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। বিবাহ-বিচ্ছেদের সাক্ষ্য-প্রমাণের জন্য আপনি যতটা না চিন্তিত, তার চেয়ে বেশি চিন্তিত পুলিশ এবং প্রেস যদি জেনে যায়, একজন পেশাদার নারী—অঙ্গ লোভী পুরুষের কাছে আপনি আপনার দেহ বিলিয়ে দিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন, তখন আপনার নির্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না, সেই ভয়ে আপনি বেশি শঙ্কিত। একটু থেমে সে বলে, যাইহোক, এইসব কথা আমি বাইরে কারোর কাছে প্রকাশ করব না। করতে হবে নাকি?

হাতের মুঠো শক্ত করে শীলা বলে, আপনার সমস্যাটা কি?

আমার স্ত্রী অসুস্থ ম্যাডাম, ফ্লিচম্যান বলে, সে সব কাহিনী শুনিয়ে আপনার কাছে বিরক্তির কারণ হতে চাই না। খুব একটা বেশি আয় আমি করি না, কিন্তু আমার স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ আমার আয়ের থেকেও বেশি হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিনের পর দিন। জানেন ম্যাডাম, বাজারে অনেক ধার দেনা হয়ে গেছে। আমার এখন দশ হাজার ডলার দরকার। এখন পুলিশ লুকানকে খুঁজছে, তারা জানে আমার মত প্রাইভেট গোয়েন্দারা লুকানের উপর নজর রেখে থাকে। একটু থেমে ফ্লিচম্যান আবার বলে, লুকানের হদিশ দিলে তারা আমাকে হাসতে হাসতে দশ হাজার ডলার দিয়ে দিতে পারে, সেটা কোন সমস্যাই নয় তাদের কাছে।

উঃ, এ আর এক জ্বালা। চোখ বন্ধ করে শীলা ভাবে, এই নিয়ে আজ সকালে দু' দু'জন লোক তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইল।

শুনুন ম্যাডাম, ফ্লিচম্যান নিজের থেকেই আবার বলতে থাকে, আমার স্ত্রীর কথা আমাকে চিন্তা করতেই হবে, তবে সেই সঙ্গে অবশ্য আপনার কথাও ভাবতে হবে বৈকি। আর আমি এও জানি যে, লুকানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আপনার এই সুন্দর জীবন আপনাকে নষ্ট করতে হবে। আপনি আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত নন। আপনার স্বামী একজন বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার।

আপনার একটা আলাদা জগৎ আছে, আলাদা প্রতিপত্তি, আলাদা সম্মান আছে। লুকানের বিচার হলে সাংবাদিকরা আপনাকে কেন্দ্র করে মুখরোচক খবর ছাপানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। একটু থেমে কৃত্রিম দুঃখের হাসি হেসে বলে, তাই আমি বলি কি জানেন, আপনি তো আর কপর্দকহীন নন। এই ব্যাপারটা আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম। তবে দশ হাজার ডলার আমার চাই-ই। আমি জানি, লুকানকে ধরিয়ে দিতে পারলে আমি অনায়াসে পুলিশের কাছ থেকে দশ হাজার ডলার পেতে পারি। তবে আপনি যদি নেন তো টেপ, নস্যির কৌটো এবং ফটোগুলো আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। তারপর আপনি মুক্ত, আপনাকে আর আমি জ্বালাতে আসব না। তবে আপনার উপর নজর আমার থাকবেই যাতে করে আপনি আপনার এই অবৈধ জীবন-যাপনের পুনরাবৃত্তি না ঘটান। সত্যি কথা বলতে কি ম্যাডাম, এ আপনার লাভই বলা যেতে পারে, আমার মত একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা? একগাল হেসে সে বলে, এখন বলুন আপনি কি আমার সঙ্গে একটা রফায় আসতে চান?

শীলা নীরবে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে।

অপেক্ষা করে ফ্লিচম্যান। তার বিশ্বাস, শীলা তার কথায় রাজী হয়ে যাবে। তার কোন তাড়া নেই। যত সময় লাগুক না কেন, অপেক্ষা করবে সে। কিন্তু বেশ কয়েক মিনিট নিষ্ফল। সময় পার হয়ে যেতে অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, নিজের থেকে সে আবার তাড়া দিল, আপনি কি সত্যিই আমার সঙ্গে রফা করতে চান না?

এছাড়া অন্য কোন পথ আছে বলে তো আমার মনে হয় না, শীলা কঠিন সুরে বলে, মুখ না তুলেই সে আবার বলে, আমার কাছে অত টাকা নেই। তবে উপর তলায় আমার স্বামীর লোহার সিন্দুকে টাকা থাকতে পারে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসছি।

ফ্লিচম্যানের দিকে না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শীলা। ফ্লিচম্যান তাকে বসার ঘরের দরজা পর্যন্ত ছায়ার মত অনুসরণ করে দেখতে থাকে সত্যি সত্যি দোতলায় যাচ্ছে কিনা সে। তারপর নিঃশব্দে উপরে উঠে গিয়ে শীলার ঘরে উঁকি দেয়। শীলা জানতেও পারল না, তার পিছন থেকে সে তাকে লক্ষ্য করছে। শীলা তখন দেওয়ালের উপর থেকে একটা আধুনিক তৈলচিত্র সরাচ্ছিল। ফ্লিচম্যান দেখল, সেই ছবিটার নিচে একটা ছোট্ট দেওয়াল আলমারি। হাসল সে।

এত সহজে ব্যাপারটা মিটে যাবে ভাবতেও পারেনি সে।

আলমারির চাবি খুলতে যাবে শীলা, ঠিক তখনি টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনের আওয়াজ শুনে ফিরে তাকাতেই শীলা দেখল, দরজার সামনে স্লিচম্যান দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে হাত চাপা দিয়ে আঁতকে ওঠার মত করে চিৎকার করে উঠল সে।

ফোনটা ধরে কাজ নেই ম্যাডাম, ঘরের মধ্যে ঢুকে স্লিচম্যান বলে, বরং আলমারিটা আগে খুলুন।

কিন্তু শীলা অতর্কিতে তার পাশ কাটিয়ে ছুটে এসে রিসিভারটা ক্রেডেলের উপর থেকে তুলে নেয়। স্লিচম্যান ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরা সত্বেও চিৎকার করে শীলা বলে, হ্যাঁ আমি শীলা কথা বলছি। কে তুমি?

ঠিক আছে, খিঁচিয়ে উঠে স্লিচম্যান বলে, দেখি আপনি কাকে কি বলেন?

শোন প্রিয়তমা, আমি মেভিস কথা বলছি।

ওহো মেভিস, তুমি? শীলা তার গলার আওয়াজ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

শোন শীলা, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। সেই জমকালো লোকটা চলে গেছে, নাকি এখনও সে তোমার কাছেই আছে?

সে চলে গেছে।

কেমন ছিল সে? ভাল?

চলন সই।

হুঁনি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি নিরাশ হয়েছ। সে তো দেখতে খুব চমৎকার, সুপুরুষ।

হ্যাঁ।

তোমাকে বলে রাখি, আগে থেকে কোন খবর না দিয়ে হঠাৎ কাল শ্যাম এসে হাজির। সৌভাগ্যবশতঃ কিভাবে আমার বেঁচে যাওয়া। তখন লিউ-এর সাথে বাইরে যাওয়ার কথা। চিন্তা করতে পার? আমি প্রায় বিধ্বস্ত। শ্যামকে দেখে এখন মনে হয়, সে যেন বছর তিরিশ কোন নারীর সঙ্গে দেহ মিলনে লিপ্ত হয়নি।

হুঁ, একেই বলে শ্যাম।

হ্যাঁ, পেরীর কাছ থেকে শুনে তুমি তা বলবেই

না। সে এখন তার চিত্রনাট্যের নতুন প্লটের খোঁজে ক্যালিফোর্নিয়ায়।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ? সে কখনই সেখানে যেতে পারে না। ফ্লোরিডায় গেছে সে। শ্যাম তাকে জ্যাকসন ভিলে বিমানবন্দরে দেখেছে।

আমি ভেবেছিলাম, সে বুঝি ক্যালিফোর্নিয়ায়, ফ্রিসম্যানের উপস্থিতি চিন্তা করে সে বলে।

সম্ভবত সে তোমাকে ঠকাচ্ছে বেবী। তা তুমি রাতে আসছ তো ? আজ সারা দুপুর শ্যাম শুয়ে থাকবে।

তাই নাকি ? তাহলে তো আমাকে যেতেই হয় ডেভিস। ছাড়ছি এখন। বাই—রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দেয় শীলা অতঃপর। আবার ফোন এলে তখন আর উত্তর দেবেন না ম্যাডাম, ফ্রিসম্যান কতকটা হুকুমের মত করে বলে, আর ঐ দেওয়াল আলমারিটা খুলে রাখুন আপাততঃ।

দশ হাজার ডলার। ফ্রিসম্যান ভাবে, দশ হাজার ডলারেই কি তার সব সমস্যা দূর হয়ে যাবেই ? কে জানে তার স্ত্রীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে আরও কত বেশি খরচ হবে ! পেরী ওয়েলিংটনের মত টাকার কুমীর কি মাত্র দশ হাজার ডলার অমন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখবেই ? মনে হয় অনেক টাকাই ওখানে লুকিয়ে রেখেছে সে। আরও কিছু বেশি চাইলে হত। ডাক্তারের বিল আরও বেশি হতে পারে। শীলা ততক্ষণে দেওয়াল আলমারির ডালা খুলে ফেলেছে। এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফ্রিসম্যান।

চকিতে শীলা ঘুরে দাঁড়াতেই ফ্রিসম্যান চমকে ওঠে। শীলার হাতে পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলবার, একটু আগে আলমারি থেকে বার করেছিল সে। ফ্রিসম্যানের মত কঠিন প্রকৃতির মানুষও ঘাবড়ে যায় শীলার শক্ত চোয়াল দেখে। আর তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর ফ্রিসম্যানের কানে বোমা বর্ষণের মত শোনায় যেন।

নস্যির কৌটো এবং টেপটা টেবিলের উপরে রেখে দাও। হুকুম করার মত করে শীলা বলে, আমার কথার অবাধ্য হলে যে কোন মুহূর্তে আমি গুলি করে দিতে পারি। তোমাকে প্রাণে মারব না, তবে একেবারে পঙ্গু করে দেব, যাতে করে আমার ব্যাপারে অহেতুক মাথা গলাতে না পার। যা বলছি তাই কর।

জোর করে হাসার চেষ্টা করল ফ্রিসম্যান। বলল, আমি জানি রিভলবারে গুলি নেই। আমাকে মিথ্যে ধাপ্পা দিও না। কৃত্রিম সাহস দেখিয়ে শীলার দিকে এগিয়ে যায় সে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে রিভলবারের গুলির আওয়াজ শুনে কেঁপে উঠল সে। ভয়ার্ত মুখ, বিস্ফারিত চোখ। পিছিয়ে আসতে বাধ্য হল সে। এমন বীভৎস অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয়নি তার। তার সমস্ত আত্মবিশ্বাস সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে রেণু রেণু হয়ে গুঁড়িয়ে গেল। তার মনের সব দৃঢ়তা ভেঙ্গে পড়েছে তখন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, পকেট থেকে নস্যির কৌটো এবং টেপটা বার করে টেবিলের উপরে রেখে দেয় সে।

যাও, এবার এখান থেকে দূর হয়ে যাও। আর কখনও এভাবে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এস না, চিৎকার করে ওঠে শীলা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যাও, বেরিয়ে যাও।

সিঁড়ি পর্যন্ত শীলা তাকে অনুসরণ করে। বাইরে যাওয়ার দরজা খুলে ব্লিচম্যান বেরিয়ে যেতেই শীলা তার মুখের উপরে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর সে মেঝের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

॥ চার ॥

সেই রবিবার সকাল দশটা পনেরয় শেরীফ রোজের অফিসের সামনে পুলিশের একটা গাড়ী এসে থামে। ক্যাপটেন ফ্রেড জ্যাকলিন গাড়ী থেকে নেমে দ্রুত পায়ে অফিস-ঘরের দরজার সামনে এগিয়ে বৃষ্টির ছাট বাঁচাতে। গতকালের থেকে আজ বৃষ্টির দাপট অনেক বেশী।

বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা জ্যাকলিনের। বরফের মত ঠাণ্ডা ধূসর রঙের চোখ। জ্যাকসন ভিলে স্টেট পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের প্রধান সে। বছর চল্লিশ বয়স। অভিজ্ঞ এবং রুক্ষ স্বভাবের পুলিশ অফিসার।

সে তার বর্ষাতিটা গা থেকে খুলে শেরীফ রোজ এবং হ্যাঙ্ক হোলিসের উদ্দেশ্যে অফিস-ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। তারা তখন ডেস্কে রাখা একটা ম্যাপের উপরে ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে কি যেন নিরীক্ষণ করছিল।

হাই জেফ। জ্যাকলিন তার উপস্থিতি জানিয়ে বলে, বৃষ্টির ধরন দেখে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে থামবার কোন লক্ষণ নেই, কি বল?

হ্যাঁ, তাই তো মনে হয় ক্যাপ্টেন, রোজ তার সঙ্গে করমর্দন তরে, জিজ্ঞেস করে, কি খবর বল?

তা তুমি যদি মনে করে থাক, খুনীর সন্ধান আমরা পেয়েছি, তাহলে আমার উত্তর—না। জ্যাকলিন বলে, সে এখন যেখানে-সেখানে হতে পারে। এখন এই বৃষ্টিতে বেতার-প্রচার ছাড়া আর কোনো কিছু করার উপায় নেই আমাদের। একটা চেয়ারের উপরে জলসিক্ত দেহটা এলিয়ে দিতে দিতে সে আরো বলে, রাস্তা অবরোধের ব্যবস্থা হচ্ছে, তবে একটু সময় লাগবে, মনে হয়, ইতিমধ্যে সে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ে থাকবে। কোন গাড়ীচালক তাকে লিফট দিয়েছে বলে জানায়নি এখনো পর্যন্ত। বেতারে আমাদের সতর্কবাণীর কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। মনে হয়, প্যাট্রল অফিসারের কোন ছদ্মবেশে গাড়ী থামিয়ে চালককে হত্যা করে তার গাড়ী নিয়ে পালিয়ে থাকবে সে। ন্যাশনাল গার্ডদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তারা বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় আছে।

রোজ তার ডেস্কে ফিরে যায়। তার মুখে হতাশার চিহ্ন। এই হ'ল মানচিত্র, রোজ মানচিত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, তুমি যা বললে হয়ত ঠিক, তবে গতকাল বৃষ্টি ঝরা রাতে খুব কম গাড়ীই চলেছিল। আমার কাছে খবর আছে, লোগান দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে বিধ্বস্ত গাড়ী ফেলে জঙ্গলের

দিকে গা ঢাকা দিয়েছে। তাই আমার মনে হয়, এখনো সে আমার এলাকাতেই আছে।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় জ্যাকলিন।

তা হয়ত সম্ভব, কিন্তু সে তো জানে, রাস্তা অবরোধ হয়ে আছে। এ অবস্থায় একবার সে জঙ্গলে ঢুকলে আর বেরোতে পারবে না। না জেফ, আমি এখনো বিশ্বাস করি, গাড়ীর চালককে খুন করে সে তার গাড়ী নিয়ে পালিয়েছে মিয়ামির দিকে।

কিন্তু ঐ জঙ্গলের পিছনে লুকোবার মত প্রচুর জায়গা আছে। আর জায়গাটা ফিশিং লজে ভর্তি। মানচিত্রের উপরে আঙুল দেখিয়ে রোজ বলে, টমের গাড়ীটা যে খাদে পড়েছে, সেখান থেকে মাইল দশেক দূরে সেই সব ফিশিং লজ। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নদীতে যাওয়ার পথ আছে। ফিশিং লজগুলো বেশির ভাগই ফাঁকা পড়ে থাকে। মিয়ামি কিংবা নিউইয়র্ক থেকে মাঝে মাঝে ফিশিং লজের মালিকরা এসে দু'চার দিন কাটিয়ে যায়। সেখানে খুনী অনায়াসে দু'তিন সপ্তাহ লুকিয়ে থাকতে পারে, তোমাদের অনুসন্ধানের কাজ বানচাল করে দেওয়ার জন্য। অতএব এইসব ফিশিং লজগুলো ভাল করে দেখা দরকার।

জ্যাকলিন ঠিক বুঝতে পারে না। বলে, তা ঠিক। তবে তুমি কি বল?

আমি নিজে খুঁজে দেখতে যাচ্ছি, রোজ বলে, বৃষ্টি থামলেই আমি আর হ্যাঙ্ক বেরিয়ে পড়ব।

ও চিন্তা এখন করবে না, জ্যাকলিন সঙ্গে সঙ্গে বলে, তোমাদের দু'জনের মাথার খুলি সে উড়িয়ে দিতে পারে। লোকটা সংঘাতিক। ইতিমধ্যে ছয়জনকে খুন করেছে সে। বাঘের মত হিংস্র সে, তাছাড়া তার হাতে ম্যাসনের রিভলবার আছে। অতএব জেফ—

এটা আমার এলাকা, শান্ত কণ্ঠস্বর রোজের, যদি সে এই জঙ্গলে কিংবা কোন ফিশিং লজে লুকিয়ে থাকে, আমি তাকে ঠিক বার করবই।

বয়স বাড়ছে, অথচ জিদ তোমার কমছে না, মৃদু হেসে জ্যাকলিন বলে, ঠিক আছে, চারজন ন্যাশনাল গার্ডকে তোমাদের সঙ্গী হিসেবে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মনে হয় ছ'সাত ঘণ্টার আগে বৃষ্টি থামছে না। আমি এখন চলি, জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তবে সে যদি একান্তই এখানে থেকে থাকে তো, তোমার নিরাপত্তার জন্য লোকের প্রয়োজন।

করমর্দনের পালা শেষ করে অফিস থেকে বেরিয়ে যায় অ্যাকিলিস ।

ন্যাশনাল গার্ড ! মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে রোজের; ঐ সব রাইফেল-ধারী অপদার্থদের সঙ্গে নিয়ে কি লাভ বল ?

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন, হোলিস তাকে সমর্থন করে বলে, আমরা তাদের ছাড়াই যেতে পারি ।

হোলিসের বিচার বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারে না রোজ । টম ম্যাসনের মৃত্যুর জন্য দুঃখ হলেও হোলিসের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না তার মনে হল টমের থেকেও ঐ ছোকরা তার উপযুক্ত সহকারী বটে। ভিয়েতনাম ফেরত, অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে বলে মনে হয় ।

ওদিকে জানলার সামনে গিয়ে রাস্তার দিকে চোখ মেলে দেয় হোলিস । বৃষ্টির দরুণ রকভিলের রাস্তা মরুভূমির মত ফাঁকা, নির্জন ।

মানচিত্রের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নিচু গলায় রোজ হঠাৎ বলে ওঠে, শোন হোলিস, লোকটা আমার সহকারী এবং তিনজন বন্ধুকে খুন করেছে । বৃষ্টি থামা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারি না ।

হাসল হোলিস ।

রোজ মাথা নাড়ে ।

এস, মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখ । এই পথ দিয়ে আমরা যেতে পারি । এই যে ফুটপাথ দেখছ, এই রাস্তাটা সোজা নদীর পথে গিয়ে মিশেছে । দু'মাইল পথ । সেখানে সর্বসাকুল্যে পাঁচটা ফিশিং লজ আছে নদীর ধারে । আমার এলাকায় থাকলে ঐ সব ফিশিং লজের যে কোন একটায় তার থাকার সম্ভবনাই বেশি । তা তুমি কি বল ?

আমি আপনার সাথে এক মত শেরীফ ।

ঠিক আছে । সারাদিন আমরা সেখানে টহল দিতে পারি । মেরী এখন টমের মায়ের সাথে আছে । ওর উদ্দেশ্যে একটা চিরকুট লিখে রেখে যাব । অতঃপর রোজ তার রাইফেল স্ট্যাণ্ডের সামনে এগিয়ে দু'টি রাইফেল টেনে বার করে বলে, এগুলোর গুলি ভর্তি কর, আমি ততক্ষণে মেরীকে একটা চিঠি লিখে রেখে যাই ।

চিঠি লেখার পর একটা প্লাস্টিক ব্যাগে কয়েক টুকরো স্যান্ডউইচ পুরে ফিরে এসে রোজ দেখে হোলিস তার কাঁধে রাইফেল চাপিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়, গায়ে বর্ষাতি, মাথায় টুপি ।

এক মিনিট, রোজ বলে, জেনারকে ফোন করে বলে দিই, সে যেন আমায় কিছু সময় ফোন না করে। এই বলে রিসিভারটা ক্রেডেলের উপর থেকে তুলে নেয় সে।

জেনারের কণ্ঠস্বর দূরভাষে ভেসে এলে রোজ বলে, আমি জেফ কথা বলছি। শোন কার্ল, আমি এখন অফিস বন্ধ করছি ফিশিং লজে অনুসন্ধান চালানর জন্য। হয়ত সারাদিন লেগে যেতে পারে, তাই—

তুমি দেখছি ভীষণ জেদী, জেনার বাধা দিয়ে বলে, নদীর দিকে কিছুতেই যেতে পারবে না তুমি। যাইহোক, আমি আমাদের এই লাইনই ভয়ঙ্কর বিপদ-সংকুল। তবে আগে-ভাগে তোমাকে জানিয়ে রাখলাম, এই বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে সে।

তারপর হোলিসের দিকে ফিরে সে বলে, চল, এবার যাওয়া যাক। একটু পরেই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে রকভিলের বৃষ্টিভেজা রাস্তা দিয়ে একটা প্যাট্রলকার এগিয়ে চলে হাইওয়ের দিকে, চালক হোলিস এবং তার সঙ্গী শেরীফ রোজ।

হঠাৎ প্রচণ্ড মদের নেশায় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল পেরী ওয়েস্টন। আধ-বোজা চোখে বিরাট শয়নকক্ষের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে আবার চোখ বন্ধ করে আড়মোড়া ভাঙল। বাইরে তখনো একটানা বৃষ্টি ঝরে পড়ছিল। চোখ খোলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না, একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলকেবল। উঃ, কি নেশায় না তাকে পেয়ে বসেছিল, এখানে আসার সময় হার্জ মেয়েটির কথা না শুনে কি ভুলই না করেছে সে। সে তাকে বার বার মানা করেছিল বৃষ্টিতে না বেরোনর জন্য।

কয়েক মিনিট সে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল, তারপর এক সময় তার মন আবার সক্রিয় হয়ে উঠল। একটু একটু করে তার মনে পড়ছে, যেন কত যুগ আগের ঘটনা, ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে। তার পরণে তখনো বাইরের পোষাক, কেবল মনে আছে পায়ের জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কোন রকমে। তারপর তার মনে পড়ল সেই অপ্রীতিকর ঘটনার কথা। দৈত্যের মত সেই লোকটা, যার হাতে গোখরো সাপের উল্কি আঁকা, তার হাত দুটো শক্ত করে চেপে ধরেছিল জিম ব্রাউন।

কথাটা স্পষ্ট মনে হতেই সহসা বিছানায় উঠে বসল সে। চকিতে ঘড়ির দিকে তাকাতেই সে দেখে, তখন এগারটা কুড়ি। আচ্ছা, লোকটা কি চলে গেছে ?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে শয়ন কক্ষের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দরজা খুলে কান পাতল সে। নিচের তলা থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসে, সেই সঙ্গে কফির গন্ধও।

তাহলে জিম ব্রাউন এখনো আছে। দরজা বন্ধ করে সে এবার বাথরুমে গিয়ে প্রবেশ করল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে শিউরে উঠল পেরী। এভাবে স্কচের বোতল দিয়ে কেউ তাকে আঘাত করেনি, যেভাবে লোকটা গতকাল রাত্রে আঘাত করেছিল। দাড়ি গোঁফ কামিয়ে স্নান করল সে। তারপর শয়ন কক্ষে ফিরে এসে আলমারি থেকে শর্ট, স্লিভ শার্ট এবং লিনেনস্ল্যাক্স বার করল পরবার জন্য।

জিম ব্রাউনের চেহারাটা সেই মুহূর্তে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার মনে হল, হয় এই লোকটা খুনী আসামী কিংবা পাগল। সে যাই হোক, লোকটা যে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। কি ভুল করেই না সে এমন বিপজ্জনক লোককে ঘরে এনে তুলেছিল।

শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে অতঃপর। লবিতে একটু সময়ের জন্য বিরতি। কফির গন্ধ ভেসে আসে তার নাকে।

রান্না ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় সে। ব্রাউন পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। পেরীর পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই এ-ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

পেরীর দেওয়া পোষাক তখনো তার গায়ে। কোমরে বন্দুকের বেল্ট। তার পাতলা ঠোঁটে রহস্যময় হাসি।

বাস্টার্ড, স্টিকের কি হল? খিঁচিয়ে উঠে জিম বলল, তোমার ফ্রীজে তো হরেক রকমের খাবার আছে, ওটা তৈরী করতে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না, ও-কে?

চমৎকার। পেরী উত্তরে বলে, খেয়াল করতে পারছি না, শেষ কখন আমি খেয়েছিলাম।

কফি তৈরী, লোকটা বলে, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও।

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য তার কথাটা তাকে মেনেই নিতে হল। নিঃশব্দে সেখান থেকে বসার ঘরে এসে পেরী দেখে ডাইনিং টেবিল সাজান। সেই মুহূর্তে সে উপলব্ধি করল, সত্যি কত ক্ষুধার্তই না সে। ওয়াইন ক্যাবিনেট থেকে স্কচের বোতল বার করে দু'এক পেগ গলাধঃকরণ করার ইচ্ছে

হচ্ছিল, কিন্তু কিভাবে সে নিজেকে সংযত করল। তারপর বড় জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে তখন ম্যারাথন বৃষ্টি। রাস্তায় বৃষ্টির জল এবং কাদায় মাখামাখি হয়ে গিয়ে একাকার হয়ে গেছে তখন।

এই নাটকের যবনিকা অবশ্যই টানতে হবে, ভাবল পেরী। কিন্তু কিভাবে? লোকটার হাতে রিভলবার। খালি হাতে তার মোকাবিলা করার মত দুঃসাহস তার নেই।

ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে ভাবে, লোকটার হাতে তুরুপের তাস। সে যতক্ষণ না দান ছেড়ে দিচ্ছে ততক্ষণ তার করার কিছুই নেই।

এক সময় ব্রাউন ট্রে হাতে ঘরে এসে ঢুকল। দু প্লেট স্টিক টেবিলের উপরে রেখে পেরীর দিকে তাকাল সে, তোমার এখানে রান্নার সুন্দর ব্যবস্থা আছে দেখছি।

তারা পরস্পর মুখোমুখি বসে খেতে শুরু করল অতঃপর। লোকটি সত্যি ভাল রাঁধিয়ে। অপূর্ব স্টিকের স্বাদ। নিঃশব্দ খাওয়ার মাঝপথে লোকটার দিকে মুখ তুলে তাকায় পেরী।

বাস্টার্ড, সত্যি এর জন্য আমি খুবই দুঃখিত।

এক টুকরো স্টিক মুখে ফেলার আগে পেরী জিজ্ঞেস করে, কি জন্য দুঃখিত তা তো বললে না জিম?

আমার খুব ঘুমের প্রয়োজন, ব্রাউন প্রত্যুত্তরে বলে, গত দু'দিন আমার চোখে ঘুম নেই।

তোমার কথাবার্তা বড্ড স্থুল, পেরী প্রতিবাদের স্বরে বলে, আমাকে 'বাস্টার্ড' বলে ডাকতে পাবে না। আমার একটা নাম আছে—পেরী। বুঝলে?

নিশ্চয়। স্টিক মুখে অস্পষ্ট গলায় জিম বলে, ফোন করা এবং টি-ভি দেখা আমি বন্ধ করে দিতে পারি। নিরাপদে ঘুমোতে চাই। আমি চাই না তুমি কোথাও ফোন করে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাও কিংবা টি-ভি'র পর্দায় পুলিশের আলোচনা শুনতে দিতে চাই না তোমাকে। যাইহোক, ঘুম আমার চাই-ই, চাই।

পেরীর খিদে তখন মাথায়। অহেতুক প্লেটে খাবার নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, খাওয়ায় মন নেই আর।

তা তুমি কি পুলিশী ঝামেলায় পড়েছ জিম?

নেকড়ে বাঘের মত স্টিকের শেষ টুকরোটা মুখে পুরে জিম তাকায়, তার ঠোঁটে ধূর্ত হাসি।

হুঁ। কফির কাপে চুমুক দিয়ে বরফ-ঠাণ্ডা চোখে পেরীর দিকে তাকাল, কথাটা ঠিক। পুলিশী ঝামেলাই বটে।

তা আমাকে একটু খুলে বলবে ?

কেন বলবে না ? ব্রাউন তার কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলে, আসল ব্যাপার হ'ল তুমি যদি শুনতে চাও।

কেন, কেন, একথা বলছ ?

হুঁ, ব্রাউন ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। তার হাতের মুঠি আরো দৃঢ় হ'ল। বরফ-ঠাণ্ডা চোখের দৃষ্টি স্থির হ'ল পেরীর দিকে। প্রশ্নটা খুব ভাল, ম্যাসনের রিভলবারটা তার হাতের মুঠোয়, পয়েন্ট থার্টি এইটের নল উদ্যত পেরীর বুকে, হ্যাঁ, মন্দ প্রশ্ন কর নি।

ভয়ে পেরীর বুক কেঁপে ওঠে। একটা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেল তার শির-দাঁড়া দিয়ে।

তোমাকে ওটা ব্যবহার করতে হবে না জিম, ভয়ার্ত কণ্ঠে পেরী বলে, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করব।

ব্রাউন তাকে মাছের কাঁটা বাছার মত নিরীক্ষণ করে। তারপর কি ভেবে রিভলবারটা আবার হোলস্টারে পুরে রাখে। না পেরী, আমাকে তোমায় কোন রকম সাহায্য করার চেষ্টা করতে হবে না। তুমি আমাকে অহেতুক সাহায্য করতে যাচ্ছো, বুঝলে ?

তাহ'লে এবার আমাকে সব খুলে বলবে ? পেরী এবার আশ্বস্ত হয়ে নড়েচড়ে বসে।

হ্যাঁ, সেই কথাই তো আমি তোমাকে বলতে যাচ্ছি। তার আগে বল, কফি কেমন লাগল ?

চমৎকার।

হ্যাঁ, কফি আমি ভালই বানাতে পারি। ভাল রান্নাও করতে পারি। কেবল ভাল টাকা উপার্জন করা ছাড়া। ব্রাউনের কণ্ঠস্বরে হতাশার সুর ধ্বনিত হয়, এই ধর তুমি, ছায়াছবির জন্য কাহিনী রচনা কর তুমি। তাকিয়ে দেখ, কি তুমি পেয়েছ ? ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে সে বলতে থাকে, সৌভাগ্য তোমার প্রতিভা আছে। আর আমার কিছুই নেই। তোমার মত মানুষ

জানতেও পারবে না, আমার মত নিঃস্ব বঞ্চিত মানুষের কথা, তাদের না পাওয়ার বেদনার কথা। আমাদের মত বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের করুণ কাহিনী শোনার অবকাশই বা কোথায় তোমার ?

আমাদের পাওয়ার ঘর শূন্য।

পেরী নীরবে বসে থাকে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার বুকে হাতুড়ি পেটার মত আঘাত করতে থাকে ক্রমাগত। আগের সেই অস্বস্তি ভাবটা আবার তাকে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে। তার ভয় হয়, ব্রাউন যদি আগের মত তাকে লাল চোখ দেখায়।

কিছুই নেই, ব্রাউন বলে, তুমি জান না, জান কি ? 'কিছু নেই'-র অর্থ কি ?

এইখানেই তোমার ভুল, পেরী বলে, আমার ধারণা চব্বিশের বেশী বয়স তোমার নয়। তোমার থেকে আমি চৌদ্দ বছরের বড়। তোমার মত আমার যখন বয়স, আমারও তখন মনে হত, আমার কিছুই নেই। তখন আমি কেবল বই পড়তাম। আমার অভিভাবকরা তখন আমাকে প্রায়ই চাপ দিতেন, চাকরী খোঁজার জন্য। কিন্তু আমি কেবল তখন বই পড়া ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করতে পারতাম না। তারপর আমার বাবা-মা একদিন হঠাৎ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম, আমার হাত শূন্য, একটা পয়সাও নেই। তাই তখন আমি চাকরীর চেষ্টা করতে বাধ্য হই, তা না হলে না খেতে পেয়ে মরতে বাধ্য হতাম। সেই থেকে আমার লেখা শুরু। বছর দুই আমার মনে হয়েছিল, আমি বোধহয় ছেলেমানুষি করছি, আমি জানতাম না আমি কি লিখছি। কিছু সময় আমি ময়লা ফেলার ট্রাকে কাজ করেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার লেখাও চালিয়ে গেছি। তারপর একটা লেখা শেষ করেও বুঝতে পারিনি, সেটা উতরোবে কিনা ? কিন্তু আমার প্রকাশক বুঝতে পেরেছিলেন আমার লেখার কদর। বইটা দারুণ হিট করে, বেস্ট-সেলারের তালিকায় বইটা স্থান পায়। তারপর একটার পর একটা উপন্যাস লিখে যাই। একদিন চিত্রনাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করি। সিগারেটের ছাই ফেলে সে আরো বলে, তাই আমি জানি না, কিছু না-পাওয়ার অর্থ কি ?

লোকটা অবাক হয়ে তার কথা শোনে। পেরী এই প্রথম লক্ষ্য করল, তার কথা খুব মন দিয়ে শুনেছে।

ময়লা ফেলার ট্রাক ? ব্রাউন কেমন মুখ বিকৃত করে বলে, সে তো খুব

নোংরা কাজ।

সেটা ছিল আমার পেট চালানর একান্ত সহযোগী কাজ, পেরী বলে, তাই বলছি, তোমার মত বয়সে, আমার কিছুই নেই, এভাবে হা-হুতাশ করা ভুল।

তুমি জান, ওরা আমাকে ওদের হাতের মুঠোয় পেলে, ব্রাউন বলে, তিরিশ বছর জেলে পুরে রাখবে। হাতের মুঠো শক্ত করে শূন্যে দোলায় সে, তিরিশটা বছর কি কিছুই নয়?

নতুন করে দু'টো কাপে কফি ঢেলে একটা কাপ ব্রাউনের দিকে এগিয়ে পেরী বলে, তা তোমার সমস্যাটা কি ব্রাউন? তুমি তো দেখছ, আমরা দু'জন এখানে জলবন্দী হয়ে গেছি। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত অনায়াসে তুমি তোমার সম্বন্ধে কথা বলতে পার।

দীর্ঘক্ষণ পেরীর দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ায় জিম ব্রাউন। হয়ত পারি। কফির কাপটা হাতে তুলে নিতে গিয়ে জিম বলতে শুরু করল তার সমস্যার কথা, আমার বাবা খোঁড়া ছিলেন, মা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। বাবাকে আমি দেখাশোনা করতাম। ভাল লাগত কাজটা—

ইতিমধ্যে তাদের কফি খাওয়া শেষ। কফির কাপ-ডিশ এবং খাবারের প্লেটগুলো ধোয়ার জন্য রান্না ঘরে চলে গেল জিম ব্রাউন। সেই ফাঁকে একটু আরাম করে বসে ভাবতে থাকে পেরী। এই লোকটার সঙ্গে খুব সাবধানে মোকাবিলা করতে হবে। লোকটা যেন জীবন্ত বাঘ। বাড়ির মধ্যে হিংস্র জানোয়ারকে রাখলে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ঠিক তাই করতে হবে তাকে। একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ। সামান্য একটু ভুলের জন্য তাকে ভয়ঙ্কর মাশুল দিতে হবে। তবে একথাও ঠিক যে, সে যে তার ভয়ে ভীত, এ ভাবটা তার সামনে প্রকাশ করা চলবে না কিছুতেই। এবং এমন কোন কাজ সে করবে না, যা তার স্বভাব বিরুদ্ধ হয়, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। মিনিট দশেক চেয়ারে হেলান দিয়ে সেই সময়টা নিজেকে সে নিরাপদ ভাবতে পেরে আরাম করতে থাকে।

এক সময় বসার ঘরে ফিরে আসে ব্রাউন।

সত্যি রান্নাঘরটা চমৎকার তাই না? পেরী তাকে বসতে দেখে বলে, ওখানে আমি আমার বাবার খাবার তৈরী করতাম, জান জিম, তখন আমি প্লাস্টিক স্ন্যাক্স খেয়ে দিন কাটাতাম। বৃষ্টি থামলেই তারা আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে, ব্রাউন তার নিজের প্রসঙ্গের জের টেনে বলে, তুমি আর আমি এখন এখানে

একসাথে আছি, তার পাতলা ঠোঁটে ধূর্ত হাসি ফুটে উঠতে দেখা যায়, ঠিক এই মুহূর্তে কি রকম লাগে পেরী ?

বেশতো, এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে তোমার সঙ্গ আমার ভালই লাগবে। পেরী উত্তরে বলে, আর যাই হোক, না খেয়ে আমাদের থাকতে হবে না। এখানে ছুটির অবসরে মাছ ধরার পরিকল্পনা আছে আমার। যখন আমি মাছ ধরি, একা থাকতে ভালবাসি ; আর অবসর মুহূর্তে সঙ্গ কামনা করি। সহজ হওয়ার কৃত্রিম চেষ্টা করে সে বলে, তা মাছ ধরতে তোমার ভাল লাগে না জিম ?

জিম কোন উত্তর না দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেল, একটু পরেই সে ফিরে এল, হাতে তার পেরীর সেই ট্রানজিস্টারটা।

এখন সংবাদের সময়, এই বলে ট্রানজিস্টারের স্যুইচটা খুলে দেয় সে।

ঘোষক তখন সংবাদের হেডলাইন দিয়ে শেষ করতে যাচ্ছিল, আমাদের এই দেশ অপর দেশ কর্তৃক আক্রান্ত। কালো চামড়া আর সাদা চামড়ার মানুষের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। আয়ারল্যাণ্ডে এক সৈনিক গুলি বন্ধ। সুইস ব্যাঙ্কে বোমা বিস্ফোরণ। সেনেটরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ।

আজকালের সব মানুষই দেখছি অসৎ, ব্রাউন মন্তব্য করে, আমরা যেন এক অগ্নিগর্ভ পৃথিবীতে বাস করছি।

আমারও তাই ধারণা, পেরী তাকে সমর্থন করে বলে, আমরা কেউই সুখী নই।

হ্যাঁ, ঠিক তাই, জিম বলে, কারণ আমার মত সব মানুষই দুর্ভাগ্য, নিঃসঙ্গ, কপর্দকহীন।

তারপর ঘোষক আবহাওয়ার খবর শুরু করার আগে ঘোষণা করে, পুলিশী ঘোষণার কথা আবার পড়ছি। চেট লোগান, যে লোকটা গতকাল রাত্রে নৃশংসভাবে ছয়জন লোককে খুন করেছে, এখনও পর্যন্ত বেপাত্তা। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, তার মাথায় স্টেটসন টুপি এবং নিহত প্যাট্রল অফিসারের স্টেটসন টুপি ও রিভলবার ছিনতাই করে পালিয়েছে সে। একজন মোটর চালকের গাড়ী থামিয়ে দক্ষিণের দিকে পালাচ্ছে সে। যদিও বেতার মারফৎ এই সংবাদ গতকাল সারা রাত ধরে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন গাড়ীর চালক পুলিশকে কোন সংবাদ দেয়নি। পুলিশের সন্দেহ লোগান সেই মোটর চালককে হত্যা করে তার গাড়ী নিয়ে পালিয়েছে। তাই শ্রোতাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে, এই লোকটার উপরে নজর রাখার জন্য।

তার চেহারার বিবরণ এই রকম : বছর চব্বিশ বয়স। বলিষ্ঠ দেহের গড়ন। সোনালী চুল। তার বাঁ হাতে গোখরো সাপের উল্কি আঁকা আছে। এই চেহারার কোন লোকের সন্ধান পাওয়া মাত্র ফ্লোরিডা স্টেট পুলিশের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করুন। সাবধান, লোকটার হাতে রিভলবার আছে। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক লোক সে। জ্যাকসন ভিলে এবং মিয়ামির মধ্যে পুলিশ রাস্তা অবরোধ করে রেখেছে। স্টেট পুলিশের গার্ড বিশেষভাবে সহযোগিতা করছে। এই লোকটাকে ধরার জন্য সব রকম চেষ্টা চালান হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে। ঘোষণা প্রতি ঘণ্টায় করা হবে—

এর পর ট্রানজিস্টার বন্ধ করে সেটা লুকিয়ে রাখল ব্রাউন। নিজের হাতের গোখরো সাপের উল্কির কথা ভাবামাত্র চঞ্চল হয়ে উঠল সে। এক সময় পেরীর দিকে তাকায় সে।

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা নেমে আসে তাদের মধ্যে। পেরীর সারা শরীরের মধ্য দিয়ে একটা শৈত্যপ্রবাহ রয়ে যায় হঠাৎ। বেতারের ঘোষণার কথা তখনও তার মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলে যাচ্ছিল একটানা, গতকাল রাত্রে ছয়জনকে নৃশংসভাবে খুন করেছে সে—তাকে ধরার কোনো রকম চেষ্টা যেন না করা হয়, অস্ত্রে সজ্জিত সে এবং ভয়ঙ্কর লোক সে···পেরীর মুখ শুকিয়ে কাঠ তখন, কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে যায় তার দিকে।

চেট লোগান? কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলে, তাহলে তুমিই সেই লোক জিম?

উত্তেজনায় ব্রাউন তার পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে ধরে। আমি ছাড়া আর কেই বা হতে পারে? সে তার হাতের সেই উল্কির দিকে আবার তাকায়। তুমি তো জান রাগী ছেলে অনেক বদ কাজ করে ফেলে এক-এক সময়···এই গোখরো সাপের মত। এ ধরনের ছেলেদের পুলিশের খুব পছন্দ। স্টুপিড! গোখরোর উল্কির উপরে হাত বুলোতে বুলোতে সে বলে, আমার বয়স যখন পনের, তখন আমি একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে যাই। আমরা নিজেদেরকে গোখরো সাপ বলে সম্বোধন করতাম। আমরা দলে পাঁচজন ছিলাম। নয়। দিনের আলোয় ঘুমতাম, আর রাতের অন্ধকারে শিকার খোঁজার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়তাম। এইভাবে আমি আমার বৃদ্ধ পিতার অন্ন সংস্থান করতাম, বাড়ি ভাড়া মেটাতাম। আমাদের সবার বাঁহাতে এই রকম গোখরো সাপের উল্কি আঁকা ছিল। স্টুপিড! এক সময় আমরা ভাবলাম, এ পথ বড়

ভয়ঙ্কর। বড় বিপজ্জনক। এ যেন আগুন নিয়ে খেলা। সে আবার তার হাতের সেই উল্কিটার উপর হাত বুলিয়ে বলতে শুরু করে, যাইহোক, আমরা তখন খুব ছোট, ভাল করে বোঝার মত বয়স তখনও হয়নি। জান তো সেই বয়সে সব ছেলেরা উত্তেজনার বশে অনেক খারাপ কাজ করে থাকে। একটু থেমে পেরীর চোখে চোখ রেখে সে আবার বলে, একদিন হ'ল কি আমরা একজন ধনী মক্কেলকে পাকড়াও করলাম। পুলিশের ফেউ লাগল সঙ্গে সঙ্গে। ভাগ্যগুণে আমি তাদের থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলাম, কিন্তু বাকী চারজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখি, আমার রুগ্ন বাবা আর বেঁচে নেই। আমি জানতাম, প্রতিবেশীরা আমার হাতের এই গোখরো সাপের উল্কির দাগটার কথা জানে। যে-কোন সময় তারা আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে। তাই মৃত বাবাকে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়ে পালিয়ে গেলাম আমার সেই ঘর থেকে। সেই থেকে আমি গৃহ ছাড়া, ছন্নছাড়া জীবনটা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। দীর্ঘ আট বছর ধরে ছিনতাই, খুন, জখম, রাহাজানি করে আসছি। তবে গতকাল রাত পর্যন্ত পুলিশ আমার অস্তিত্ব টের পায়নি। আমার সৌভাগ্য যে এর আগেও অনেক বার পুলিশের তাড়া খেয়ে গা ঢাকা দিয়েছি, কিন্তু তারা আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি।

পেরীর মনে তখন অনেক প্রশ্ন, অনেক কিছু জানার আছে। পুলিশী কায়দায় চেট লোগানকে প্রশ্ন করে সে, গতকাল রাত্রে তুমি কি ছয়জনকে খুন করেছ জিম ?

নিশ্চয়ই! শ্রাগ করে ব্রাউন, আজকের দিনে মানুষ নিজেরা যেখানে খুনোখুনী করে কুকুর-বেড়ালের মত মারা যাচ্ছে। সেখানে এই ছয়জন বেঁচে থেকে কি লাভ বল ? এই অপদার্থ ছয়জন লোক আমার উপরে চাপ সৃষ্টি করছিল। কেউ আমাকে লাল চোখ দেখালে আমি সহ্য করতে পারি না, আমি তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে থাকি। এরা ব্যতিক্রম নয়। এটাই আমার কাছে স্বাভাবিক, তাই নয় কি ?

তা আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা জিম ?

হঠাৎ ব্রাউন বড় বড় চোখ করে তাকায়। অরডাম্যান, তুমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে ধরে নিতে পার, তুমি সাত নম্বর শিকার নও।

তা আমার সৌভাগ্যের কারণ ?

গতকাল রাত্রে তুমি যখন একেবারে পাঁড় মাতাল, তখনি আমি তোমাকে খতম করে দিতে পারতাম, কিন্তু বেতার ঘোষণার কথা শুনে ভাবলাম, পুলিশ নিশ্চয়ই এখানে আমার সন্ধানে আসবে। তাই তখনি সিদ্ধান্ত নিলাম, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা আমার একান্ত প্রয়োজন নিজে বেঁচে থাকার জন্য। তোমাকে সামনে রেখে আমি নিজেকে আড়াল করতে চাই। একটু থেমে ব্রাউন আবার বলে, শোন পেরী, পুলিশ তোমার এখানে আমার খোঁজে এলে বলবে, তুমি এখানে একা থাক। আমাকে দেখা দূরে থাকুক আমার নাম পর্যন্ত তুমি শোনোনি। তুমি আমাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার সুযোগ করে দিলে, একটা ব্যাপারে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

পেরীর বুকের ধুকপুকুনি তখনও পুরোপুরি যায়নি। ভয়ে ভয়ে সে তার আয়ত চোখ দুটি তুলে ব্রাউনের উদ্দেশ্যে বলে তুমি আমাকে কী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা বলছ?

লোকটার মুখ কেমন ভাবলেশহীন, আকর্ষণহীন দেখায়। জোড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেব আমরা দুজনে। ব্রাউন বলে, এই হ'ল আমার প্রতিশ্রুতি।

সামনেই ফুটপাথ উইণ্ডশীল্ডের মধ্যে দিয়ে পিট পিট করে তাকিয়ে রোজ বলে, এই পথ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে হবে।

ফুটপাথের ধারে ইঞ্জিন বন্ধ করল হোলিস। রোজ ততক্ষণে বেতারে জেনারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেলেছে, কার্ল, আমি রোজ কথা বলছি। মিয়ামি হাইওয়ের 'পি' পয়েণ্ট এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। নদীর ধারে যাওয়ার জন্যে আমরা ফুটপাথ ব্যবহার করছি।

একটু অপেক্ষা কর, সঙ্গে সঙ্গে জেনার বলে, চারজন গার্ডকে পাঠিয়েছি, আধঘণ্টার মধ্যেই পেঁাছে যাচ্ছে। শোন জেফ, আমি তোমাকে বিনা প্রহরীতে অমন ভয়ঙ্কর লোকের সঙ্গে মোকাবিলা করতে দিতে চাই না।

প্রয়োজনমত সমর্থক আমার সাথে আছে, রোজ বলে, হ্যাঙ্ক আমার সঙ্গে আছে। আমি চাই না চারজন দুধের শিশুকে জঙ্গলে বেঘোরে মরতে দিতে। ওদের ফিরে যেতে বল, এই বলে ট্রানজিস্টারের স্যুইচটা বন্ধ করে দেয় সে। তার পর হ্যাঙ্কের দিকে ফিরে সে বলে, চল হ্যাঙ্ক, এবার যাওয়া যাক।

যে যার রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ফুটপাথ ধরে। জলে

কাদার পথ দুর্গম। সাবধানে পা ফেলা ছাড়া উপায় নেই। এ যেন ভিয়েত-নামের জঙ্গলের থেকেও দুর্গম, হোলিস ভাবে। তার মনে হয় না খুনী চেট লোগান এই বৃষ্টিতে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে। রোজের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে সে।

আর এক মাইল বাকী হ্যাঙ্ক, রোজ তাকে ভরসা দিতে গিয়ে বলে আর তার পরেই নদী। প্রথম ফিশিং লজ এই ফুটপাথ শেষ হলেই চোখে পড়বে। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, তুমি আমার দিকে লক্ষ্য রেখে চল। কাউকে কোন করুণা করবে না, দেখলেই প্রথমে গুলি করবে, তারপর ক্ষমা চেয়ে নেবে, বুঝলে?

দেখুন শেরীফ, শান্ত সংযত কণ্ঠস্বর হোলিসের, সেনাবাহিনীতে আমার ট্রেনিং আছে। তাই বলছি, কিছু যদি মনে না করেন তো বলি, আমাকে আগে আগে যেতে দিন, আর আপনি আমাকে অনুসরণ করুন। একটা ভুল মানেই আমাদের দু'জনের মৃত্যু, কেমন?

ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম, রোজ বলে, এগিয়ে যাও তুমি, আমি তোমাকে অনুসরণ করছি।

প্রায় আধঘণ্টা জল-কাদার মধ্যে ধীরে ধীরে হাঁটার পর সামনের দিকে তাকিয়ে রোজ চিৎকার করে ওঠে, আমরা এসে গেছি হ্যাঙ্ক। ঐ দেখ দূরে নদী দেখা যাচ্ছে, নদীর ধারে কাঠের কেবিন, ফিশিং লজ। সারিবদ্ধ গাছ। গাছের ফাঁকে নদীর ছায়া কাঁপে। দূরে কাঠের কেবিনও চোখে পড়ে।

হোলিসকে খুব তৎপর দেখায়। রোজ তাকে শুরু থেকেই লক্ষ্য করছিল। ছোকরা বেশ তৎপর, রোজভাবে, তার উপযুক্ত ডেপুটিই বটে। রোজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে কেবিন লক্ষ্য করে। হোলিসকে এগিয়ে যেতে দিয়ে তাকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। তবে সে এও জানে যে, এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যুবকরাই উপযুক্ত। কিন্তু ম্যাসনকে একা ছেড়ে দিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। তার মত হোলিসও যদি খুন হয়? চমকে ওঠে রোজ। পরমুহূর্তেই হোলিসের গতিবিধি লক্ষ্য করে রোজকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় সেই কাঠের কেবিনের দিকে। হাতে উদ্যত রাইফেল। এক সময়ে সেই কেবিনের সামনে গিয়ে হোলিস তার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। তারপর মিনিট দশেক অপেক্ষা। এত দীর্ঘ সময় কোন অভিযানে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হয়নি তাকে। এক সময় হোলিসকে আবার সেই

কেবিনের সামনে ঘোরা ফেরা করতে দেখা যায়। ইশারায় রোজকে এগিয়ে আসতে বলল সে।

আশ্বস্ত হয়ে রোজ এবার এগিয়ে যায় কেবিনের দিকে। চলতি পথে রোজের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তার কানে, জানলার শাটারগুলো সব টাইট আছে, তবে লোকটা সেখানে থাকলেও থাকতে পারে।

ঠিক আছে, ভাল করে অনুসন্ধান চালান। আমি যাচ্ছি।

আধঘণ্টা পরে কেবিনের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে তারা উপলব্ধি করল, কাজটা খুবই কঠিন। কেবিনের চারটে ঘরে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পদধ্বনি তাদের কানে ভেসে এসেছে। এখন আরও চারটে কেবিনে অনুসন্ধান চালানো বাকী। তার মানে আবার সেই আতঙ্ক, আবার সেই প্রাণ হাতে করে মৃত্যুর প্রহর গোণা।

পর পর পাঁচটি কেবিনে অনুসন্ধান চালিয়ে মানসিক চাপে বুঝি বা তারা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। খিদেও পেয়েছিল খুব। আসার সময় স্যাণ্ডউইচের প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। পাঁচ নম্বর কেবিনের এক কামরায় বসে তারা স্যাণ্ডউইচ খেল। কয়েক মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার পর এবার তারা শেষ কেবিনের দিকে এগিয়ে চলল। পেরী ওয়েস্টনের কেবিন, রোজ বলে, ছায়াছবির চিত্রনাট্যকার। সত্যি লোকটা অত্যন্ত অমায়িক। প্রচুর টাকা আছে। রকভিলের প্রাসাদোপম বাড়ী। মাছ ধরা হবি তার। ওর সঙ্গে ফিশিং লজে এবং তার রকভিলের প্রাসাদে কত হৈ-হুল্লোড় স্ফূর্তি করেছি, এক সঙ্গে মদ খেয়েছি। গোড়ার দিকে প্রতি মাসে একবার এই ফিশিং লজে আসত সে। কিন্তু বছর দুই এদিকে আর পা দেয়নি সে। পেরীর অনুরোধেই আমার স্ত্রী মেরী মাসে একবার করে এখানে আসে, কেবিনের ঘরগুলো সাফাই করার জন্য, ফ্রীজটা চালু রাখার জন্য। ফ্রীজে সব সময় প্রচুর খাবার মজুত থাকে। লজটা চেট লোগানের কাছে ঈশ্বরের দান বলেই মনে হবে।

হোলিস তার কব্জি-ঘড়ির দিকে তাকায়, চারটে পাঁচ। কয়েক ঘণ্টার পরেই চারিদিকে অন্ধকার নেমে আসবে, হোলিস জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি আমরা এগিয়ে যাব?

হ্যাঁ, যেতে আমাদের হবেই! রোজ উঠে দাঁড়ায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য। হোলিস তাকে অনুসরণ করে।

জিম ব্রাউনের নজর এখন টি. ভি. সেটের উপরে, তার লক্ষ্য পুলিশী তৎপর তার উপরে। মাঝে মাঝে নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকতে থাকে সে, পুলিশ কখনও এভাবে চলতে পারে না। এ সব উটকো ঝামেলা বই কিছু নয়।

ওদিকে পেরী গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গ্লাসের পর গ্লাস স্কচ গলাধঃকরণ করতে থাকে। চিৎকার, বন্দুকের আওয়াজ, গাড়ীর যান্ত্রিক আওয়াজ কোন কিছু তার দুশ্চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

...কেউ আমাকে চাপ দিলে আমি তাকে আঘাত করে থাকি। এটাই তো স্বাভাবিক। তাই না? আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তুমি আমাকে পালাবার পথ করে দিও, আমি তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করব না। আর বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমরা দু'জনে এক সঙ্গে জোড়া কফিনের সামিল হব।

কথাগুলো ব্রাউনের আর সেই মুহূর্তের মুখের ভাবটা কল্পনা করার চেষ্টা করল পেরী। পেরী জেনে গেছে, সে তার সঙ্গে একটু চালাকি কিংবা ছলনা করলে ব্রাউন তাকে খতম করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। অতএব এখন তার কথা মত চলাই বুদ্ধিমানের কাজ, ভাবল পেরী।

টি-ভি-র পর্দায় তখন ছায়াছবির শেষ দৃশ্য দেখাচ্ছিল। এক সময় টি-ভি বন্ধ করার সুইচটা টিপে দেয় ব্রাউন। তারপর পেরীর দিকে ফিরে সে বলে, তা তুমিও কি এই ধরনের চিত্রনাট্য লেখ?

না, টি-ভি-র কাজ আমি করি না।

তাই নাকি? ব্রাউনের চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছায়া। আমার ধারণা, তুমি খুব স্মার্ট। তুমি নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা করেছ। তা আন্দাজ মত কত?

প্রতি বছর আয় এক রকম হয় না, কমে বাড়ে। তা বছরে ষাট হাজার ডলারের মত হবে।

আসলে পেরী এর থেকেও বেশী আয় করে থাকে। কিন্তু ব্রাউনের কাছে তার প্রকৃত আয়ের অঙ্কটা গোপন করল।

ষাট হাজার...চমৎকার! তা তোমার সেই টাকা কি এখানে আছে?

পাঁচশোর মত কাছে আছে।

আরো বেশী পেতে পার?

হ্যাঁ, রকভিলের ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া যেতে পারে।

খবরটা ভাল। আমাকে একটা বাজী ধরতে হবে, টাকাটা দরকার। ঠিক

আছে, আমি তোমার সাথে আছি।

জোর করে হাসার চেষ্টা করল পেরী, বেশ তো, ভালই।

একসঙ্গে ষাট হাজার ডলার। একবার একজন পথচারীকে খতম করে মাত্র ছ'শো ডলার আর একটা সোনার মত দেখতে ঘড়ি ছিনতাই করেছিলাম, তাও সেটা আসল সোনার ঘড়ি ছিল না।

আজকাল মানুষ খুব সতর্ক হয়ে গেছে। পথে-ঘাটে বেশী টাকা-কড়ি কিংবা দামী ঘড়ি পরে না।

তা ঠিক। তবে টাকাটা তুমি ব্যাঙ্ক থেকে পাবে তো?

হুঁ। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় পেরী।

অতঃপর ব্রাউন উঠে দাঁড়িয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বৃষ্টি থেমে আসছে। তার মানে যে কোন মুহূর্তে পুলিশ এখানে এসে পড়তে পারে, পেরীর দিকে ফিরে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় সে, তার বরফ-ঠাণ্ডা চোখে অনেক প্রশ্ন, তারা এলে তোমায় কি বলতে হবে জান তো?

কেন, তুমি তো আগেই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছ, পেরী বলে, পুনরাবৃত্তি করে কি লাভ?

শোন, বেশী চালাকি করতে যেও না। আমার কথামত চললে বেঁচে থাকার অধিকার পাবে, তা না হলে—

এ কথা আমি অনেকবার শুনেছি। এর পরেও আমি যে তোমার সঙ্গে চালাকি করব, এ ধারণা কি করে হ'ল তোমার?

ব্রাউনের পাতলা ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা আবার ফুটে উঠতে দেখা যায়।

তুমি দেখছি সত্যিই খুব স্মার্ট। নোংরা ফেলার কাজ করা যদি আজ তোমার মতন এমন সম্মানজনক অবস্থায় উঠে আসে, সাধারণতঃ তারা এমনি স্মার্টই হয়ে থাকে। কিন্তু আমার সঙ্গে বেশী চালাকি করতে যেও না, আমি আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

ঠিক আছে, তোমার কথামত ধরেই নিলাম যে, আমি স্মার্ট, পেরী বলে, তবে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি জিম, পুলিশ এলে স্টেটসন টুপি এবং বর্ষাতিটা তুমি যেন আমার গ্যারাজে রেখে এস। তারা যদি ওগুলো দেখে...ব্রাউনের ঠোঁটে ধূর্ত হাসি দেখে চুপ করতে হ'ল পেরীকে।

শোন হে চতুর প্রবর, ধরা আমি কখনোই পড়ব না। আর এই স্টেটসন টুপি এবং বর্ষাতিটাও আমার সাথে থাকবে। তবে পুলিশ আসার আগে

এগুলো আমি আমার ঘরে রেখে আসব। আমার জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবেনা, বরং তুমি তোমার জন্য চিন্তা কর।

পেরী স্রাগ করল।

গাড়ীতে আমার পোষাক, টাইপ রাইটার এবং দরকারী কাগজপত্র আছে। সেগুলো আমার এখুনি দরকার, নিয়ে আসতে হবে। তা তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

একটু সময় কি ভেবে ব্রাউন বলে, ঠিক আছে, তুমি তোমার কাজ করতে পার। তবে আবার বলছি, কোন চালাকি নয়। দু'টো জিনিস আমি খুব ভালবাসি। আমার বাবা খেতে ভালবাসেন, তাঁর জন্য রান্না করতে আমার ভাল লাগে। আর ভাল লাগে, হোলস্টার থেকে রিভলবারটা বার করে দোলাতে দোলাতে সে বলে, আর এই রিভলবার চালাতে আমার খুব ভাল লাগে। যাও, তোমার দরকারী জিনিসগুলো নিয়ে এস, কোন চালাকি নয়, বুঝলে?

জল কাদায় চলতে গিয়ে হাত তুলে রোজকে থামার জন্য ইঙ্গিত করে হোলিস। একটা গাছতলায় এসে তারা দাঁড়ায়।

ওয়েস্টন লজে কেউ যেন আছে বলে মনে হয়, অন্ধকারে হোলিসের ফিস্ ফিস্ কণ্ঠস্বর শোনা যায়, একজন লোক গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে আসছে। গ্যারাজে গাড়ীও একটা রয়েছে দেখছি।

ফিশিং লজ থেকে তাদের দূরত্ব তখন মাত্র পনেরগজ হবে। পেরী ওয়েস্টনকে চিনতে পারল রোজ। পেরী তখন তার গাড়ী থেকে মালপত্তর নামাচ্ছিল। নিচু গলায় হোলিসকে সে বোঝায়, ঐ লোকটা হ'ল পেরী ওয়েস্টন, এই ফিশিং লজের মালিক।

ওদিকে ব্রাউনের দৃষ্টি এড়ায় না। তারা যতই গাছের আড়াল থেকে দেখুক না কেন, তাদের স্টেটসন টুপি ব্রাউনের ঠিক চোখে পড়ল।

বসার ঘরে সুটকেস দু'টো নামিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে পেরী বলে, আমি তোমার কথা রেখেছি, বল, এবার আমাকে কি করতে হবে?

শান্ত হয়ে বস, ব্রাউন নরম গলায় বলল, ওরা এখানে এসে গেছে। দু'জন পুলিশ অফিসার। তুমি তো জান কি করতে হবে। একটু বেচাল হতে দেখলেই গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। যাও, এবার টাইপরাইটারটা নিয়ে এস চটপট।

দু'চোখে বিস্ময় পেরীর।

ওরা এখানে, তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি ?

যাও, এগিয়ে যাও, তা না হলে এই যে আমার হাতে রিভলবার দেখছ, ব্রাউন তার হাতের রিভলবারটা শূন্যে দুলিয়ে বলে, আজ তুমিই হবে আমার প্রথম শিকার।

ব্রাউনের কণ্ঠস্বরে কি ছিল কে জানে, পেরী থর থর করে কাঁপতে থাকে ভয়ে ? ব্রাউন আবার তাকে আজ দিতেই সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল সে।

বেজম্মা, আমি তোমার উপরে নজর রাখছি। বেইমানি করলে তার শাস্তি মৃত্যু, মনে থাকে যেন।

॥ পাঁচ ॥

ওয়েস্টন হাউসের সামনে টেড ক্লিচম্যান তার গাড়ীর ভিতরে বসে ঘামছিল, ভয়ে। সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। আর একটু হলে শীলা তাকে খতমই করে ফেলেছিল। ঠিক মত দেহটা ধনুকের মত না বাঁকালে তার দেহটা গুলিবিদ্ধ হয়ে ওয়েস্টন হাউসে লুটিয়ে পড়ে থাকত। তবে এখনও সে পুরোপুরি ভাবনা মুক্ত নয়। সে আবার একথাও ভাবল, শীলা ওয়েস্টন যদি পুলিশে খবর দিয়ে থাকে ? আবার সে ঘামতে থাকে পুলিশের ভয়ে। মনকে সে সান্ত্বনা দেয়, না শীলা বোকার মত অমন কাজ করতে যাবে না, তা করলে পুলিশী ঝামেলায় তাকেও পড়তে হবে বৈকি।

না, আর নয়, শীলার কেসটার ব্যাপারে তার সব উৎসাহ যেন একটু আগেই উধাও হয়ে গেছে। ডোরিকে সে বলবে, এ ব্যাপারে তাকে রেহাই দেওয়ার জন্য। এই কুত্তীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ফ্রেডই উপযুক্ত এবং সে-ই প্রথম তার সৌভাগ্যের জন্য শুভ কামনা করবে।

রবিবার অফিস ছুটি। পুলিশকে সুযোগ করে দিতে ওয়েস্টনের বাড়ীর সামনে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করবে না সে। অসুস্থ স্ত্রীর কথা মনে পড়ল তার। কবে যে তারা একসঙ্গে রোববার বেড়াতে বেরিয়েছিল, সে কথা আজ আর মনে নেই। এই সময়ই সে সহজলভ্যা মেয়েদের সঙ্গ পেয়েই তৃপ্ত থেকেছে।

যাই হোক, এখন সে বাড়ী ফিরে যাবে। তার স্ত্রী তাতে খুব আশ্চর্য এবং খুশি হবে। আজ সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে কোথাও নৈশভোজ সেরে নেবে। উঃ কতদিন ভাল-মন্দ খায়নি সে। টাকার জন্য আজ আর সে চিন্তা করবে না।

শীলা এতক্ষণ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ পর্দার আড়াল থেকে ক্লিচ-ম্যানকে লক্ষ্য করছিল। সে চলে যেতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। লোকটা চলে গেল। উঃ বাঁচা গেল।

ফিরে এসে একটা চেয়ারে শীলা তার নরম শরীরটা এলিয়ে দিয়ে শূন্যে দৃষ্টি দিয়ে মিনিট কুড়ি ভাবল, উঃ কি বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না সঞ্চয় করল আজ সে, এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না সে। এক সময় তার মনটা স্বামীর চিন্তায় ভরে উঠল কানায় কানায়। ছিঃ ছিঃ সে তার স্বামীর সঙ্গে এতদিন কি খারাপ ব্যবহারই না করেছে ?

পেরী স্বামী মিলনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার মনে প্রচণ্ড ঝড় তুলল সেই

মুহূর্তে। পেরী তাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দিয়ে গেছে অকৃপণের মত। অথচ প্রতিদানে পেরীর দিকে একটু ভাল করে নজরও দিতে পারেনি ইদানীং।

মনের অজান্তে বুঝি বা দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল শীলার চোখের কোল বেয়ে। নিজের উপরেই তার ভীষণ ঘৃণা হল। নিজেকে সে এখন কুত্তী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না যেন। পেরীর অসাক্ষাতে সময় সময় অন্য পুরুষের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে শীলা তাকে আঘাত করার জন্য। এখন সেই জীবন তাকে শেষ করতেই হবে। এখন আর অন্য কোন পুরুষকে কামনা নয়। পেরী, হ্যাঁ পেরীই যেন তার জীবনের একমাত্র পুরুষ হয়ে থাকুক। পেরী তার জীবনের এক মাত্র প্রেম, বিছানায় অপূর্ব। নিজের মনে বলে, শীলা সে তোমাকে সত্যিকারের ভালবাসে। অন্য পুরুষেরা কেবল তোমার দেহ চায়, কিন্তু পেরী তোমার দেহ চায় না, সে তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। আঃ কথাটা ভাবলেও কেমন রোমাঞ্চ জাগে, শীলা নিজের মনে বলে, আমি তাকে চাই, তাকে আমার দরকার।

শীলা তার বিভিন্ন প্রেমিকের কথা মনে করতে গিয়ে জুলিয়ান লুকানের কথা তার মনে পড়লেই দুঃখ হত। সত্যি কি বোকা মেয়েই না সে। পেরীর মত পুরুষ থাকতেও অন্য পুরুষের সঙ্গে—

এসব তাকে বন্ধ করতেই হবে। ক্রিসম্যানের কথা মনে পড়ল তার। তাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাকে আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে কে বলেছেন?

আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস ওয়েস্টন। আমি আমার মক্কেলের নাম কিছুতেই আপনাকে বলতে পারব না। তাহলে বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে পড়ব আমি।

সঙ্গে সঙ্গে শীলার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের সম্মান পাওয়ার পর থেকেই পেরী যেন মিলাজ এস. হার্টের হাতে পুতুল হয়ে গেছে, তার কথায় ওঠে বসে সে আজকাল। একবারই হার্টকে দেখেছিল সে। এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম নয় তার প্রতি ঘৃণাই জন্মেছিল সেদিন। শীলা জানে তার মত মেয়ের জন্য মিথ্যে সময় নেই হার্টের। হার্ট তার প্রতি একটু যেন নিষ্ঠুর। আর যে পুরুষ তাকে চায় না, তার প্রতি শীলার ঘৃণা বোধটা যেন বড্ড বেশী প্রকট। কেন জানি না হার্টের ব্যবহার দেখে তার মনে হয়েছে, সিনেমার এই লোকটি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতেই পেরীকে তার কাছ থেকে দূরে

সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব এখন এটা ঠিক যে, ঐ ব্ল্যাক মেলার মিলাজ এস· হার্টের ভাড়া করা লোক। তাতে কোন সন্দেহ নেই এখন আর।

পেরী বলে গেছে, সে নাকি হার্টের নতুন বই-এর চিত্রনাট্য রচনা করার জন্য কিছু দিন লস এঞ্জেলসে যাচ্ছে। অথচ মেভিস বলছিল তার স্বামী নাকি পেরীকে জ্যাকসন ভিলের বিমান বন্দরে দেখেছো তাহলে ? কেন সে ফ্লোরিডায় যেতে গেল ? তবে কি সে সেই ফিশিং লজে গেল ? ফিশিং লজ একেবারেই ভাল লাগে না তার। এর আগে পেরী তাকে অনেকবার অনুরোধ করেছে তার সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সে রাজী হয়নি। এখন সেখানেই তাকে ছুটে যেতে হবে। শীলা ঠিক করেছে, সে তার স্বামীর কাছে সব স্বীকার করবে।

সুটকেসে পোষাক ভরতে গিয়ে শীলা ভাবে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেরীর সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। নতুন করে আবার সে জীবন শুরু করতে চায়। ফোনেই সে প্লেনের টিকিট বুক করে ফেলল। প্লেন ছাড়তে এখনও ঘণ্টা দুই বাকী। হাতে এখনও অনেক সময় আছে। আবার সে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, না কোন গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই তাদের বাড়ীর সামনে। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, কেউ আর তার উপরে নজর রাখছে না। শয়তানটা ভয়ে চোরের মত পালিয়েছে। তার মুখে বিজয়িনীর হাসি ফুটে উঠল।

এরপর সে ট্যাক্সির জন্য ফোন করে নিচে নেমে এসে লবির দিকে এগিয়ে যেতে গিয়ে তার চোখে পড়ল মেঝের উপরে তার রিভলবারটা পড়ে আছে। তার স্পষ্ট মনে আছে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার সময় তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে যায় রিভলবারটা। সঙ্গে আবার চমকে উঠল সে। আর একটু হলে সে খুন করতে যাচ্ছিল। হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে এ কোন্ কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিতে চাইছিলে ?

পেরী। একমাত্র সে-ই তার সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে। তাই তার কাছে সব খুলে অবশ্যই বলতে হবে। রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে শীলা তার হাত ব্যাগে চালান করে দেয়। সে জানে না, রিভলবারটা তার কি কাজে লাগবে।

সত্তর মিনিট পরে তাকে বিমান বন্দরে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। তার গন্তব্যস্থল জ্যাকসন ভিল।

পেরীর ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েছিল শেরীফ রোজ এবং ডেপুটি শেরীফ হোলিস।

ওর সঙ্গে আমি কথা বলব, রোজ বলে, হোলিস তুমি ততক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর, বুঝলে ?

হ্যাঁ, আমি আপনার উপরে নজরে রাখছি, হোলিস বলে আপনি সাবধানে যাবেন, লোগানকে বিশ্বাস নেই।

রোজ এগিয়ে যায় গ্যারেজের দিকে। পেরী তখন তার গাড়ী থেকে টাইপরাইটারটা বার করছিল।

হাই, মিঃ ওয়েস্টন ?

চমকে উঠে পেরী সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটারটা গাড়ীর মধ্যে রেখে দেয়। অসময়ে শেরীফকে আশা করেনি সে এখানে। মুখে কৃত্রিম হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল সে।

হাই জেফ, এই বর্ষা-বাদলার দিনে আপনি এখানে কি করতে এলেন ?

তারপর পরস্পর করমর্দন করে।

সে প্রশ্ন তো আমারও মিঃ ওয়েস্টন। প্রত্যুত্তরে রোজ বলে, আপনার তো এই বিশ্রী আবহাওয়ায় এখানে আসা উচিত হয় নি।

আপনার অনুমান ঠিক। পেরী কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে বলে, একটা ছায়া-ছবির চিত্রনাট্য রচনা করার জন্য শহর থেকে পালিয়ে এসেছি এখানে।

আপনি কি এইমাত্র এলেন ?

না, গতকাল রাত্রে। ভাগ্যবান আমি, তাই বোধহয় পথে সেই খুনীর মোকাবিলা আমাকে করতে হয়নি।

হ্যাঁ, তা ঠিক। রোজ জিজ্ঞেস করে, আপনার লজে সব ঠিক আছে তো ?

নিশ্চয়ই। জোর করে হাসার চেষ্টা করল পেরী, সহস্র ধন্যবাদ মেরীকে। সব কিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

তারপর হোলিসের দিকে ফিরে রোজ তাকে ইঙ্গিতে আসতে বলল। মিঃ ওয়েস্টন, ইনি আমার নতুন ডেপুটি, হ্যাঙ্ক হোলিস।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুশী হলাম মিঃ হোলিস, পেরী করমর্দন করে বলে, দেখছি আপনারা রাইফেল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। তা আপনারা তো শিকারে বেরতে পারেন না ?

হ্যাঁ আমরা শিকারেই বেরিয়েছি, মানুষ শিকার। হাসতে হাসতে

রোজ বলে।

তাই নাকি? তা লজের ভেতরে চলুন, পেরী তাদের আহ্বান জানায়, কফি খেতে খেতে আলোচনা করা যাবে'খন।

আপনার লজ শুধু শুধু কাদায় মাখামাখি হয়ে যাবে, রোজ বলে, তাই আর ভেতরে ঢুকতে চাই না। এই বলে সে তার কাদামাখা পায়ের জুতো-জোড়া দেখাল।

তা কি হয়েছে, পেরী বলে, জুতো না হয় খুলেই ঢুকবেন। আপনাদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আপনারা খুব ক্লান্ত। কফি খেলে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারতেন।

রোজ এবং হোলিস পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে। কি ভেবে তারা তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

আমরা দু'জনে জোড়া কফিনের অংশীদার। রান্না ঘরে কফি তৈরী করতে গিয়ে লোগানের কথাটা মনে পড়ে গেল পেরীর। আশ্চর্য, কি এক অলৌকিক ক্ষমতায় সে তার মনটাকে শক্ত রাখতে পেরেছে এখনও পর্যন্ত। এখনও পর্যন্ত একটুও বেসামাল হয়ে পড়েনি সে। রোজের প্রশ্নগুলোর ঠিকঠিক উত্তর দিতে পেরেছে সে। কখনও ভয় পায়নি সে। মনে হয় ঘটনাটা যেন কোন রহস্য—রোমাঞ্চপূর্ণ ছায়াছবির চিত্রনাট্য, যা মিলাজ এস. হার্ট চায়, যে কাহিনীর চিত্রনাট্য করতে এখানে তার আসা। একটু সময়ের জন্য সে তার ভাবনার ইতি টানল। সে বেশ বুঝতে পারে, আগুন নিয়ে খেলা করছে সে। যে কোন মুহূর্তে ব্রাউন হিংস্র মূর্তি ধারণ করতে পারে তবে এও ঠিক যে, সে যদি তার হাতের তুরুপের তাসটা ঠিক সময়ে ফেলতে পারে, তাহলে ব্রাউনকে নিজের কব্জায় রাখতে পারবে নিশ্চয়ই।

আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে চায় পেরী। ব্রাউন যে এই লজে আত্মগোপন করে আছে, এই খবরটা তার কথার আভাষে প্রকাশ হয়ে পড়লে উভয় পক্ষের বন্দুকের গুলি গর্জে গর্জে উঠবে সহসা। তখন ব্রাউনের জীবিত থাকার সম্ভাবনা আর থাকবে না। কিন্তু সে জানে, কি করে এসব কাহিনীর চিত্রনাট্য শুরু করতে হয়। তাই খুব ঠাণ্ডা মাথায় তাকে কাজ সারতে হবে। এ কাহিনী হার্টের মনোমত চিত্রানাট্যের রূপ নিতে পারে।

কফির কাপ এগিয়ে দিতে গিয়ে পেরী জিজ্ঞেস করে, আপনারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত বললেন না, এই ঝড় জলে আপনারা দু'জনে সত্যিই কি শিকারে

বেরিয়েছেন ?

তারা দু'জনে পেরীর মুখোমুখি বসেছিল।

বেশ তাহলে আপনাকে খুলেই বলি মিঃ ওয়েস্টন। আমরা একজন খুনীর খোঁজ করছি, রোজ বলে, আমার ধারণা সে এখানকার কোন একটা ফিশিং লজে লুকিয়ে আছে। তার খোঁজ খবর নিয়ে এখন মনে হচ্ছে আমার ধারণা ভুল।

খুনী ? তার মানে আপনি সেই ভয়ঙ্কর চেট লোগানের কথা বলছেন ? বেতারে তার চেহারার বর্ণনা আমি শুনেছি।

হ্যাঁ, সেই লোক ! রোজ একটু থেমে আবার বলতে থাকে, আপনি তো জুডলসকে চেনেন, কমলালেবুর বাগান আছে যার। সেই ভয়ংকর খুনী—তার স্ত্রী এবং কন্যাকে নৃশংসভাবে খুন করেছে।

হায় ঈশ্বর ! ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর পেরীর, তারা খুন হয়েছে ?

আমার ডেপুটি টম ম্যাসন দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে ছিল তখন। তাকেও একইভাবে খুন করে লোগান। হোলিসের দিকে ফিরে রোজ আবার বলে, ও তার স্থল ভিষিক্ত হয়েছে এখন।

একবার মনে হল, শেরীফকে সে বলে দেবে, ব্রাউন এখানেই আছে। পরমুহূর্তেই লোগানের সতর্কবাণীর কথা মনে পড়ে গেল তার একটু বেচাল হলেই জোড়া কফিনের সাথী হব আমরা দু'জনে। না, সে মৃত্যু হবে আত্মঘাতী। তা সে করতে চায় না।

জেফ, এ তো দেখছি সাংঘাতিক ব্যাপার, পেরী না জানার ভান করে বলে, তা আপনি কি মনে করেন, সে এখনো এই এলাকায় আছে ?

হ্যাঁ, সম্ভবত তাই। কিন্তু পুলিশের ধারণা অন্যরকম। তারা মনে করছে, লোগান হয়ত কোন গাড়ী থামিয়ে মিয়ামির দিকে এগিয়ে গেছে।

পেরী মাথা নেড়ে সায় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার আবার এ কথাও মনে হয়, ব্রাউন নিশ্চয়ই আড়ালে কোথাও দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে, তার হাতে রিভলবার।

মোটামুটি রোজ বুঝে গেছে, লোগান এখানে নেই। জ্যাকলিনের কথাই ঠিক, হয়ত লোগান এখন মিয়ামির পথে।

ফিরে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় রোজ, আপনি তো এখন কয়েক সপ্তাহ ব্যস্ত থাকবেন আপনার চিত্রনাট্যের কাজে। তা মেরীকে কি প্রয়োজন হবে আপনার ?

আপাততঃ নয়, পেরী বলে, প্রয়োজন হলে আমি ফোন করে তাকে জানাব।

ওঁকে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

তারপর পেরীর সঙ্গে করমর্দন করে রোজ বলে, আপনার চিত্রনাট্যের কাজে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। বিদায় মিস্টার ওয়েস্টন—

কাদামাখা পথ দিয়ে ফিরে আসতে গিয়ে হঠাৎ হোলিস থমকে দাঁড়ায়, এক মিনিট দাঁড়ান শেরীফ।

রোজ থমকে দাঁড়িয়ে, ঘুরে দাঁড়ায় কি ব্যাপার হ্যাঙ্ক?

আমার বিশ্বাস, মিঃ ওয়েস্টনের ফিশিং লজেই লোগান লুকিয়ে আছে। হয়ত মিঃ ওয়েস্টন তার বন্দুকের ভয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

এ তুমি কি বলছ, হোলিসের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে রোজ জিজ্ঞেস করে, এ রকম অদ্ভুত ধারণা তোমার কি করেই বা হল?

আপনি যখন ওয়েস্টনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন আমি ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করে তাকাতে গিয়ে দেখেছি, টেলিফোনের তার কাটা। কোন টেলিফোনের মালিক নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে তার টেলিফোন শুধু শুধু অকেজো করে রাখবে না, রাখবে কি?

রোজের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। সত্যি তো হোলিস যা দেখেছে, সেটা তার আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। ঠিক আছে, রোজ বলে, আমরা এখন ফিরে যাব সেখানে। মিঃ ওয়েস্টনকে জিজ্ঞেস করব—

না শেরীফ, আমি আপনার সম্মানে আঘাত করতে চাই না, তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না যে, মিঃ ওয়েস্টন খুন হোক, চাইবেন কি?

তাহলে স্টেট পুলিশকে খবরটা জানিয়ে সতর্ক করে দিই, কিছু ভাবতে না পেরে ক্লান্ত গলায় রোজ বলে, যখন আমাদের করার কিছু নেই, তখন কি-ই বা আর করতে পারি?

আমি আবার বলছি শেরীফ, আমার অপরাধ নেবেন না, হোলিস শান্তগলায় বলে, স্টেট পুলিশকে এখন কোন কথা জানাবেন না, যতক্ষণ লোগান সেখানে আছে, পুলিশের সাধ্য নেই যে, মিঃ ওয়েস্টনকে বাঁচায়। অতএব আমি বলি কি, এ সমস্যার মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে খুব ঠাণ্ডা মাথায়। আমার মতে লোগানকে বুঝতে দেব না যে, আমরা জেনেছি সে সেখানে আছে। এই-ভাবে আমরা তাকে নির্ভাবনায় থাকতে দিতে চাই কিছু সময়। আর সেই সময়ে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মত এগিয়ে যেতে পারব।

তা কি তোমার সেই পরিকল্পনা ?

শেরীফ, আপনি যদি অনুমতি দেন তো বলি, হোলিস বলে, কাল সকালে আমি আবার এখানে ফিরে আসতে চাই ছদ্মবেশে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এইভাবে শত্রুপক্ষের শিবিরে গিয়ে তাদের খতম করার ট্রেনিং আমার নেওয়া আছে। আমি আবার বলছি শেরীফ, লোগান যদি বুঝতে পারে যে, তার উপরে কোন চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে না, তাহলে সে তখন নির্বিবাদে আরাম করবে। আর সেই সুযোগে আমরা তার নাগাল পেতে পারি অনায়াসে। এখন কথা হচ্ছে সেই সময়টার জন্যে আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে খুনীর উপরে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমরা ঠিক এই পন্থাই অবলম্বন করেছিলাম।

হোলিস মন্দ প্রস্তাব দেয়নি। ছোকরার সাহস এবং বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে। তবে রোজের মন থেকে দ্বন্দ্ব কাটে না। টম ম্যাসনও এমনি দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে।

ঠিক আছে বৎস, রোজ বলে, তোমার কথামতই আমরা এগোব, তবে তার আগে একবার জেনারকে খবর দিয়ে রাখতে চাই।

হোলিস মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়।

আমি আবার মাফ চেয়ে নিচ্ছি শেরীফ, ও ভুলটা করবেন না। ব্যাপারটা আমরা কাউকেই জানতে দিতে চাই না এখন। জেনারকে বললে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠবেন। তার ফল হবে উল্টো। লোগান যদি জানতে পারে, তাকে ধরার চেষ্টা হচ্ছে, তখন মিস্টার ওয়েস্টনকে বাঁচানো সম্ভব না। হয়ত আমরাও খতম হয়ে যেতে পারি।

বেশ তোমার কথামতই আমি এখন মুখে কুলুপ এঁটে রাখছি, কেমন ? হাসতে হাসতে রোজ বলে। তারপর তারা দুজনে কাদা প্যাচপেচে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে নিঃশব্দে। ভিয়েতনামের সেই দুর্গম বিপদসংকুল পথের কথা মনে পড়ে যায় হোলিসের পথ চলতে গিয়ে।

জুডলস এবং তার স্ত্রী কন্যা মৃত। কথাটা ভাবতে গিয়ে পেরীর বুকটা হাহাকার করে ওঠে। জুড ছিল তার প্রিয় বন্ধু। কতদিন এক সঙ্গে এক টেবিলে মদের সাথী হয়েছিল সে তার। তার মুখটা আজও যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সব রাগ গিয়ে পড়ল ব্রাউনের উপরে,

শয়তান। ছুটে গিয়ে শেরীফ রোজকে সব খুলে বলবে কিনা ভাবছিল পেরী। ব্রাউনকে ঘিরে তার রাতের দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে চায় সে।

ঠিক সেই সময়ে ধূমকেতুর মত তার সামনে এসে হাজির হল ব্রাউন। চমৎকার অভিনয় করলে পেরী, হাততালি দিয়ে ওঠে ব্রাউন, তোমার এই সুন্দর অভিনয়ের জন্য আজ আমি তোমাকে নিরামিষ রান্না করে খাওয়াব, চিকেনের থেকেও অনেক ভাল স্বাদ—

পেরী হতাশ হয়ে বসে পড়ে বলে, আমি কিছুই চাই না। হাতের রিভলবারটা নাচাতে নাচাতে ব্রাউন বলে, হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয়ই চাও বৈকি। একটা বড় গোছের স্কচ তোমার এখুনি দরকার। ওয়াইন ক্যাবিনেট থেকে স্কচের বোতল বার করে এনে তার সামনে মেলে ধরে ব্রাউন।

এক চুমুকে প্রায় দু'পেগ স্কচ গলাধঃকরণ করে পেরী খিঁচিয়ে ওঠে, শয়তান, তুমি আমার একজন ভাল বন্ধুকে খুন করেছ?

ব্রাউন স্রাগ করল।

সে যে তোমার বন্ধু ছিল আমি জানতাম না। আর জানলেও কোন তফাৎ হত না। তোমার বদমেজাজী সেই বন্ধুটা আমার মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল বলেই তো আমাকে অমন নিষ্ঠুর হতে হয়েছিল। কি ঘটেছিল জান? ব্রাউন বলতে থাকে, আমার গাড়ীর দুর্ঘটনায় দু'জন পুলিশ অফিসার নিহত হয়। আমি তখন গাড়ী ফেলে রেখে পালিয়ে আসি, দশ মাইল পথ ছুটতে হয় আমাকে। পেটে একটা দানাপানিও পড়েনি তখন। আমার তখন ভীষণ খিদে পেয়েছিল। তোমার ঐ বন্ধুর দরজায় নক করতে দরজা খুলে দেয় সে। হুড়-মুড় করে ভিতরে ঢুকে দেখি টেবিলের উপরে থরে থরে ভাল ভাল খাবার সাজান রয়েছে। তারা তখন নৈশভোজের আয়োজন করছিল বোধ হয়। আমি তাদের কাছে খাবার চাইলাম। তা তোমার ঐ বন্ধুটি কি বলল জান? রাস্তায় ভিক্ষে করে খেতে পারো না। আমার তখন প্রচণ্ড রাগ হল। আর তুমি তো দেখছ, আমার কেউ চাপ সৃষ্টি করলে, কেউ আমাকে রাগিয়ে দিলে আমি তখন আর মানুষ থাকি না। হিংস্র জানোয়ারের শক্তি চেপে বসে আমার দেহে তখন। সেই অবস্থায় তোমার বন্ধু আমার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি তখনি তার খাবার বাড়ির একটা শেড থেকে কুঠার কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা মারি প্রচণ্ড আক্রোশে। দরজা ভেঙ্গে পড়ে একটু পরেই। তারপর ছুটে গিয়ে প্রথমে তোমার বন্ধু তারপর তার স্ত্রীকে সেই কুঠারের আঘাতে

হত্যা করি। তোমার বন্ধুর মেয়ে তখন তাদের মৃত্যু যন্ত্রণার আওয়াজ শুনে দোতলা থেকে ছুটে নেমে আসছিল, সেখানেই আমি তাকে একইভাবে খুন করি, পরে একজন পুলিশ অফিসার তদন্ত করতে এলে তাকেও ঠিক একইভাবে আমি খুন করি। সব শেষে পেট ভরে তাদের খাবারগুলো খাই। আর কি ভাল স্বাদ সেই সব খাবারগুলোর! অমন সুস্বাদু খাবার বোধ হয় অনেক দিন খাইনি আমি। এই হল আমার অতগুলো মানুষ খুনের ইতিহাস। বল, তুমিই বল দোষ কি শুধু আমারই ?

হঠাৎ কথা বলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখ, ঠিক খুনীর মতন।

পেরী দেখে ব্রাউনের দৃষ্টি তখন টেলিফোনের কাটা তারের উপরে।

গড্ডাম্যান, ব্রাউন বিড় বিড় করে বলে, তারটা লাগিয়ে রাখা উচিত ছিল। তা ঐ টিকটিকির বাচ্চা দুটো দেখেনি তো ?

আড়াল থেকে দেখে মনে হ'ল বুড়ো লোকটা তেমন বিপজ্জনক নয়, কিন্তু ঐ ছোকরাটাকে কঠোর দেখাচ্ছিল। ঠিক আছে, আমি দেখছি এই বলে ম্যাসনের বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে ফিশিং লজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে গেল, কোন রকম চালাকি করার চেষ্টা করবে না বাস্টার্ড। তার কি পরিণতি হতে পারে, সে কথা আশা করি নতুন করে তোমাকে শোনাতে হবে না, কেমন ?

অতঃপর স্কচের গ্লাসে আর এক চুমুক দিতে একা একা পেরী ভাবে, এখন সে আর কোন কিছুতেই ভয় পায় না। সে এখন মৃত্যুর শেষ সোপানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই যখন নেই, মিথ্যে মৃত্যুকে ভয় করে কি লাভ! আচ্ছা রোজ আর হোলিস কি আবার ফিরে আসবে ? পেরী ভাবে, তারা কি টেলিফোনের কাটা তারটা দেখতে পেয়েছে ? ব্রাউন তাকে রেহাই দেবে না। সে তাকে শাসিয়েছে, একসঙ্গে দুজনে জোড়া কফিনের সাথী হবে। এই মুহূর্তে তার বাঁচতে খুব ইচ্ছে হ'ল। আজই প্রথম তার মনে হ'ল, তার নিজের জীবন কত না মূল্যবান, কত কি না দেবার আছে এখনো তার এই পৃথিবীকে। সাতটা দশ, বাহিরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। পেরী ভাবে, যে কোন মুহূর্তে তার জীবনেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে পারে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ব্রাউন ফিরে এসে দরজা বন্ধ করতেই পেরীর চিন্তায় বাধা পড়ল, চোখ মেলে তাকাল সে তার দিকে।

ওরা চলে গেছে, ব্রাউন মুখ খোলে, স্টুপিড! টেলিফোনের কাটা তারের

দিকে নজর দেওয়ার মত আদো বুদ্ধি-সুদ্ধি ওদের নেই। আমি ওদের গাড়ী পর্যন্ত অনুসরণ করেছিলাম। ওরা আর ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। এখন নিশ্চিন্তে তোমার নৈশ ভোজের আয়োজন করতে চললাম আমি।

নৈশভোজের পর ব্রাউন বলে, আজ রাতে আমি তোমার ঘরে তালা লাগিয়ে দেব। আমার ঘুম পাতলা। কোন ঝামেলা হলে আমি একাই তার মোকাবিলা করতে পারব, বুঝলে ?

নিশ্চয়ই ! পেরী মাথা নেড়ে সায় দেয় !

জ্যাকসনভিলের বিমান বন্দরে পেঁছে শীলা দেখল, বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। অথচ এই বৃষ্টি মাথায় করে পেরীর ফিশিং লজে যাওয়াও সম্ভব নয়। পেরীর ফিশিং লজ সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। সে কেবল জানে সেটা রকভিলের কোথায় যেন। পেরীর মুখ থেকে শুনেছে, নদীর ধারে সেই ফিশিং লজ। ওর খুবই ইচ্ছে ছিল শীলা তাকে সঙ্গ দেয় সেখানে কিন্তু সে কোন আগ্রহ দেখায় নি। আর এখন সে সেখানে যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব।

শীলা শুনেছে পেরীর কাছে তার ফিশিং লজে নাকি ভাড়া গাড়ীতেও যাওয়া যায়। এখানকার হার্জ ভাড়া গাড়ীর গ্যারেজে খবর নিলে কেমন হয় ? তারা হয়ত জায়গাটা চেনে।

হার্জরেণ্টাল অফিসে ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র শীলার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে হাইভোল্টেজের বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল যেন। পুরুষোচিত চেহারা। সুপুরুষ। গভীর চোখের দৃষ্টি। রিসেপসনিস্টের সঙ্গে কথা বলছিল সে। হার্জ মেয়েটি খবর দিল, পেরী তাদের কাছ থেকে গাড়ী ভাড়া করেছে বটে, তবে তার ফিশিং লজ সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। সেই সময়ে ফ্র্যাঙ্কলিন পাশ থেকে দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। নিজের থেকেই শীলার সামনে এসে সে বলে, মাফ করবেন ম্যাডাম, আপনার কথা শুনে মনে হল আপনি আপনার স্বামী মিঃ ওয়েস্টনের ফিশিং লজে যেতে চান। আমি আপনার স্বামীর প্রতিবেশী, আমারো একটা ফিশিং লজ আছে সেখানে, ওঁর ফিশিং লজ থেকে মাইল খানেক দূরে। অতঃপর ফ্র্যাঙ্কলিন তার পরিচয় দিয়ে বলে, জানিনা আমি আপনার কি কতখানি উপকারে আসতে পারব—

কি আশ্চর্য মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন, দেখুন কেমন অদ্ভুত ভাবে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেল। আমার মনে পড়ছে আমার স্বামীর মুখে আপনার নাম বোধহয়

আমি শুনেছি। কেমন অনায়াসে মিথ্যে কথা বলে গেল শীলা।

রকভিলের দিকেই আমি যাচ্ছি, পথ দেখিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি, তবে আজ রাতে নয়, কাল সকালে। শুনেছি ওখানকার আবহাওয়া ভাল নয়, তাই কেন ঝুঁকি নিতে চাইনা।

তার মানে আজ রাতটা কোন হোটেলে কাটাতে হবে। এ এক রকম ভালই হল, সঙ্গে ফ্র্যাঙ্কলিন থাকলে বিছানায় সুখ নিদ্রায় রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে। বাকিটা টানটান করে ডেস্কের সামনে থেকে সরে এসে ফ্র্যাঙ্কলিনের গা ঘেষে দাঁড়াল শীলা, হার্জ মেয়েটির কান বাঁচানোর জন্যে। ফ্র্যাঙ্কলিনও চায় হার্জ মেয়েটি তাদের কথাবার্তা না শুনুক।

আমি আমার স্বামীকে চমকে দেওয়ার জন্য সেখানে যাচ্ছি। শীলা বলে, আমার যাওয়ার কথা সে জানে না। আপনার কোন ভাল হোটেল জানা আছে?

ফ্র্যাঙ্কলিনের চোখে ভ্রূ দুলে উঠল। শীলার আয়ত চোখের অসহায় দৃষ্টি। মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলে, অবশ্যই আছে এখানে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাকে আসতে হয়, সেই সুবাদে আমি আপনার জন্য হোটেল নয় একটা মোটেলের ব্যবস্থা করে দিতে পারি, চলবে?

আবার সেই অসহায় দৃষ্টির ছায়া পড়ল শীলার চোখের তারায়।

আপনি যা ভাল মনে করেন করুন, রাতটা যেন ভাল কাটে। শীলা ইঙ্গিতে কি বোঝাতে চাইল ফ্রাঙ্কলিনের না বোঝার বয়স নয়। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে সে তার আগ্রহটা চেপে গেল।

এক সময় ফ্র্যাঙ্কলিন ট্যাক্সি ডাকতে চলে গেলে পর শীলা সেই হার্জ মেয়েটির কাছে এসে জানতে চাইল, লোকটা কে? কি তার পেশা?

মেয়েটির ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, শীলার মনের খবর সে পেয়ে গেছে ততক্ষণে, সে জেনে গেছে আজ রাতটা শীলা? তার সঙ্গে স্ফূর্তি করে কাটাতে চায়, তাই তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে চাইছে।

নিউইয়র্কের আইন বিশেষজ্ঞ, ফ্র্যাঙ্কলিন এ্যান্ড বার্ণস্টেন কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার মিঃ ফ্র্যাংকলিন, মিসেস ওয়েস্টন। আপনি ওঁকে একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি বলে ধরে নিতে পারেন।

সেই মুহূর্তে দুটি মেয়ের ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি বিনিময় হয়ে গেল। ধন্যবাদ, বলে শীলা তার বসার আসনে ফিরে এল অতঃপর। ট্যাক্সিতে আসতে গিয়ে ফ্রাঙ্কলিন বলে, আমরা যখন উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আপনি আমাকে জেনি

বলে ডাকতে পারেন।

নিশ্চয়ই, আর আপনিও আমাকে শীলা বলে ডাকতে পারেন।

শীলা! নামটা ভারী সুন্দর তো! ফ্র্যাঙ্কলিন তার হাতে আলতো করে চাপ দেয়।

মোটেলে শীলাকে পেঁছে দিয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন বলে, একটু পরে আমি আপনাকে নৈশভোজের জন্য নিয়ে যেতে আসছি, আপনি ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে আরাম করুন, কেমন?

সুন্দর করে হেসে তার চোখে চোখ রাখল শীলা। শীলার আয়ত চোখে কামনা থিক্‌থিক্ করতে থাকে। ফ্র্যাংকলিন বেশী সময় তার দিকে চোখে চোখ রাখতে পারল না। বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

নৈশভোজের টেবিলে কথায় কথায় শীলা জানতে চাইল, জেনি, আপনার পেশা কি, তা তো জানা হল না?

পেশা আমার আইন ব্যবসা, কেমন মনে হয়?

অপূর্ব! আইন ছাড়া এক পা-ও আমরা নড়তে পারি না।

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন, ফ্র্যাংকলিন বলে, এই দেখুন নারকভিলেয় যাচ্ছি, আপনার স্বামীর সঙ্গে আইনের ব্যাপারেই পরামর্শ করতে।

সঙ্গে সঙ্গে শীলার মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে, পেরীর সঙ্গে? কেন, আপনি শোনেন নি, মিলাজ এস· হার্ট এবং আপনার স্বামী দুজনে মিলে একটা বিরাট ছবি প্রযোজনা করতে যাচ্ছেন? আইন সংক্রান্ত দিকটা দেখার ভার আমার উপরে।

মিলাজ এস· হার্ট?

হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে। আমার একজন দামী মক্কেল। ওঁর নাম শুনে মনে হচ্ছে, আপনি খুব বিস্মিত?

জানি না, তাচ্ছিল্যের মত করে শীলা বলে। এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে আইন ব্যবসার পেশাটা ভাল নয়, অত্যন্ত জটিল এবং জঘন্য।

সেই বাস্টার্ড হার্ট লোকটা তার স্বামীকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। এখন সে নিশ্চিত ঐ লোকটাই তার পিছনে ব্ল্যাকমেলার লেলিয়ে দিয়েছিল। ফ্র্যাংকলিন সম্বন্ধে এখন আর কোন দুর্বলতা নেই তার। আজ রাতে তার শয্যা-সঙ্গিনী হওয়ার তাগিদটা তার মন থেকে উবে গেছে এখন।

আর তাছাড়া সে আগ্রহ দেখালেও মনে হয় না ফ্র্যাঙ্কলিন তার আহ্বানে সাড়া দেবে। মনে আছে, এয়ার পোর্টে একবার সে ইচ্ছে করে তার স্কার্টটা হাঁটুর অনেক উপরে তুলে ধরেছিল ফ্র্যাংকলিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল। মনে হয় সেই ব্ল্যাকমেলারের মত এই লোকটাও হার্টের এজেন্ট।

শীলার চোখে চোখ রেখে ফ্র্যাংকলিন বলে, আপনি বলেছেন, স্বামীকে না জানিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছেন, কাজটা বোধহয় ভাল করলেন না।

কেন, আপনার কি মনে হয়, হঠাৎ সেখানে আমার উপস্থিতিতে বিরক্ত বোধ করবেন আমার স্বামী ? না, কখনই তা হতে পারে না। শীলা জোর দিয়ে বলে, আমার স্বামীকে আমি বেশ ভালভাবেই জানি, পেরী সে ধরনের লোকই না। তাছাড়া আমরা পরস্পর পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসি।

আমার প্রশ্নটা তা নয় শীলা, ফ্র্যাঙ্কলিন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলে, মিঃ হার্ট চান, আপনার স্বামীর এবারের চিত্রনাট্যটা যেন অনবদ্য হয়, দর্শকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার ঝড় তুলতে পারে। সেসব দুরূহ ব্যাপার। তাই সেই রকম উৎকণ্ঠ ধরনের চিত্রনাট্য করতে হলে একটা নিরিবিলি পরিবেশের প্রয়োজন। তাই তো আপনার স্বামী তাঁর ফিশিং লজটা তাঁর আদর্শ জায়গা বলে নির্বাচিত করেছেন। তা আপনি কি চান না, আপনার স্বামীর যশ-প্রতিপত্তি এবং অর্থের সমাগম হোক, আমার মতে আপনি সেখানে গিয়ে আপনার স্বামীর উপকারের থেকে অপকারই বেশী করবেন।

থামুন মিঃ ফ্রাংকলিন, শীলা মৃদু চিৎকার করে ওঠে, আমি চাই না আমার এবং আমার স্বামীর ব্যাপারে বাইরের তৃতীয় কোন ব্যক্তি অহেতুক নাক গলাক।

নাক আমি গলাতে চাই না, ফ্র্যাংকলিনের মুখের হাসিটা হঠাৎ মিলিয়ে যায়, আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই, শীলা, আপনি কি আপনার স্বামীকে হারাতে চান ?

সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, শীলার মুখে বিরক্তিভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়, তবে আপনাকে অহেতুক কৌতূহল দমন করার জন্য বলছি, কান খুলে শুনুন জেনি, আমি তাকে কখনও হারাব না। সে আমাকে গভীরভাবে ভালবাসে। বিরাট তার সম্পত্তি, প্রচুর অর্থ, তার যা কিছু অর্থ প্রতিপত্তি সবই আমার জন্য।

এ সব তো আপনার অনুমান মাত্র শীলা, ভাগ্যগুণে আপনি একজন গুণী

বিত্তবান পুরুষকে স্বামী হিসেবে পেয়েছেন, ক্র্যাংকলিন বলে, কিন্তু আপনার বদ স্বভাবের জন্য সে অধিকার আপনি আর ধরে রাখতে পারবেন না। জানেন শীলা, আপনার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য আপনার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ আপনার স্বামীর হাতে আছে।

তাই নাকি? ভারী মজার খবর তো! শীলার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে সে। সেই সঙ্গে তার ভয়ও যে হয় না তা নয়। একটু আগে সব উৎসাহ, স্বামীর প্রতি দাবী, ভালবাসা, সব যেন কেমন মিথ্যে, ফাঁকি বলে মনে হল। তার পায়ের তলাকার মাটি যেন সরে যাচ্ছে একটু একটু করে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই শীলা, ক্র্যাংকলিন বলে, তাই আমি বলি কি, কাল আমি আপনাকে এয়ারপোর্টে পেঁছে দিয়ে আসব। বাড়ি ফিরে যান।

ধন্যবাদ আপনার পরামর্শের জন্য, শীলা কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, আমার এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। বিছানায় চললাম। কাল সকালে আপনি আমাকে পেরীর ফিশিং লজে পেঁছে দিচ্ছেন। যদি আপনি না নিয়ে যেতে চান, তাহলে আমি আমার পথ খুঁজে নেব।

এ আপনি স্বার্থপরের মত কথা বলেছেন, ক্র্যাংকলিন তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়, আপনি একবারও আপনার স্বামীর কথা চিন্তা করে দেখলেন না।

আমার বাবাও আমাকে ঠিক এই কথা বলতেন, আমি তাঁর কথায় কান দিই নি, আজ আপনার কথাও শুনতে রাজী নই। পেরীর কাছে আমি যাবই। তার কাছে না গিয়ে বাড়ী আমি ফিরতে চাই না।

পেরী তার কাজ খারাপ করতে চায় না, সে কথা কি আপনি জানেন? ক্র্যাংকলিন তাকে শেষ বারের মত বাধা দিয়ে বলে, আপনার স্বামীর কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটুক তা কখনই বরদাস্ত করবেন না মিঃ হার্ট।

মিঃ হার্টকে আপনি ভয় করতে পারেন, শীলা সাফ জবাব দেয়, কিন্তু আমি তাকে বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করিনি কখনও, আজও করব না। শুভ রাত্রি! রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যায় যায় শীলা অতঃপর।

ছয়

পরদিন বেলা দশটায় ঘুম ভাঙ্গল ডেপুটি শেরীফ হ্যাংক হোলিসের। শেরীফ রোজের বাড়িতে শয়নকক্ষে রাত কাটাতে হয়েছিল তাকে। এখান থেকেই সে যাবে পেরীর ফিশিং লজে।

মেরী তাকে প্রাতঃসম্ভাষণ জানিয়ে ব্রেকফাস্টের টেবিলে আহবান করল। তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াল। অনেকদিন পরে মেরীর হাতের ভাল রান্না খেয়ে তৃপ্তি বোধ করল হোলিস।

মেরী তাকে অনেক অনুরোধ করল, পেরীর ফিশিং লজে না যাওয়ার জন্য। সে তাকে এ কথাও বলল, রোজ নাকি টমের মত অসময়ে তাকে হারাতে চায় না। কিন্তু হোলিস তার সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়তে চায় না। এ কাজে তার অভিজ্ঞতা অনেক। ভিয়েতনমের যুদ্ধে লোগানের থেকে অনেক বেশী নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর শত্রুপক্ষের সঙ্গে তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। লোগান তো তাদের কাছে শিশু মাত্র। সে শুধু রোজের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিল, লোগানকে দেখামাত্র গুলি করতে চায় সে।

কিন্তু হোলিস, সে তো বে-আইনী হবে, রোজ আপত্তি জানিয়েছিল প্রথমে।

তাই বা কেন হবে? হোলিস তার যুক্তির সমর্থনে বলে, সে যে আমার উদ্দেশ্যে প্রথমে গুলি ছোড়েনি তারই বা কি প্রমাণ থাকবে। অতএব আত্মরক্ষা করার জন্য আমি যে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম, সে কথা বললে কারোর সন্দেহ জাগতে পারে না।

মন্দ কথা বলেনি হোলিস, শেষ পর্যন্ত রোজ তাকে সমর্থন করে বলেছিল, ঠিক আছে বৎস, তুমি তোমার ইচ্ছেমত কাজ করতে পার অবস্থা বিশেষে। তোমার যে কোন কাজে আমার সমর্থন রইল।

হোলিসকে সমর্থন করার একটাই কারণ, রোজ তার প্রিয় বন্ধু জুড লস এবং তার সুযোগ্য সহকারী ম্যাসনকে হারিয়ে মনে মনে দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই লোগানকে খতম করতে এখন আর তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

হোলিসকে বিদায় জানাতে এসে রোজ তার সাথী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতেই সে বলে, না স্যার, আপনার বয়স হয়েছে, এই বয়সে আমার মত অত ধকল সইতে পারবে না। আপনি বরং বাড়িতে থাকুন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে বেতারে খবর পাঠাব আপনার কাছে। তাছাড়া আমাকে কখন কোথায় থাকতে হয় কে জানে? হয়ত আমাকে সারা দিন, সারারাত ফিশিং লজের সামনে কোন গাছের উপরে বসে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করে নজর রাখতে হবে সেখানে লোগান একান্তই আছে কিনা! ভুল আমারও হতে পারে। বলে হাসল হোলিস।

মেরী চোখ ছলছল করে অনুরোধ করল, যাচ্ছো যাও, তবে খুব সাবধানে থেকো, সাহস দেখাতে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় এমন কোন কাজ কর না, যাতে ম্যাসনকে হারিয়ে যে দুঃখ হয়েছে দ্বিতীয়বার তা যেন না হয় রোজের।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, হোলিস তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, আপনার কথা আমার সব সময় মনে থাকবে। তাছাড়া পুলিশের চাকরীতে যে কোন কাজে ঝুঁকি তো থাকবেই!

রোজ তাকে খানিকটা পথ এগিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল অতঃপর। আকাশে তখন ঝলমলে রোদ, বৃষ্টি থেমে গেছে।

বেলা তখন ন'টা, রাতের পোষাক বদলে বাইরে যাওয়ার পোষাক পরে মোটেলের বাইরে এস দাঁড়াল শীলা। মোটেলের ঠিক উল্টো দিকের রাস্তায় ক্যাব ক্যাল হাউনের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স। ফিশিং লজে থাকার জন্য তাকে কিছু সুতীর পোষাক এবং জল কাদায় হাঁটার উপযোগী গামবুট কিনতে হবে। দোকানের মালিক ক্যাব ক্যালহাউনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল তার, ভদ্রলোক নিগ্রো। অত্যন্ত অমায়িক এবং ভদ্র, তার চোখের চাহনি অন্তর্ভেদী, শীলার মন জয় করতে বেশী সময় লাগল না তার।

শীলা তার পরিচয় দিতেই খুশিতে উপচে পড়ল ক্যাব। পেরী ওয়েস্টন তার পরিচিত খরিদ্দার। পেরীকে সে ভালরকমই চেনে। তবে দুঃখ করে বলল, বছর তিনেক পেরীর সঙ্গে তার নাকি দেখা হয়নি। সে নাকি একদিন পেরীর ফিশিং লজে মাছ ধরতেও গিয়েছিল। তার কাছ থেকেই ফিশিং লজের সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করল শীলা, সেই সঙ্গে একটা জীপও ভাড়া করল। ক্যাব একজন নিগ্রো চালক তার সঙ্গে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু শীলা রাজী হয়নি। সে

নিজেই ড্রাইভ করতে পারবে। ক্যাব তাকে পেরীর ফিশিং লজে যাওয়ার রাস্তার একটা ম্যাপ এঁকে দেয়।

মিনিট চল্লিশ পরে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের ক্লোকরুম থেকে পোষাক পাল্টিয়ে যখন বেরিয়ে এল রাস্তায় তখন তাকে অসম্ভব স্মার্ট এবং সেক্সী দেখাচ্ছিল। লাল সাদা সুতীর স্কার্ট, আঁটো জিনস্, উঁচু হিলের গামবুট। পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে ক্যাব তার দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ, মনে মনে খুশি হয় শীলা। কোন পুরুষ তাকে দেখে মুগ্ধ হলে গর্ববোধ করে সে, সেই সঙ্গে কামনা বোধটাও প্রচণ্ড বেড়ে যায় তার। কিন্তু ক্যাবকে নিয়ে এখন স্ফূর্তি করার সময় নয়। রাত হলে অন্য কথা ছিল। তাছাড়া পেরীর কাছে যাওয়ার জন্য মনের দিক থেকে ভীষণ তাগিদ অনুভব করছিল শীলা অনেকক্ষণ থেকে।

পোষাকের দাম চেকে মিটিয়ে ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স থেকে বেরিয়ে এসে দেখে ক্যাব অপেক্ষা করছে রাস্তায় ভাড়া করা জীপের সামনে, চলে আসার সময় ক্যাব তাকে অনুরোধ করে পেরীকে তার কথা যেন বলে শীলা। খুব শীগ্‌গির পেরীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার বাসনা রইল তার।

শীলা তার সাহায্যের জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না।

মোটেল থেকে লাগেজগুলো নেওয়ার জন্য রাস্তা পার হওয়ার মুখে ফ্র্যাঙ্কলিন সঙ্গে দেখা হয়ে গেল শীলার। শীলা লক্ষ্য করল, ফ্র্যাঙ্কলিন তার দিকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

সুপ্রভাত শীলা, ক্লান্ত গলায় সে বলে, আমার নিষেধ সত্ত্বেও দেখছি আপনি মিঃ পেরীর ফিশিং লজে যাচ্ছেন।

তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখতে গিয়ে শীলার মুখটা হঠাৎ কেমন কঠিন হয়ে উঠল।

হ্যাঁ, আপনার অনুমান ঠিক। আমি এখনো ঠিক স্বার্থপরের মতই ব্যবহার করছি এবং অপরের অনিষ্টকারক, তাই না মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন? আর কথা না বাড়িয়ে শীলা তার পাশ কাটিয়ে মোটেলের লবিতে গিয়ে ঢুকল।

ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙতেই পেরী ওয়েস্টন অনুভব করল, দিনের তাপমাত্রা আগের দিনের থেকে বেড়ে গেছে। শয়ন কক্ষের জানালা পথে তাকাতেই সে দেখল, বাইরের আকাশ তখন মেঘমুক্ত, ঝলমল করছে রোদ্দুরে। কব্জির ঘড়ির দিকে নজর দিতেই দেখল সে, সাড়ে আটটা তখন। তখনো তার শয়ন কক্ষের

বাইরে তালা লাগান। অর্থাৎ ব্রাউন তার ঘরের দিকে ফিরেও তাকায়নি। নিচে একতলার কোন সাড়া শব্দও শোনা যাচ্ছে না, গেল কোথায় সে? ভাবল পেরী।

যাই হোক, ইতিমধ্যে দাড়ি কামিয়ে রাতের পোষাক বদলে ফেলল সে। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল সে ব্রাউনের জন্য, প্রচন্ড খিদেও পেয়েছিল।

ব্রাউন এল ঠিক দশটায়। দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকল সে, পরণে তার ঢোলা হাতার শার্ট। মুখে সেই ধূর্ত হাসিটা এখনো লেগেছিল।

জান পেরী, সারা রাত ধরে আমি আমার ঘুম তাড়িয়েছি, বলল সে, ব্রেকফাস্ট তৈরী, আনব? কথা বলার ফাঁকে ঘরের চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল সে। এক সময় টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা ফটো হাতে তুলে নেয় সে।

এ তোমার মেয়ে বন্ধু?

না, আমার স্ত্রী, রুক্ষস্বরে জবাব দেয় পেরী।

তাই নাকি? ভারী চমৎকার মেয়ে তো। তুমি দেখছি ভাগ্যবান পুরুষ। এক-একজন পুরুষ তোমার মতই ভাগ্যবান হয়ে থাকে। মনের মত মেয়ে পেলাম না যে বিয়ে করব। বিবাহিত জীবন তোমার পছন্দ?

পেরী এবার সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, আমার এখন এই মুহূর্তে পছন্দ হ'ল এক কাপ কফি, বুঝলে?

ঠিক আছে, এখুনি এনে দিচ্ছি।

খানিক পরে টেবিলের উপরে ব্রেকফাস্ট এবং কফির কাপ সাজাতে ব্রাউন বলে, তোমার ফ্রীজে থরে থরে খাবারের জিনিস সাজান। পয়সা থাকলে কিনা করা যায়, পেরীর সামনে একটা চেয়ারে বসতে গিয়ে সে বলে, সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে নিউইয়র্কে তুমি বেশ প্রতিষ্ঠিত এবং একজন বিত্তবান প্রভাবশালী ব্যক্তি।

পেরী তখন খেতে শুরু করেছিল। সত্যি ছোকরা খুবই ভাল রাঁধতে পারে। সব খাবারই খুব সুস্বাদু।

আমি কিন্তু লং আইল্যান্ডে থাকি। একটু থেমে পেরী বলে, তোমার প্রচুর অর্থ থাকলেও দেখতে হবে, তুমি কি চাও। তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

তোমার মত এক সুন্দরী স্ত্রী আমি পেতে চাই, ব্রাউন বলে, কিন্তু সুন্দরী নারীরা বরাবরই আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে। তাই যখনই আমার নারী সংসর্গের ইচ্ছে হয়, তখন আমাকে কোন বারবনিতার শরণাপন্ন হতে হয়। তারাই আমার স্ত্রী, আমার সংসার, তাদের ঘরই আমার ঘর, আমার নিজস্ব কোন ঘর নেই, জান পেরী। পৈত্রিক ঘর তো নয় একটা পাখীর বাসা, কোন সুস্থ সবল মানুষ সেখানে বাস করতে পারে না।

তা এখানে তোমার থাকার পরিকল্পনা, কত দিনের জিম? এখানকার গরম আবহাওয়া যেদিন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখনি আমি এখান থেকে সরে যাব, তার পরে এক মুহূর্তও আমি আর অপেক্ষা করব না। বেতারে আমি শুনেছি, পুলিশ নাকি এখনো মরিয়া হয়ে আমাকে খুঁজছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তারা আমাকে এখানে হাজার চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবে না। তা তুমি বাজি ধরতে পার, আমার দশ হাজার ডলার চাই। ঠিক আছে, তাই পাবে, পেরী জিজ্ঞেস করে, কিন্তু তুমি যাবেই বা কোথায় জিম?

স্রাগ করল ব্রাউন। নিজেকে গোপন করার কায়দা-কানুন আমার বেশ ভালই জানা আছে। আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। বরং তুমি তোমার নিজের কথা চিন্তা কর।

কিন্তু নিজেকে তুমি কতদিনই বা আড়াল করে রাখতে পারবে জিম? এক-দিন-না-একদিন ধরা তো তোমাকে পড়তেই হবে। তখন তোমার জীবনে কি ঘটবে জান? জেলখানা হবে তোমার ঘর। পেশা হবে তেলের ঘানিটানা, অবশ্য তোমার বিচার শেষ হওয়ার পর।

তুমি ঠিক গম্ভামান্যান ধর্মযাজকের মত কথা বলছ, একটু উত্তেজিত হয়েই সে বলে, জেলে বন্দী করার মত ক্ষমতা তোমার ঐ তথাকথিত দুর্নীতি-পরায়ণ পুলিশের নেই। জীবিত অবস্থায় আমার কেশাগ্রও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। মরার আগে যত পারি ঐ বাস্টার্ড পুলিশের বাচ্চাগুলোকে খতম করে যাব, বুঝলে চিত্রনাট্যকার পেরী?

পেরী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, টেলিফোনের আওয়াজ হতেই বিস্ময় ভরা চোখে ব্লেডেলের দিকে তাকাল।

ব্রাউন তার মনের ভাব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলে ও হ্যাঁ, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, টেলিফোনের কাটা তারটা আমি জুড়ে দিয়েছি।

পেরী রিসিভারটা তুলে নেয় হাতে, হ্যালো, কে কথা বলছেন?

মিসেস গ্রেড, রকভিল পোষ্ট অফিস থেকে বলছি, মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে আসে দূরভাষে, আমি শুনেছি, আপনার ফোনটা নাকি বিকল হয়ে গিয়েছিল তাই।

আপনি ঠিকই শুনেছেন, পেরী মিথ্যে করে বলে, বোধ হয় ঝড় জলের জন্য টেলিফোনের লাইনটা সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে এখন ঠিক হয়ে গেছে, ও কে?

আমি জানতাম, ফোন আসবে, পেরী রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই ব্রাউন বলে, যাইহোক, বাইরে কারোর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা কর না যেন, মনে থাকবে তো?

তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, পেরী তাকে আশ্বস্ত করে বলে, এবার আমি আমার কাজ করতে চাই, আমি এখানে এসেছি, ছায়াছবির চিত্রনাট্য তৈরী করার জন্য। তা তুমি এখন কি করবে ব্রাউন?

টি-ভি'র সামনে বসে প্রোগ্রাম দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, ব্রাউন উঠে দাঁড়ায়, আমি চললাম পাশের ঘরে।

অতঃপর পেরী তার চিত্রনাট্য লেখার কাজে ডুবে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। লেখায় এমনি মশগুল হয়ে পড়ে যে, সময়ের হিসেব ছিল না। খেয়াল হ'ল ব্রাউন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে।

শীলার ফটোটার দিকে কামনার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ব্রাউন বলে, সত্যি চমৎকার দেখতে তোমার স্ত্রী, তোমার তুলনায় বয়স ওর অনেক কম, কি বল? ব্রাউন দাঁত বার করে বিশ্রীভাবে হাসে।

সে নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই, আছে কি?

ধূর্ত হাসি ফুটে ওঠে ব্রাউনের ঠোঁটে।

তা যা বলেছ, প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সে এবার জিজ্ঞেস করে, তুমি সিনেমার গল্প লেখ?

হ্যাঁ, সেই জন্যই আমার এখানে আসা।

গল্প লিখে অনেক টাকা রোজগার কর, তাই না?

হ্যাঁ, তা করি বটে, তবে টাকাই জীবনের একমাত্র গ্যারান্টি নয়। কথাটা বলে ব্রাউনের হাতের রিভলবারটার দিকে তাকাল পেরী। তার মনে হল, যে কোন মুহূর্তে ব্রাউন তার জীবন মূল্যহীন করে দিতে পারে। এই যে তার

এত অর্থ সম্পত্তি কোন কিছুর বিনিময়ে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

ব্রাউন তাকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় সে জিজ্ঞেস করে, তা তোমার নতুন গল্পের চরিত্র পেয়েছ ?

হ্যাঁ, সবেমাত্র পেলাম, আমার নতুন গল্পে দারুণ থ্রিল আছে।

কি রকম ?

সে তোমার জানার কথা নয়।

আমি হলপ করে বলতে পারি, ব্রাউনের ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল. তোমার নতুন গল্পের অনেক চরিত্রের মধ্যে আমি একজন।

তুমি যদি তাই মনে করে থাক, তাহলে তাই, পেরী ডেস্কের সামনে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।

খাবার তৈরী, এখনি এনে দিচ্ছি, ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ব্রাউন।

নদীর ধারে বাঁক নেওয়ার পথে প্যাট্রল কার থেকে নেমে নিঃশেষে হোলিসের হাতে শেরীফ রোজ রাইফেলটা তুলে দিয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল, রোজের চোখে বিচ্ছেদের করুণ ছায়া পড়ে।

কোন ঝুঁকি নিও না হোলিস, তোমার কোন অঘটন ঘটলে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না, ভিজে ভিজে গলায় রোজ বলে, তোমার সাথী হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু—

কোন চিন্তা নেই. আপনি সহজ হওয়ার চেষ্টা করুন শেরীফ হ্যাঙ্ক হোলিস তাকে আশ্বস্ত করে বলে, আমি সব সময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করব।

অতঃপর রোজ ফিরে আবার প্যাট্রল কারে উঠে বসে ইঞ্জিন চালু করল। গাড়ীটা তার দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, এক সময় নদী-পথে চলতে শুরু করল হ্যাঙ্ক, ফুটপাথ ধরে খুব সাবধানে। দৃষ্টি তার সজাগ। সেই ভয়ঙ্কর খুনী লোগান কে জানে কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে তবে ফেরার অপেক্ষায়। চারিদিকে জঙ্গল। ভিয়েতনামের জঙ্গলের পথের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানেও তাকে এমনি সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হত শত্রুপক্ষের জন্যে। কিন্তু ঐ লোগান, নিজের মনে সে বলে, তুমি তো জান না, তোমার ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে।

পেরী ওয়েস্টনের ফিশিং লজ থেকে প্রায় একশো গজ দূরে এসে নিজেকে

সাবধান করে দেয় সে। সাবধানে পা ফেলতে থাকে, পায়ের শব্দ এড়ানোর জন্য। আরো কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে একটা গাছের সামনে এসে থামল। সেখান থেকে মিঃ ওয়েল্টনের ফিশিং লজ স্পষ্ট দেখা যায়। খোলা জানালা, জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে তার মানে এই নয় যে, লোগান সেখানে কিংবা লজের আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে নেই। কোমরের বেল্ট থেকে ছুরিটা বার করে সে তার পায়ের বুটের মাটি চেঁচে গাছের উপরে ডালপালার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। আদর্শ জায়গায় বটে! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এখানে বসে থাকলেও কেউ তাকে দেখতে পাবে না, অথচ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অনায়াসে সে পেরীর ফিশিং লজের সব কিছু দেখতে পাবে।

গাছের উপরে স্থিতু হয়ে বসে রেডিওর সুইচটা খুলল হোলিস, শেরীফ রোজ এতক্ষণে তার বাড়ীতে ফিরে গেছেন নিশ্চয়ই, ভাবল সে। শেরীফ, একটা খুব ভাল গাছ পেয়ে গেছি, পেরীর ফিশিং লজের খুব কাছে। গাছের উপর থেকে ফিশিং লজের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সেখানে প্রাণের কোন চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না, সামনের জানালায় পর্দা ঝোলান। মনে হয়, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠিক আছে হ্যাঙ্ক, রোজ বলে, ডেস্কের সামনে থেকে আমি নড়ছি না। এখন, যখন খুশি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পার তুমি। তাহলে ঐ কথা রইল, বেতারের সুইচটা বন্ধ করে দেয় শেরীফ রোজ।

কব্জি ঘড়ির দিকে দৃষ্টি ফেলে একবার সময়টা দেখে নেয় হোলিস, দুপুর বারোটা। খিদে পেয়ে ছিল, মেরী রোজের দেওয়া স্যাণ্ডউইচ প্লাস্টিক প্যাকেট থেকে বার করে খেল সে। এখনো তাকে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে, কখন যে চেট লোগান ফিশিং লজ থেকে বেরিয়ে আসে, তার ঠিক নেই।

ঘণ্টা খানেক পরে হোলিস সমস্ত হ'ল গাড়ীর ইঞ্জিনের মৃদু শব্দ শুনে। তার দৃষ্টি প্রসারিত হ'ল সামনের দিকে।

সেই সময় একটা জীপ নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে আসছিল পেরীর ফিশিং লজের দিকে। একটু পরে জীপটা এসে থামল ফিশিং লজের সামনে। জীপ থেকে সোনালী চুলের একটি যুবতীকে নামতে দেখল হোলিস, তার পরণে— সাদা স্কার্ট, আঁটো জিনস্।

কি ব্যাপার? হোলিশের আশঙ্কা, সত্যিকারের জটিলতা শুরু হ'ল এবার। কে এই মেয়েটি? এখানে কি করতেই বা এসেছে সে?

মেয়েটি অধৈর্য হয়ে জোরে দরজায় ধাক্কা মারে। হোলিস একটা বাজে জায়গায় বসে থাকার দরুণ সামনের দরজাটা পুরোপুরি তার চোখে পড়ছিল না। দরজাটা খুলে যেতে দেখল সে, কিন্তু দরজার ওপারের লোককে দেখতে পেল না। মেয়েটির অঙ্গভঙ্গি দেখে তার মনে হল, ভিতরের লোকটার সঙ্গে তার বচসা হচ্ছিল, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, তবে বেশ উত্তেজিত দুজনেই। তারপর মেয়েটিকে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে দেখল সে এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

হোলিস এবার তৎপর হ'ল। বেতারের সুইচটা খুলেই তার প্রথম সম্বোধন হল, শেরীফ, এইমাত্র একটা ঘটনা ঘটে গেল এখানে। একটি যুবতী মেয়ে জীপ থেকে নেমে এইমাত্র লজে প্রবেশ করল। জীপটা জ্যাকসন ভিলের ক্যাব ক্যালহাউনের, দয়া করে এখুনি একবার সেখানে খোঁজ নেবেন?

ঠিক আছে, পাঁচ মিনিট পরে তোমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করছি, রোজ বেতারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

মশায় কামড়ে হোলিস তখন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। একবার সে ভাবল, হয়ত সে ভুল করছে; ফিশিং লজে লোগানের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু—

মিনিট দশেক পরে বেকারের সংকেত আসতেই আবার তৎপর হ'ল।

হ্যাঙ্ক, আমি রোজ কথা বলছি। ক্যাবের কাছ থেকে খোঁজ নিলাম। মেয়েটি পেরী ওয়েষ্টনের স্ত্রী, ভাড়া জীপ চালিয়ে সে তার স্বামীর কাছে গেছে এক সপ্তাহ ছুটি উপভোগ করার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোগান সেখানে নেই। জ্যাকলিন ঠিকই বলেছে, লোগান মিয়ামিতে চলে গেছে। অতএব তোমার ওখানে মিথ্যে সময় নষ্ট করার মানে হয় না, ফিরে এস।

না শেরীফ, আমি এখন ফিরছি না। লোগান যে সেখানে নেই, আমরা জানছি কি করে? তাই শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ছি না।

ঠিক আছে হ্যাঙ্ক, রোজ বলে, তোমার ফেরার খবর না পাওয়া পর্যন্ত ডেস্ক থেকে আমি নড়ছি না।

জীপ চালিয়ে পেরীর ফিশিং লজে আসতে গিয়ে শীলা অনুভব করল, ক্যাব ক্যালহাউন ঠিকই বলেছিল, বৃষ্টিতে পথঘাট গাড়ী চালানর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে গেছে। তখন তার কথা না শুনে কি ভুল যে সে করেছিল, সেটা সে জীপ চালাতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল। নেহাৎ মনের জোরে শেষ পর্যন্ত ফিশিং লজে এসে পেঁছিতে সক্ষম হ'ল।

ওদিকে তখন মিলাজ এস· হার্টের সেক্রেটারী মিস গ্রেস এ্যাডমসের ডেস্কে টেলিফোন বেজে ওঠে।

মিঃ জেনি ফ্র্যাঙ্কলিন কথা বলছি মিস এ্যাডামস, আমার অনুমান, এম· এস· এইচ· এখন হলিউডে, তাই না?

হুঁ। কি খবর?

খবর অশুভ। পেরীর স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তার ফিশিং লজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তাকে রুখবার জন্য, উত্তরে সে আমাকে বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করে মোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। মিঃ হার্ট ঐ কুত্তীকে বাগে আনতে পারেন।

তার মানে তুমি বলছ, শীলা তার স্বামীর সঙ্গে থাকতে গেছে। হ্যাঁ এতক্ষণ বোধ হয় পেঁাছে গেছে ফিশিং লজে।

এর অর্থ কি তা জান? আমাদের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীজের হাতে হ্যারিকেন। পেরী ওয়েণ্টনের সিনেমার গল্প লেখা ডকে উঠে যাবে। আর গল্প না হলে ফিল্ম তৈরী বন্ধ। আমরা বেকার।

স্বামীকে কাছে পেয়ে শীলা তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরে দু'হাত দিয়ে। এই প্রথম পেরী তার কাছ থেকে সত্যিকারের ভালবাসার স্পর্শ পেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠল পেরী, একটু আগের তার সব উচ্ছ্বাস মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। সারা মুখে পরিবর্তনের একটা ছায়া নেমে এল।

শীলার দৃষ্টি এড়ায় না। ভাল করে ঘরের চারিদিক তাকাতে গিয়েই তার নজরে পড়ল পেরীর পিছনে চেট লোগান দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার হাতে উদ্যত রিভলবার, মুখে কদর্য হাসি।

সাত

জিম ব্রাউন সামনের দরজা বন্ধ করে হোলস্টাতে রিভলভারটা গ‍ুঁজে রেখে তাদের লক্ষ্য করতে থাকে।

এসব কি ব্যাপার? উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে শীলা; এ লোকটাই বা কে?

ধীরে ধীরে উঠতে গিয়ে পেরী বলে, সাবধান প্রিয়তমা। এই লোকটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক।

তুমি ওকে একথা বললে বাস্টার্ড? ব্রাউন খিচিয়ে উঠল, এই মেয়েটিই তাহলে তোমার স্ত্রী? শোন বাস্টার্ড, কোন রকম চালাকি করতে যেওনা। আর দেখ, তোমার স্ত্রীও যেন আমার ব্যাপারে অহেতুক নাক না গলায়। আমার অবাধ্য হলে তোমাদের দ‍ুজনকেই একই কফিনে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করব, ব‍ুঝেছ?

এসব কি শ‍ুনছি পেরী, ব্রাউন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে পর শীলা জানতে চাইল, এসব কি শ‍ুনছি? কে এই লোকটা?

চুপ কর শীলা, দৈত্যের মত ঐ লোকটা যে কোন ম‍ুহ‍ূর্তে এসে যেতে পারে নিচু গলায় শীলার কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, সাংঘাতিক বিপজ্জনক ঐ লোকটা। গোখরো সাপের থেকেও ভয়ঙ্কর। প‍ুলিশ ওকে খ‍ুঁজছে। দ‍ু'দিন রাত্রে ছ'জনকে খ‍ুন করেছে।

ছ'জনকে খ‍ুন করেছে! দ‍ু'চোখে বিস্ময় শীলার।

হ্যাঁ প্রিয়তমা, মনে হয় লোকটা বিকারগ্রস্ত। অতএব এই লোকটার হাত হাত থেকে রেহাই পেতে হলে মাত্র একটাই উপায়, ওকে নির্বিঘ্নে থাকতে দেওয়া। একটু থেমে পেরী জিজ্ঞেস করে, কিন্ত‍ু তুমি এখানে কেন এসেছ, তা তো এখনো বললে না প্রিয়তমা?

আমি তোমাকে কিছ‍ু বলতে এসেছি প্রিয়তম, আমি আমার অভিনয়ে ক্লান্ত, অন‍ুতপ্ত। তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে।

দিন, তার জন্য পরে অনেক সময় পাব আমরা। এখন, এই মুহূর্তে ঐ শরতানটার কবলমুক্ত আমাদের হতে হবে, তা না হলে, আমরা দুজনেই শেষ হয়ে যাব।

ব্রাউনের পায়ের শব্দ শুনে তারা চুপ করল। একটু পরে সে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজের খাবার নিয়ে এসে হাজির হ'ল।

এই প্রথম শীলা লোকটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাল, তাকাতে গিয়ে তার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভূত হ'ল যেন। লোকটার বলিষ্ঠ চেহারা তাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল। সেই মুহূর্তে তার দেহের মধ্যে যৌন ক্ষুধার অনুভূত হ'ল।

টেবিলে খাবারের প্লেটগুলো রাখতে গিয়ে ব্রাউন বলে, শোন পেরী, তোমাকে এখন একটা কাজ করতে হবে, তোমার ব্যাঙ্কে গিয়ে দশ হাজার ডলার তুলে আনতে হবে, সব একশো ডলারের বল হওয়া চাই।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে পেরী, অসম্ভব। তোমার কাছে আমার স্ত্রীকে একা রেখে আমি এখন কোথাও যেতে পারবো না।

হ্যাঁ, যেতে তোমাকে হবেই, আমার হুকুম, ব্রাউন চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে থাকে, আমার কথার অবাধ্য হলে তোমাকে তো বলেছি, আমি আর আমার মধ্যে থাকি না। তোমাদের দুজনের জোড়া কফিনের ব্যবস্থা করে দিতে বাধ্য হব।

না, না, শোন পেরী, আর্ত কণ্ঠস্বর শীলার, ও যা বলে তাই কর।

তুমি খুব অবুঝ, ব্রাউন আবার মুখ খোলে, তোমার অবর্তমানে আমি তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে উপভোগ করব? কিন্তু আমি ওকে স্পর্শও করতে যাচ্ছি না, জেনে রাখ পেরী, তুমি টাকা নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা দু'জনে এখানে মুখোমুখি বসে থাকব, একচুলও নড়ব না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, কেমন?

অথচ শীলার মনে তখন অন্য চিন্তা।

ফুটপাতের ওপারে সেলফ্-সার্ভিস স্টোরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে ঢুকেছিল পেরী, ব্যাঙ্কে ঢোকার সময় রোজ তাকে দেখেছিল।

পেরী তখন কেনা-কাটা সেরে সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিল। রোজের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

আঃ বাজার করতে বেরিয়েছেন ? প্রসন্ন হেসে পেরীর সঙ্গে করমর্দন করে রোজ বলে, অনেকদিন হ'ল আপনার দর্শন পাইনি। আপনার ফিশিং লজে সব ঠিক ঠিক চলছে তো ?

চমকে ওঠে পেরী। তবে কি শেরীফ রাইনের কথা জানতে চাইছেন ?

হ্যাঁ, তেমন কোন সমস্যা নেই। সঙ্গে আমার স্ত্রীও আছে।

তা মেরী বলছিল, প্রয়োজন হলে সে আপনাকে সাহায্য করতে সেখানে যেতে পারে।

না, আপাততঃ কোন প্রয়োজন তো দেখতে পাচ্ছি না। দরকার হলে না হয় ফোন করব, পেরী জোর করে সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলে, ধন্যবাদ।

তা আপনি কি এখানে সিনেমার গল্প লিখতে এসেছেন মিঃ ওয়েস্টন ?

হ্যাঁ, জোর করে সহজ করার চেষ্টা করে পেরী বলে, এই খুনী লোকটা আমাকে গল্পের একটা প্লট দিয়েছে। আচ্ছা, তার কোন খবর আছে ? সে কি ধরা পড়েছে ?

না, তবে জোর তল্লাসী চলছে, রোজ বলে, পুলিশের বিশ্বাস, সে এখন মিয়ামির কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। অবশ্য ধরা তাকে একদিন পড়তেই হবে।

আমিও তাই মনে করি, পেরী আমাকে তার গল্পের মাধ্যমে বলে দিতে চাইল, চেট লোগান তার ফিশিং লজে লুকিয়ে আছে। গতকাল আপনি আমার ফিশিং লজে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। লোগান সেখানে আত্মগোপন করে আছে কিনা আপনারা চলে আসার পরেই প্লটটা আমার মাথায় এল, একজন খুনী আসামী এবং লেখক এক নির্জন ফিশিং লজে আটক হয়ে ও পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কাটাচ্ছিল তারা। কিন্তু ইতিমধ্যে লেখকের স্ত্রী হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হয়। লেখক তাকে আশা করেনি। এখন সেই গল্পের প্লট দারুণ জীবন্ত হয়ে উঠল। ঘাতকের সামনে দু'জন সম্ভাব্য শিকার, কি হয়, কি হয়! সে দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা, তাই না ? আমার কাহিনীর বুনিয়াদ ঠিক এই রকম একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি উপরে, কি বলেন শেরীফ রোজ ?

গল্পটা শুনে মনে হচ্ছে দারুণ থ্রিল আছে, রোজ বলে, আপনার গল্প অবলম্বনে অনেক ছবি দেখেছি। এ গল্প আরো ভাল হবে।

শুনে খুশি হলাম, পেরী বলে, কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কি ভাবে আমার এই গল্পটা শেষ করব। দেখুন শেরীফ রোজ, এই হ'ল গৃহকর্তা এবং তার

স্ত্রীকে পুলিশ উদ্ধার করতে এলে খুনী তাদের খুন করতে বাধ্য হবে। তারপর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে দিতে আমি চাই না। তা হলে আমার গল্প শেষে মুহূর্তে মার খেতে পারে।

রোজ এখন জেনে গেছে ওয়েস্টনের ফিশিং লজেই লোগান লুকিয়ে আছে। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

দেখুন মিঃ রোজ, আপনার মত আমি লেখক নই। তবু পুলিশ হিসাবে মনে হয় এ ব্যাপারে আমার মতামতটা আপনার কাজে লাগতে পারে।

বেশ তো, বলুন না।

আপনার গল্পের প্রধান চরিত্রটি এখনও পর্যন্ত এক মারাত্মক বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। রোজ বলতে থাকে। তার সামনে রিভলবার উঁচিয়ে খুনী, যে কোন মুহূর্তে গুলি ছুটে যেতে পারে। এই অবস্থায় দুজন পুলিশ অফিসার সেই ফিশিং লজে খুনীকে খুঁজতে গিয়ে তাদের সন্দেহ হয়, সেখানেই সে লুকিয়ে আছে, যদিও আপনার গল্পের সেই চরিত্রটি তার অবস্থানের কথা বেমালুম চেপে যায়। যেমন আমি এবং হোলিস আপনার ফিসিং লজে গিয়েছিলাম গতকাল। এখন সেই যুবক পুলিশ অফিসারটি নিজের জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে সেই ফিশিং লজের সামনের একটা গাছের ওপর ওৎ পেতে বসে আছে আপনার গল্পের প্রধান চরিত্রটিকে খুনীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। এক্ষেত্রে সেই খুনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম না হলেও সেই যুবক পুলিশ অফিসারটি তাকে অনায়াসে গুলি করে হত্যা করতে পারে।

তাই নাকি? পেরীর চোখে বিস্ময়, আমি তো এদিককার কথাটা ভাবিনি। সত্যি কোন পুলিশ অফিসার গাছের উপর থেকে খুনীর উপরে নজর রাখছে নাকি?

হ্যাঁ মিঃ ওয়েস্টন ঠিক তাই। এবার আপনার কর্তব্য হ'ল, ছবি হিট করাতে হলে আপনার সেই চরিত্রটিকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে, রোজ বলে, আর সেই কারণেই খুনীসহ সেই চরিত্রটিকে প্রকাশ্যে রাজপথে বেরিয়ে আসতে হবে অবশ্যই। তা না হলে সেই চরিত্রটি তার স্ত্রী-সহ খুনীর হাতে খুন হতে বাধ্য।

অবাক হয়ে ভাবে পেরী, পেরীকে রোজ বলছেন, খুনীকে প্রকাশ্যে রাজপথে বার করে আনতে। ব্রাউনকে সে কিভাবে বোঝাবে?

পেরীকে চিন্তিত হতে দেখে রোজ বলে আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখবেন মিঃ ওয়েস্টন, চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সে, এছাড়া আপনার গল্পের চরিত্রের বাঁচার অন্য কোন পথ আর নেই।

আপনার মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেরী, বলে ফিশিং লজে ফিরে গিয়ে নতুন করে আমাকে ভাবতে হবে, এর পর কি করা যায় ?

দরজা খোলামাত্র ব্রাউন খিঁচিয়ে ওঠে, কই আমার টাকা ? এনেছ ? হ্যাঁ, জীপের মধ্যে রেখে এসেছি। ইচ্ছে করেই জীপে দশ হাজার ডলারের প্যাকেটটা রেখে এসেছিল পেরী। শেরীফ রোজের পরামর্শের কথা ভেবে। রোজ তাকে পরামর্শ দিয়েছে, ব্রাউনকে রাস্তায় টেনে আনার জন্য। তার একবার মনে হল, এই সুযোগ, তাকে সে বলবে, টাকাটা জীপ থেকে আনার জন্য। সেই সুযোগে ডেপুটি শেরীফ গাছের উপর থেকে তাকে দেখামাত্র গুলি করবে। তারপরেই সবশেষ। পরমুহূর্তেই সে আবার ভাবল, ব্রাউন যদি তাকে সন্দেহ করে ?

আমার সঙ্গে কোন চালাকি নয়, ব্রাউনের কথায় চমকে উঠল সে, যাও এখুনি বাইরে গিয়ে জীপ থেকে টাকাটা নিয়ে এস, আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, সত্যি তুমি টাকাটা এনেছ কিনা ?

অগত্যা পেরীকেই যেতে হ'ল টাকাটা আনতে।

লজে ফিরে গিয়ে টাকার প্যাকেটটা ব্রাউনের হাতে তুলে দিয়ে পেরী বলে, গুণে দেখ, আমি তোমাকে ঠকাচ্ছি কিনা যাচাই করে নাও। আর আমি ততক্ষণে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

তোমার সুন্দরী স্ত্রী অক্ষত অবস্থায় আছে, কোন চিন্তা নেই, আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তাকে আমি স্পর্শ করিনি। ওদিককার কি খবর, আগে বল ?

শেরীফ রোজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পথে, পুলিশের সন্দেহ তুমি নাকি মিয়ামিতে পালিয়ে গেছ।

তাই নাকি ? সত্যি পুলিশের সন্দেহ আমি এখন মিয়ামিতে ?

হ্যাঁ।

আর তার সেই ডেপুটি, হ্যাঙ্ক হোলিস। সে কোথায় ? ওকেই আমার [illegible]। কেউটের বাচ্চা, বাস্টার্ড। [illegible] ব্রাউন।

হ্যাঁ, তার সঙ্গেও পথে দেখা হয়েছে, [illegible] বলে পেরী, [illegible]

এগিয়ে যাচ্ছে সে। অথচ পেরী জানে, তার লঙ্গে সামনা-সামনি গাছটার উপরে অপেক্ষা করছে হোলিস লোগানের জন্য।

শোন পেরী, রাত নামলেই অন্ধকারে তোমার শ্রীর ভাড়া করা জীপটা নিয়ে আমি এখান থেকে সরে পড়তে চাই। তবে চলে যাওয়ার আগে একটা কথা তোমাকে বলে যাই, তোমার সততা এবং সত্য ভাষণের জন্য আমি তোমাকে পছন্দ করি, কিন্তু তোমার স্ত্রীকে নয়। এই কয়েক ঘন্টায় ওর সঙ্গে মিশতে গিয়ে আমি জেনেছি, ওর মত নষ্ট চরিত্রের মেয়ে এ দুনিয়ায় দুটি দেখিনি। ওকে একটু চোখে চোখে রেখো, বুঝলে।

আট

এক ঘণ্টারও বেশী সময় বিছানায় পড়ে থেকে খুব কাঁদল শীলা। বার বার জিম ব্রাউনের কথা মনে পড়েছিল তার, তুমি স্রেফ একটা কুত্তী। আমার কাছে তুমি একজন বেশ্যা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। এভাবে এর আগে কোন পুরুষ তাকে অপমান করেনি, তার নারীত্বকে অবহেলা করেনি। ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে এল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে শীলা চিন্তা করতে থাকে, কিভাবে ব্রাউনের মত বেয়াদপ পুরুষকে খতম করা যায়। আমি তোমাকে মৃত দেখতে চাই। কিন্তু কেমন করে? প্রশ্নটা ভাল। পুলিশকে ফোন করবে? না তা সম্ভব নয়। ঐ শয়তানটার দৃষ্টি এড়িয়ে ফোনের কাছে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। চিন্তা করতে করতে পেরীর রিভালবারে কথা মনে পড়ে গেল, জ্যাকসন ভিলে আসার সময়ে সেটা সে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। জীপের চালকের আসনের সামনে চোরা পকেটে রিভলবারটা রাখা আছে। এই সময়ে জীপের আওয়াজ শুনতে পেয়ে জানলার সামনে ছুটে এল শীলা দেখল জীপ থেকে নামছে পেরী। খানিক পরে নীচুতলা থেকে পেরীকে বলতে শুনল, 'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এখুনি একবার দেখা করতে চাই। উত্তরে ব্রাউন তাকে কি যে বলল শুনতে পেল না সে।

ঠিক আছে শীলা, একটু অপেক্ষা কর। সময়ে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রিভলবারটা জীপের মধ্যে আছে। অপেক্ষা কর।

শয়নকক্ষে পেরী প্রবেশ করামাত্র শীলা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল দু' হাত বাড়িয়ে, প্রিয়তম কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? আমার যে ভীষণ ভয় করছিল।

পেরী তার ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলে, আর কোন ভয় নেই প্রিয়তমা, জিম চলে যাচ্ছে। তোমার ভাড়া করা জীপটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সে। শীলার মুখটা কেমন কঠিন হয়ে ওঠে। নিজের মনে বলে, শয়তানটাকে জীবিত অবস্থায় ফিরে যেতে দেবে না সে।

তার মানে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, তাই না? শীলা বলে। হ্যাঁ, আমাদের রাত্রির দুঃস্বপ্নটা কেটে যাবে, পেরী তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, আগামীকাল থেকে নতুন করে আবার আমরা জীবন শুরু করতে পারব।

শীলা নিজেকে সংযত করে বলে, খুনীটার হাত থেকে রেহাই পেলেই তো তবে আমরা আমাদের এই ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারি, তার আগে নয়। শীলার মুখটা আবার আগের মত কঠিন হয়ে ওঠে, ভাল কথা পেরী জীপের ভেতর থেকে আমার হাত ব্যাগটা এনে দিতে পার? ওতে তোমার রিভলবারটা আছে শীলা বলে, ওটা আমার একান্ত দরকার।

শোন শীলা, তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, কি পরিস্থিতির মধ্যে আমরা এখন বাস করছি। দু-দু'জন লোকের হত্যাকারী ব্রাউনের সঙ্গে সামান্য একটু চালাকী করলেই আমাদেরও খতম করে দেবে সে। তাই তোমাকে আবার বলছি, এই মুহূর্তে আমাদের এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে করে ওর মনে সন্দেহ হতে পারে, ও নিরাপদ নয় এখানে।

এই সময় ব্রাউন তাদের নৈশ ভোজের টেবিলে আহ্বান জানায়। শীলা রাগে ফুলছিল তখন রিভলবারটা হাতে না পেয়ে রাগ করে দোতলায় সে তার শয়ন কক্ষে শুতে চলে যায়।

ব্রাউনকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার ভঙ্গিমায় পেরী বলে, শীলার হঠাৎ মাথা ধরেছে, তাদের সঙ্গে নৈশভোজে যোগ দিচ্ছে না সে। ব্রাউন ঠোঁট টিপে হাসে, হ্যাঁ বিছানাই মেয়েদের আদর্শ আশ্রয়।

তুমি তো আজ দেখছি কিছুই খেলে না, ব্রাউন বলে।

ধন্যবাদ প্রয়োজনমত খেয়ে নিয়েছি।

ব্রাউন তার খাওয়া শেষ করে জবাব দেয়, এবার বোধহয় একটু সুখের মুখ দেখতে পাব। দশ হাজার ডলার হাতে পেয়েছি, এবার আর বেশী সময় তোমার অপচয় করব না। অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু পরেই আমি এখান থেকেই জ্যাকসন ভিলে চলে যাচ্ছি, সেখান থেকে জনারণ্যে হারিয়ে যাব, পুলিশের সাধ্য নেই আমাকে খুঁজে বার করে। তখন তুমি যত খুশি লিখতে পারবে, ব্রাউন বলে, ততক্ষণ তুমি উপরে গিয়ে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে আরাম কর গিয়ে।

তারপর পেরীকে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দিতে গিয়ে ব্রাউন বলে, যাওয়ার আগে দরজা খুলে দিয়ে যাব।

রান্না ঘরের খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রাউন তার ঠোঁটে শয়তানের

থাকি। তার দৃষ্টি পড়েছিল লজের সামনের গাছটার উপরে। পেরী বলেছে, ঐ গাছে নাকি কোন জংলী জানোয়ার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ওখানে এখন ডেপুটি শেরীফ হ্যাঙ্ক হোলিস ছাড়া অন্য কেউ থাকতে পারে না। জায়গাটা সে বেশ ভালই বেছে নিয়েছে, ওখান থেকে পেরীর ফিশিং লজের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। অথচ গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকার দরুণ এখান থেকে তার কোন কিছুই চোখে পড়ে না। দেখা যায় না বললেই হ'ল? ব্রাউন মনে মনে ভাবে দাঁড়াও, অন্ধকার হোক তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করে খোলা জানালা পথ দিয়ে বাইরে বাড়ির পিছনে নেমে এল ব্রাউন। রাতের অন্ধকারে, হোলিস টেরও পেল না কারণ তার দৃষ্টি পড়েছিল লজের প্রবেশ পথের দিকে। তারপর ব্রাউন হামাগুড়ি দিয়ে সাপের মত বুকের উপর ভর দিয়ে সেই গাছটার দিকে এগিয়ে চলল খুব সাবধানে যাতে ঝরা পাতার শব্দ না হয়।

এক সময় সেই গাছ এবং তার মধ্যে ব্যবধান কমতে কমতে মাত্র দশ গজ দাঁড়ায়। সেখান থেকেও হোলিসকে দেখতে পেল না সে। তবে রিভলবারটা ঠিক সামনের দিকে উঁচিয়ে ধরে থাকে সে, কখন প্রয়োজন হয় কে জানে?

ওদিকে হোলিস তখন বেতারে শেরীফ রোজের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নিচ্ছিল। সে তখন জানত না, সেটাই তার শেষ আলোচনা।

মশার হাত থেকে রেহাই পেতে হাত-পা ছুঁড়তেই ব্রাউন এবার টের পেয়ে গেল, হোলিস কোন ডালে বসে আছে?

ব্রাউনের চোখ দুটো হিংস্র গোখরো সাপের চোখের মত জ্বলে উঠল সেই মুহূর্তে। অসম্ভব হয়ে উঠলো সে। বিজয়ীর হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠতে উঠতেই তার হাতের রিভলবার গর্জে উঠল। গুলির আওয়াজ হতেই একটা অশুভ কিছু ভেবে নিয়ে জানালার দিকে ছুটে গেল পেরী। সামনেই সেই অভিশপ্ত গাছটা। খাকী পোষাক পরা হ্যাঙ্ক হোলিসের নিস্তেজ দেহটা গাছের একটা ডাল থেকে আর এক ডালের উপরে পড়তে পড়তে সশব্দে ভূপতিত হতে দেখেই শিউরে উঠল। এ নিয়ে সাতটা খুন করল ব্রাউন। উঃ কি ভয়ংকর লোক সে!

পুলিশম্যানকে খুন করল সে, পাঁচিলের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পেরী।

[illegible] খুন হল। [illegible] এ খুনীর কি

: ?

হ্যাঁ, তাই তো তোমাকে বারবার বলছি প্রিয়তমা, একটু ধৈর্য ধরে ব্রাউন যা বলে তাই করে যাও, ওর অবাধ্য হয়ো না কখনো। হ্যাঙ্ক হোলিস লুকিয়ে ঐ গাছটার উপর থেকে ব্রাউনের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল, ব্রাউনের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তাকে সে সরিয়ে দিল।

হায় ঈশ্বর! বিড় বিড় করে বলে শীলা, কি কুক্ষণেই যে আমি এখানে এসে ছিলাম।

দরজা খুলে ঘরে ঢোকে ব্রাউন, আমি তোমার সেই জঙ্গলী জানোয়ারটাকে খতম করে এসেছি পেরী। বড় চতুর সেই জানোয়ার, সঙ্গে রাইফেল এবং বেতার যন্ত্র রাখে এইসব জানোয়ার, বুঝলে ?

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না পেরী।

আমি চলে যাচ্ছি পেরী, এই সুযোগ, তবে সঙ্গে তোমার ঐ যুবতী স্ত্রীকেও নিয়ে যাব। ও আমার পাশে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমি নিরাপদ থাকব।

মুখে হাত চাপা দিয়ে আঁতকে ওঠে শীলা।

তোমার যাত্রা শুভ হোক, পেরী কোন রকমে বলে তার সঙ্গে করমর্দন করতে যায়। ব্রাউন কাছে গিয়ে অতর্কিতে তার চোয়ালে ঘুষি মারল প্রচণ্ড জোরে। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল পেরী।

এস বেবী, শীলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ব্রাউন বলে।

মিনিট কুড়ি হয়ে গেল হ্যাঙ্ক হোলিসের কাছ থেকে কোন খবর নেই। শেরীফ রোজ চিন্তায় পড়ল, দশ মিনিট অন্তর তার সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করার কথা। শেষ পর্যন্ত নিজেই সে বেতারে হোলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। হ্যাঙ্ক ? পেরী চিৎকার করে ডাকে তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না ?

না, কোন উত্তর নেই। তবে কি সে লোগানের শিকার হ'ল ? একটা অশুভ কিছু চিন্তা করে নিয়ে কার্ল জেনারের সংগে ফোনে যোগাযোগ করল মেরী রোজের অনুরোধ, কারণ সে তখন ভয়ে উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিল না।

মিঃ কার্ল, শেরীফ রোজের অফিস থেকে আমি মেরী কথা বলছি। ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে দিয়ে মেরী বলে, মিঃ কার্ল হ্যাঙ্ক হোলিসকে উদ্ধার করার জন্য [illegible] ব্যবস্থা নিন, জানি না, তার ভাগ্যে কি ঘটেছে।

শেরীফ রোজও চুপ করে বসে থাকতে পারে না। একটু সামলে নিয়ে [illegible]

বেরিয়ে পড়ে পেরী ওয়েস্টনের ফিশিং লজের দিকে। টপ গীয়ারে গাড়ী চালাচ্ছিল সে, মাঝপথে টমের গ্যারাজ থেকে একটা বাইসাইকেল সে তুলে নেয়। তার গাড়ীর লাগেজ ক্যারিয়ারে জল কাদার পথে প্রয়োজন হতে পারে।

পেরী ওয়েস্টনের জ্ঞান ফিরে এসেছিল তখন। শেরীফ রোজকে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিচু গলায় সে বলে, শেরীফ, সেই বাস্টাডটা পালিয়েছে আমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে সে তার কাজে লাগবার জন্য।

ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই মিঃ ওয়েস্টন, আসুন যে ভাবেই হোক আপনার স্ত্রীকে আমরা খুঁজে বার করবই। রোজ তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়। পথে কার্ল জেনারের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করে তাকে শেষ ঘটনার কথা জানিয়ে নিতে ভোলে না রোজ। সে আরও বলে, শীলাকে সঙ্গে নিয়ে জ্যাকসন ভিলের দিকে এগুচ্ছে চেক লোগান।

জোরে, আরও জোরে চালা কুত্তীর বাচ্চা, খিঁচিয়ে ওঠে জিম ব্রাউন ওরফে চেক লোগান শীলার উন্মুক্ত স্তনের উপরে রিভলবারের নলের খোঁচা দিয়ে।

যন্ত্রণায় কাতরে উঠে কোন রকমে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি। এড়িয়ে হাতে স্টিয়ারিং ধরে অপর হাতে রিভলবারটা তুলে নেয় শীলা। ব্রাউনের দৃষ্টি এড়িয়ে আগেই সে সেটা ড্যাস বোর্ড থেকে বার করে রেখেছিল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে আর্তার্কতে ব্রাউনের মাথা লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দেয় সে। সঙ্গে সঙ্গে জিম ব্রাউনেব ভারী দেহটা তার পাশে ঢলে পড়ল, রক্তে ভেসে গেল জায়গাটা। জয়ের হাসি ফুটে উঠলো শীলার ঠোঁটে। এখন কেমন লাগছে, জিমি ব্রাউন, সাত-সাতটা খুন করতে গিয়ে, আমারও ঠিক কি আনন্দই হচ্ছে। আর—

বাকী আনন্দের প্রকাশ শীলার মুখের মধ্যেই প্রকাশ পেল তার মস্ত কনুই-এর উপরে ভর দিয়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে জোরে ঘুঁষি মারল ব্রাউন শীলার মুখের উপরে। শীলার কলার বোন ভেঙ্গে যায়, মুখ থুবড়ে পড়ে স্টিয়ারিংটি যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে স্তব্ধ হয়ে যায় সেখানে। সব শেষ।

ঘণ্টা পাঁচেক অনুসন্ধান চালানর পর শীলার খোঁজ পেল তারা। বেশীদূর যেতে পারেনি তারা সেই জঙ্গলের মধ্যে জেনারের সঙ্গে পেরী তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে শীলার দিকে তাকাল সবশেষ, লোগানের মৃতদেহ পরীক্ষা করে ফিরে এল জেনার আর কিছু করার নেই।

আমার শ্রা ?

আমি অত্যন্ত দুঃখীত মিঃ ওয়েস্টন, ওখানে গিয়ে আর কোন লাভ নেই ? ফেরা যাক।

পেরী তার কথা না শুনে ছুটে যায় ঘটনাস্থলের দিকে। শীলার দেহটা স্টেট পুলিশ ঘিরে রেখেছিল তখন। পেরী দেখল ব্রাউন তখন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার মুখে ভয়ের ছাপ তখনও স্পষ্ট। পেরী শীলার দিকে তাকায়।

স্টিয়ারিং এর উপরে শীলার স্পন্দনহীন দেহটা পড়ে আছে। রিভালবারটা তখনও শীলার হাতের মুঠোয় আবদ্ধ। মৃত্যুর পর মুখের ভাব কেমন যেন চঞ্চল দেখাচ্ছিল আশ্চর্য!